দেবতা দর্শন

নিগূঢ়ানন্দ

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ
১লা বৈশাখ ১৩৪৮

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিণ্টার্স
১৩৮ বিধান সরণী
কলকাতা-৪

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

যোগীশ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম
শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের
শ্রীপাদপদ্মে

সূচি

শিব ও গতিতত্ত্ব

শিবের যোগীমূর্তি সত্যিই মনোহর। কিন্তু তাঁর ব্যাঘ্রাম্বর পরিধান, কণ্ঠে জড়ানো সর্প, ভস্মমাখা দেহ, শ্মশানে অধিষ্ঠান এ-সব কেমন বিবমিষা উদ্রেক-কারী। হাতের ত্রিশূল দ্বারা কি বোঝাতে চান তিনিই জানেন। ডম্বরু বা শিঙা তো বেদেদের বাদ্যযন্ত্র। মাথার চাঁদটাই কেমন অদ্ভুত। অবশ্য দেখতে সুন্দর।

বাংলা সাহিত্যের এক অধ্যাপক—দক্ষযজ্ঞনাশ কাহিনী পড়ে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, চাঁদ সওদাগরের কাহিনী যেমন অনার্য মনসাদেবীর বৈদিক দেবদেবীর জগতে প্রবেশের সূচীপত্র মাত্র, দক্ষযজ্ঞনাশ কাহিনীটিও তেমনই—অনার্য শিবের আর্য-জগতে প্রবেশের ভূমিকা মাত্র।

আসলে ব্যাপারটা যে কি—বাস্তব-জ্ঞানের বিশ্লেষী ক্ষমতা দিয়ে তার সবটাই জানা যাবে তা মনে হয় না। জগৎটাই তো একটা রহস্য। বস্তুসত্তার উৎস বের করতে গিয়ে যাঁরা বস্তুকে ভেঙে ভেঙে তার আদি চরিত্রটা বুঝবার চেষ্টা করছেন তাঁরা দেখছেন যে—সেই উৎস পর্যায়ে যেন যাওয়াই যায় না। দ্রোণাচার্যের ব্যূহের মত তার মাঝখানে রয়েছে জয়দ্রথ। ধনুর্বিদ্যার সকল উৎকর্ষ প্রয়োগ করেও অর্জুন হতাশ। সূর্য ডুবে গেলেও জয়দ্রথের দেখা আর পাওয়া যাবে না। সেই ব্যূহের অন্তঃপুরে লুকানো জয়দ্রথকে শুধু ভগবান শ্রীকৃষ্ণই বের করতে পারেন। পার্থিব মানুষ, পার্থিব পণ্ডিত কেউ নন। তাই মূলের সন্ধান কেউ আর পান না। হয়তো কেউ ভাবলেন পেয়েছি, কিছুদিন সেই পাওয়া নিয়ে খুশিতে ডগমগ হয়ে থাকলেন, কিন্তু কিছুদিন পরেই জানলেন—না, এটাই শেষ নয়, আরও আছে।

এক সময় বিজ্ঞানীরা ভাবতেন—অণুই বস্তুবিশ্বের উপাদানের বস্তুসাত্তিক আদি একক। পরে দেখলেন, না, অণুর ভিতরও পরমাণু আছে। আবার পরমাণুও শেষ কথা নয়, তার ভেতরেও আছে। এ যেন দ্রৌপদীর অন্তহীন শাড়ি—, খুলে খুলে আর শেষ করা যায় না। আশ্চর্য এক জাদুবাক্স। এর একটা ঢাক্না খুললে আর একটা বেরয়। সেটা খুললে আর একটা।

প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রেও যেন ব্যাপারটা ঠিক তেমনই। একটা বিশ্বাসকে দেখা যায় আসর জমিয়ে বসেছে। কিছুদিন পরেই দেখা গেল সে বিশ্বাসটাই শেষ কথা নয়। নতুন বিশ্বাসের কথা বেরিয়ে পড়েছে। এক সময় এটাই তো গ্রাহ্য বিশ্বাসের মতন হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, আর্যরা ভারতে বহিরাগত। এখন আবার নতুন বিশ্বাসের কথা জানা যাচ্ছে। নতুন বিশ্বাস এই যে, আর্যরা চিরকালই ভারতীয়। ভারত থেকেই বাইরে গিয়েছিলেন। David Frawley তাঁর 'Gods, Sages and Kings' গ্রন্থে এ বিষয়ে প্রাচীন তথ্য ভেঙে দিয়ে নতুন তথ্য দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছেন।

Frawley-এর বক্তব্য : আর্যরা ভারতীয়, বেদেই সে ধরনের ইঙ্গিত রয়েছে। ফ্রাওলের মতে, আর্যরা যদি ভারতে বহিরাগত হতেন তাহলে কমপক্ষে কিছু স্থান ও মুখ্য নদনদীর ক্ষেত্রে প্রাগার্যদের দেওয়া নামের কিছুটা গন্ধ লেগে থাকতই। যেমন ইউরোপীয়রা আমেরিকায় গিয়ে বসবাস করলেও আদি আমেরিকান ভারতীয়দের দেওয়া নদনদীর নাম তেমন বদল করেননি, যেমন, মিসিসিপি। কিন্তু ঋগ্বেদে এমন কোন নদনদীর নাম নেই যেসব নামের উৎস সংস্কৃত নয়। সুতরাং বাইরে থেকে জয় করে তাঁরা এ-দেশে ঢুকেছিলেন এরকম মনে হয় না। তাহলে অন্তত নদনদীর ক্ষেত্রে প্রাগার্য নামের কিছুটা প্রভাব থেকে যেতই।

ফ্রাওলের ধারণা—আর্যদের আদি বাসস্থান ছিল সরস্বতী নদী অঞ্চল। অন্তত ঋগ্বেদ ও বৈদিক ঐতিহ্য থেকে সেরকম ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক। আর্য-সভ্যতায় সরস্বতীই ছিল মূল কেন্দ্র। যত নদনদীর উল্লেখ আছে তার মধ্যে সর্ববৃহৎ। যেমন সতেজ, তেমনই উর্বর। সিন্ধুনদও বসবাসের পক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। কিন্তু সরস্বতীর মত এত কেন্দ্রীয় গুরুত্বপূর্ণ নয়। বৈদিককালে দেখা যায়, সরস্বতী পাঞ্জাব অঞ্চলের এক সামান্য নদী, রাজস্থানের মরুভূমিতে যে তার গতি হারিয়ে ফেলেছে। ফলে এ নদী সম্পর্কে বেদে যে প্রশংসা করা হয়েছে তা লক্ষ্য করে মনে নানা ধরনের প্রশ্ন দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক। ঊনবিংশ শতকে এই জন্য পণ্ডিতজনেরা মনে করেছেন যে, সরস্বতী ছিল আদিতে পশ্চিম আফগানিস্থানে একটি ছোট নদী। পার্শীরা একেই বলত হারাকিতি। বৈদিক সভ্যতার উন্মেষ আর্যদের ভারত আক্রমণের পূর্বে এখানেই ঘটেছিল। সেই নদীটিরই নাম পরিবর্তন করে ভারতে সরস্বতী নামে ছোট্ট একটি নদীতে সেঁটে দেওয়া হয়েছে। আবার একদল মনে করেন যে, সরস্বতী সিন্ধুরই আর এক নাম ছিল। কিন্তু বেদে সরস্বতীর নির্দিষ্ট যে অঞ্চলের কথা জানা যায়, চরিত্রের কথা জানা যায়, তাতে সিন্ধুর সঙ্গে কিছুতেই তাকে এক করে দেখা চলে না।

তাহলে কি সরস্বতী কোন সময় সত্যিই ভারতবর্ষে সবচেয়ে বড় নদী ছিল? পরবর্তী কালে প্রত্নতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিকভাবে সরস্বতী নিয়ে যে অনুসন্ধান কার্য চলেছে তাতে এই নদী সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নতুন তথ্য জানা যায়।

ছোট্ট একটি নদী, এখন যাকে বলা হয় ঘগ্গর, ঋগ্বেদে সেটি ছিল সরস্বতী। অতীতে সেটা অনেক বড় নদী ছিল। সেই নদীর মজে যাওয়া বুক চাষবাসের পক্ষে এখন রীতিমত উর্বর। আকাশ এবং মহাকাশ যান থেকে নেওয়া ফটো থেকে এর আংশিক গতি এখনও লক্ষ্য করা যায়। খ্রীস্টপূর্ব তিন থেকে দু'হাজার বছর নাগাদ সিন্ধু সভ্যতার যেসব কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল সে-সব কেন্দ্রের নিদর্শন আজও এর মজে যাওয়া বুকের আশেপাশেই পাওয়া যাচ্ছে। ফলে মনে করতে কোনই দ্বিধা হয় না যে, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ

স্থান। সুতরাং বৈদিক সভ্যতার বর্ণনা মত সরস্বতী সত্যিই বিশেষ একটি নদী সম্ভবত বৃহত্তম নদী। কিন্তু তার এই বৃহত্তমতা ছিল প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার আদি পর্যায়ে— সেই সিন্ধু সভ্যতার কালে বা তারও আগে। বেদ রচনার যে-কাল পণ্ডিতজনেরা নির্ধারিত করতে চান- তারও বহু পূর্বে।

সরস্বতীর সঙ্গে উল্লেখিত আর একটি প্রাচীন নদীও এখন মজে গেছে, যার নাম দৃষদ্বতী। বর্তমানে নইওয়ালা। এই দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নদীটিকে মনু বলেছেন— বৈদিক সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র। তাছাড়া শতদ্রু, বেদে যাকে বলা হয়েছে শুতুদ্রি, সেই নদীটিও বৈদিক কালে সরস্বতীতে এসে মিশে গিয়েছিল। বর্তমানে বিপাশা নদীর সঙ্গে মিশে সিন্ধুতে গিয়ে পড়ছে। সরস্বতীকে কেন্দ্র করে যে-সব নদী ছিল,—শুতুদ্রি ছিল তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই সব নদীর সমবেত ধারা ছিল বিরাট— চওড়ায় প্রায় পাঁচ মাইল— মহাকাশযান থেকে নেওয়া মজে যাওয়া এই নদীটির বুক দেখে অন্তত তাই মনে হয়। বর্তমান রাজস্থানে হনুমানগড় থেকে পাকিস্তানের মারোট অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত।

এই অপহৃত নদীটির চরিত্র উদ্ধারের জন্য নানা ভাবে এখনও কাজ চলেছে, যেমন, মহাকাশ থেকে নেওয়া ছবি, ভূমি পরিমাপ, কুয়োর জল পরীক্ষা ইত্যাদি। এতে যে-সব প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে তাতে প্রাচীন সরস্বতীর গুরুত্ব ও মহত্ত্ব যেন ক্রমশ বেশি করে বেরিয়ে আসছে।

যে-টুকু জানা যাচ্ছে তাতে বেশ বোঝা যায় যে, সরস্বতী অন্তত চারবার তার গতি পরিবর্তন করেছিল। আদিতে, এখন যাকে রাজস্থানের মরুভূমি অঞ্চল বলা হয়, সেখান দিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ত। আদিতে এর ধারা লুনি নদীর সঙ্গে মিশে বর্তমান কুচ্ বা কচ্ছের রান্ অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে সমুদ্রে গিয়ে পড়ত। আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের পরেও গ্রীকরা যখন ভারতে এসেছিলেন তাঁরা বলেছেন যে, কুচ্ ছিল তখনও একটি দ্বীপ। মনে হয় কুচ আদিতে ছিল প্রাচীন সরস্বতীর একটি বদ্বীপ। যমুনার প্রাচীনতম ধারার কিছুটা সরস্বতী নদীতেও পড়ত। প্রথম দিকে এর গতি ছিল পশ্চিম দিকে। পরে দিক পরিবর্তন করে পুব দিকে গঙ্গায় গিয়ে পড়ে। গঙ্গাও প্রাগৈতিহাসিক কালে যমুনার মত পশ্চিমমুখি হয়ে সরস্বতীতে পড়ত বলে মনে হয়।

মহাদেবের জটায় গঙ্গার পতনের যে পুরাণ-কাহিনী তৈরি হয়েছে, তা সম্ভবত সরস্বতী অঞ্চল থেকে বৈদিক সভ্যতার রঙ্গমঞ্চ পরিবর্তনেরই একটি স্মারক মাত্র। গঙ্গার গতিমুখ পরিবর্তনের সঙ্গেই কাহিনীটি যুক্ত। ঘটনা যাই হোক, যতই আমরা ভারতবর্ষের অতীতের দিকে তাকাই, ততই লক্ষ্য করা যায়, সরস্বতী স্ফীতকায়া হচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত বৃহত্তর জলবাহিকা হয়ে দেখা দিচ্ছে—বেদে যেমনটি বলা হয়েছে। সরস্বতীর বৃহত্তম জলবাহিকা রূপ যদি দেখতে হয় প্রাগৈতিহাসিক ভারতেরও বহু অতীত পর্যায়ে আমাদের যেতে হবে।

রয়েছে। সিন্ধু উপত্যকা যে প্রাচীন কালে যথেষ্টই আর্দ্র ছিল এমন প্রমাণ আছে। এক সময় এইভাবে প্যালেস্টাইন অঞ্চলও আর্দ্র ছিল। ভারতীয় মৌসুমী জলবায়ু এক সময় আরও পশ্চিমে সরে যায় এবং ধীরে ধীরে পূর্বমুখি হয়। সম্ভবত বন সম্পদ নাশ হবার ফলেই এমন ঘটেছিল। প্রাচীন কালে বনাঞ্চল নাশ তো একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। এই অঞ্চল শুষ্ক হয়ে যাবার ফলে সরস্বতীর স্রোতধারাও কমে যায়।

শুতুদ্রি নদী যখন এর তীর পরিবর্তন করে এবং সিন্ধুনদে গিয়ে পড়ে, তখন সিন্ধু অঞ্চলে অনেকগুলো বন্যা হয়েছিল বলে মনে হয়। ফলে সিন্ধুনদেরও তীর পরিবর্তন ঘটে। এতে সমগ্র অঞ্চলই প্লাবিত হয়ে যায়। সরস্বতী আরও শুকিয়ে যায়। ফলে নদীর বদান্যতার উপর যে সংস্কৃতি নির্ভরশীল ছিল তার পতন ঘটে, যেমন কলকাতার পতন ঘটছে গঙ্গার নাব্যতা কমে যাওয়ার ফলে। ব্রিটিশ ভারতের পূর্বপ্রান্তের মহানগরী কলকাতা তার সম্রাজ্ঞীর আসন হারিয়ে ফেলেছে। সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী জাতি ও তার সংস্কৃতিরও অধঃপতন ঘটছে। ঠিক বাঙ্গালী সংস্কৃতির মতই একদা দেদীপ্যমান সিন্ধু-সংস্কৃতিরও পতন ঘটে।

এরকম পরিবর্তন ঘটেই। প্রাচীন কালের পরবর্তী কোন সময়ে ভারতের সমুদ্রোপকূলও এক সময় ডুবে যায়। বর্তমানে দ্বারকা অঞ্চল খননের ফলে ব্যাপারটা প্রমাণিত হয়ে গেছে। ঘটনাটি ঘটেছিল তখনই, যখন সরস্বতীর গতি স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছিল। উত্তর ভারতের সমতলভূমিতে দেখা যায় অসংখ্য বন্যা হয়, নদী গতিপথ পরিবর্তন করে। ফলে ক্ষয় ক্ষতি হয় প্রচুর। সুতরাং মনে হয়, বেদের সরস্বতী নদী শুধুমাত্র পৌরাণিক কাহিনীর এক নদীই নয়, এর যথার্থ অস্তিত্ব ছিল। এবং আর্যরা এর তীরেই বসবাস করতেন।

সরস্বতী অঞ্চল ছিল মহান উত্তর ভারতীয় আর্য রাজাদের রঙ্গলীলার কেন্দ্রভূমি। আর্যসভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন যদি পেতে হয় এইজন্য রাজস্থানের মরুভূমি অঞ্চলে খননকার্য চালাতে হবে। বৈদিক যুগের শেষ পর্বে সরস্বতী শুকিয়ে যায়। সেইজন্য বৈদিক যুগকে সিন্ধুসভ্যতার পরবর্তী সময়ে ফেলা বড় রকমের একটা ভুল।

সুতরাং এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, বৈদিক জনগোষ্ঠীর আদিবাসস্থান ছিল সরস্বতী অঞ্চল। সেখানে দীর্ঘদিন তাঁরা বাস করেছিলেন, ঋগ্বেদ রচনা শেষ হওয়ার অনেক আগে থেকে। পরবর্তী কালে উত্তরভারতের বিরাট অংশে এই সভ্যতা ছড়িয়ে পড়ে—সরস্বতীর পূর্বে, পশ্চিমে, সমুদ্র থেকে সমুদ্র পর্যন্ত। পরবর্তীকালে সেই জন্য সমুদ্র প্রতীক হয়ে আর্য-লেখনীতে ফুটে উঠেছে। বেদের যে প্রাচীনত্ব আজ ধরা হয়, বেদ তা অপেক্ষাও প্রাচীন। প্রাচীন ভারতের ভূগোলই এর স্বপক্ষে এসে দাঁড়াবে। যদি কখনও প্রাচীন শাস্ত্র ব্যাখ্যাও আমাদের ভুল হয়, তবু প্রাচীন ভারতের নদনদীর গতিকে তো আর অস্বীকার করতে পারব না। আর্যরা যদি খ্রীস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ নাগাদ ভারতে এসে থাকতেন

তাহলে কখনও সরস্বতীর সমুদ্রগামী গতির কথা বলতে পারতেন না। খ্রীস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে রাজস্থানের মরুভূমিতে সরস্বতী তার ধারা হারিয়ে ফেলেছিল। সরস্বতী মজে যেতে বহু হাজার বৎসর সময় নিয়েছিল। এর মধ্যে চারবার সে গতিপথ পরিবর্তন করে। শেষ পর্যন্ত মহাভারতের কালে শুকিয়ে যায়। বেদ যখন এই মহামহীয়সী নদীটিকে জানত, এর গৌরবের কথা জানত, তখন নিঃসন্দেহে আর্যদের পরিচয় সম্পর্কে যে সকল ঐতিহাসিক প্রমাণ এ পর্যন্ত উত্থাপন করা হয়েছে সেগুলি সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা যায়।

অনেকেই একালে দেখছি, 'আর্যরা ভারতে বহিরাগত' এ ধরনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছেন। ঐতিহাসিক এ. সি. দাস ফ্রাওলের অনুরূপ মন্তব্যই করেছেন আর্যদের আদি বাসস্থান সম্পর্কে। তিনিও মনে করেন যে, সপ্তসিন্ধু অঞ্চলই ছিল আর্যদের বাসস্থান। সাতটি নদী দ্বারা এই অঞ্চল বিধৌত ছিল। এই সাতটি নদী ছিল—সিন্ধু, ঝিলম, চেনাব, রাভি, বিপাশা, শতদ্রু ও সরস্বতী। ঋগ্বেদে যে ভৌগোলিক বিবরণ পাওয়া যায় তা এই অঞ্চলেরই নির্দেশক। ভারতবর্ষের সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার যোগাযোগ ছিল স্থলপথে। আর্যরা সপ্তসিন্ধু থেকেই পশ্চিম এশিয়ার দিকে গিয়েছিল। এ. সি. দাস-এর কথা মত—'আর্যসভ্যতার দোলনা' ছিল সপ্তসিন্ধু। এর মধ্যে ছিল উত্তরে নয়নাভিরাম কাশ্মীর উপত্যকা ও পশ্চিমে গন্ধার। এর দক্ষিণ সীমান্তে ছিল শস্যসমৃদ্ধ রাজপুতানা, পূর্বে গঙ্গানদী। এ অঞ্চল দক্ষিণ ভারত থেকে সমুদ্র দ্বারা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল। কিন্তু গন্ধার ও কাবুলিস্থান হয়ে পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। সেই পথে ধরে দলে দলে আর্যরা পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপে অভিবাসন করেছিল।

ভারতকেই যাঁরা আর্যদের আদি বাসস্থান বলে বলতে চান তাঁদের বক্তব্য, বেদ বা সংস্কৃত সাহিত্যে এমন কোন ঐতিহ্যের উল্লেখ পাওয়া যায় না যা প্রমাণ করে যে, বাইরে থেকে আর্যরা ভারতে এসেছিলেন। বাইরে থেকে যদি তাঁরা এসে থাকতেন, তাহলে সেই বহির্দেশের ঐতিহ্য সম্পর্কে বৈদিক সাহিত্যে নিশ্চয়ই কোন উল্লেখ থাকত। কিন্তু তা নেই।

'আর্যরা ভারতীয়ই', একথা যাঁরা বলতে চান তাঁদের বক্তব্য, তারা ভারতে বহিরাগত, এ বক্তব্য অনুমান সাপেক্ষ। প্রমাণিত নয়। কিন্তু আর্যদের এ দেশীয় অস্তিত্ব সম্পর্কিত বিশ্বাসের ভিত্তি হচ্ছে ঋগ্বেদ ও বৈদিক সাহিত্য, যা আর্যতত্ত্ব সম্পর্কে প্রথম ও শেষ গ্রাহ্য সাহিত্য। বৈদিক সাহিত্যের প্রমাণ অনুসারে আর্যরা যে আদৌ বহিরাগত নয় তা উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত।

ভারতে বাইরে থেকে প্রথম আসে সুমেরিয়রা। কিন্তু তারা ছিল স্বল্পকালের জন্য। এর পরই ঋগ্বেদ কথিত প্রস্তরাকীর্ণ বিলুচ প্রদেশ বা বেলুচিস্তান অঞ্চলে আসে আসিরিয়রা বা অসুর গোষ্ঠী। এরা বেলুচিস্তানের পেছনে মনোরম পার্বত্যভূমি দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে সেখানে একটি উপনিবেশ গড়ে তোলে। ঋগ্বেদ

অনুসারে এই অঞ্চলের নাম অসুর্যদেশ। বেদে অসুর দেবতা নির্বিশেষে সকলকেই অসুর্য সম্বোধন করা হয়েছে। ঋগ্বেদে ইন্দ্রের যে শ্মশ্রুসমন্বিত চেহারার বর্ণনা আছে, তাতে আসিরিয় প্রতিকৃতির প্রভাব স্পষ্ট।

মূল অসুর গোষ্ঠী ছিল অত্যন্ত প্রাচীনপন্থী। ফলে স্থানীয় উপজাতিদের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। কিন্তু তাদেরই একটি বড় শাখা সাধ্য, রুদ্র, মরুৎ, গন্ধর্ব প্রভৃতি স্থানীয় অধিবাসিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। কালক্রমে তারা যাগযজ্ঞাদি নানারূপ ব্রতের সঙ্গে যুক্ত হয়। তবে আদি অসুর সমাজ বা অসুর্যগণ এই ব্রত অনুষ্ঠান জাতীয় কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করেনি। এর ফলে বহু শতাব্দী ধরে নিজেদের মধ্যে অন্তর্ঘাত চলতে থাকে। অবশেষে অসুরদের ব্রতপন্থী অগ্রণী গোষ্ঠী অসুর্যগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখন তারা অসুর্য শব্দ থেকে অর্য শব্দটি গ্রহণ করে। এবং অর্য সম্পর্কিত বলে আর্য নামে পরিচিত হয়।

সুতরাং বলা যেতে পারে যে, আদি সেমিটিক পর্যায়ের অসুররাই ভারতে বাহিরাগত। বহু পরবর্তীকালের আর্যরা দেশভিত্তিক। তাদের আর বহিরাগত বলে ভাবার পেছনে কোন যুক্তি নেই।

ভারতের ইতিহাস পুরাণের সাক্ষ্য নিলে এটা স্পষ্ট যে, আর্যরা উত্তর পশ্চিম গিরিপথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেনি। বরং ঐ পথেই ভারতে আর্য মানবের অসুর সম্প্রদায় ভারত থেকে বাইরে গিয়েছিল।

আর্য শব্দটি জাতি অর্থে ভারতীয় বেদপুরাণে ব্যবহৃত হয়নি। বেদ ও পুরাণে তাঁরা দেব ও অসুর নামে অভিহিত হয়েছেন। এই দেব-অসুরদের 'প্রত্ন ওকঃ' অর্থাৎ প্রাচীন বাসস্থান ছিল মহামেরু অর্থাৎ পামীর অঞ্চলে। সেই আদি বাসস্থানকে দেব সম্প্রদায় 'ইলাবৃত' নামে ও অসুর সম্প্রদায় 'ইরাণবীজ' নামে উল্লেখ করেছেন। পুরাণ অনুসারে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সেই আদি বাসস্থান থেকে তাঁরা দক্ষিণে হিমালয়ে সরে আসেন। এই বাসস্থান 'স্বর্গ' নামে অভিহিত। এই স্বর্গের অধিকার নিয়ে স্বাভাবিক জ্ঞাতিদ্বন্দ্ব শুরু হয় দেব ও অসুরদের মধ্যে। পুরাণ অনুসারে দীর্ঘস্থায়ী দ্বাদশবারের যুদ্ধে কখনও দেবতা কখনও অসুররা জয়ী হন। অবশেষে দেবনায়ক ইন্দ্রের অধিনায়কত্বে দেবতারা হিমালয়ের ঊর্ধ্ব প্রদেশ থেকে অসুরদের বিতাড়িত করলে তাঁরা মেরু নিম্নদেশ পাঞ্জাব অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। সম্ভবত মহেন-জো-দড়ো, হরপ্পা ও সন্নিহিত বহু অঞ্চলের সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শনগুলি ঐ অসুর সভ্যতারই নিদর্শন।

ঋগ্বেদ সমতল ভারতবর্ষকে দেবতাদের তৃতীয় বাসস্থান রূপে উল্লেখ করেছে। দেবতাদের আক্রমণেই সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস হয় এবং অসুররা উত্তর পশ্চিম গিরিপথ দিয়ে বহির্গত হয়ে ইরাণে বসতি স্থাপন করে।

পণ্ডিতপ্রবর হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বৈদিক তত্ত্বে ভাষা বিজ্ঞান' গ্রন্থে আদি আর্য জাতিকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন— যেমন—অযাজ্ঞিক (যারা অগ্নিপূজারী নন) ও যাজ্ঞিক। অযাজ্ঞিকদের বলা হত নহুষ। যাজ্ঞিক আর্যরা

আবার দুভাগে বিভক্ত ছিলেন— অসুর্য (আসিরিয়) ও দেবযাজি। অসুর্যদের থেকে এসেছে পর্শু (পার্শীয়ান) মাধ্য (মিডি) মায়ী (মগী) পনস্যু বা পনি (ফিনিসীয়)। দেবযাজি থেকে এসেছে পুরু, যদু, তুর্বশ, অনু ও দ্রুহ্য। হরিচরণ বাবু সিন্ধু সভ্যতার উদ্ভাবকদের পনস্যু বা পনি বলে মনে করেন—যাদের থেকেই বণিক শব্দের উৎপত্তি। সুতরাং এরাও যে অনার্য তা নয়।

শ্রী রাজমোহন নাথ বি-ই তত্ত্বভূষণ তাঁর 'মহেঞ্জদড়োর লিপি ও সভ্যতা' নামক পুস্তিকাতে সিন্ধু-লিপি ও সংস্কৃত বর্ণের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য খুঁজে পেয়েছেন। ওই লিপি সংস্কৃত বর্ণমালা থেকে বিচ্ছিন্ন নয় বলেই তাঁর ধারণা। সিন্ধু সভ্যতার কতকগুলি নগরের মধ্যেও তিনি সংস্কৃতের গন্ধ খুঁজে পেয়েছেন, যেমন, হরপ্পা। হরপ্পা ইরাবতী নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। ঋগ্বেদে আর্য ও দাস জাতির মধ্যে সংঘটিত যজ্বাবতী নদী-তীরস্থ হরি-যূপীয়া নগরীর উল্লেখ আছে। 'হর', 'হরি', 'হরিৎ'—বিদ্যুৎজ্যোতি জ্ঞাপক। ঋগ্বেদের হরি-সূক্ত জ্যোতির খেলার বিবরণ যুক্ত। ইন্দ্রের রথের যুগল অশ্বের নাম হরি। হর আকাশের অধিষ্ঠাতা এবং হরি বিশ্বধারক ও পোষক দেবতা। হরিৎবর্ণ যূপ বা স্তম্ভ বিশিষ্ট নগর বা হরি বা হর যে নগরের ধারক ও পালক সেই নগরেব নাম হরি-যূপীয়া বা হরাপ্পা (তুঃ দাক্ষিণাত্যের লিঙ্গাপ্পা)।

যজ্ব শব্দের অর্থ কুণ্ডলী। কুণ্ডলীর অপর প্রতিশব্দ হ্বর (whirl)। সুতরাং যজ্বাবতী = হ্বরবতী-ইরাবতী একই কথা। পাঠ্যান্তরে-যব্যাবতী, তীব্র চঞ্চলা বা স্রোতবতী।

রাজমোহন বাবু মহেঞ্জদড়োর অর্থ করেছেন এইভাবে : ঋগ্বেদের ইন্দ্র পুর ভেদ করেন বলে পুরন্দর নামে খ্যাত। দৃঢ় নিপাতিত করেন বলে তাঁর অপর নাম দৃঢ়-হা; যেমন 'ত্বমহি মঘবন দৃঢ়হা (ঋক্ ৭।২৭।৪)। দৃঢ় = দঢ় = দড়ো = দুর্গ। বাংলা ভাষায় দঢ় শব্দের অর্থ শক্ত ভিত্তিযুক্ত।

ঈঙ্, ঈঞ্জ ধাতুর অর্থ নির্দেশ বা ইঙ্গিত দেওয়া। সুতরাং মহা- ঈঞ্জ্-দঢ় = মহা-ইঙ্গিত বা নির্দেশ প্রদায়ক দুর্গ= মহেঞ্জদড়ো বা Military Headquarter.

লহুমজো-দড়ো :— লু ধাতুর অর্থ ছেদন, বিভাগ করণ। বৃক্ষের শাখা লু করলে লহু লহু লব রূপে রস নির্গত হয়। যে কেন্দ্র থেকে মাঝে মাঝেই প্রয়োজন মত সৈন্য ও রসদ সরবরাহ করা হ'ত—অর্থাৎ Supply Base তারই নাম লহুমজো-দড়ো।

চন্-হু-দড়ো :- চন্ = কর্মোদ্দীপন, হূ = অগ্নি প্রজ্বলন মন্ত্র, অর্থাৎ বাস্তব যুদ্ধক্রিয়ার শিবির- Forward Action Base.

সুত্কা-জেন-দড়ো :— এটি আরব সাগরের তীরবর্তী মাক্রাণ উপকূলে ইষ্টক প্রাচীরবেষ্টিত একটি সুরক্ষিত ক্ষুদ্র নগর। এটি অর্ণবপোতগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার একটি বন্দর ছিল।

সুত্কা হল স্রোতকা শব্দের অপভ্রংশ। স্রোতকা শব্দের অর্থ নৌকো। সমুদ্রবাহী ব্যবসায়ী অর্ণবপোতগুলি নিয়ন্ত্রণকারী দুর্গের নাম হল স্রোতকেঞ্জ দড়ো বা সুত্কা-জন-দড়ো।

শিব প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে হঠাৎ আর্যদের নিয়ে পড়া গেল কেন সে কথাটাই বলছি এখন। কারণ, এখনও বহুজনেরই ধারণা,—শিব আর্য দেবতা নন, অনার্থ দেবতা, এবং আর্যজগতে ঢুকে পড়েছিলেন। শিবের প্রথম প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য তো সিন্ধুসভ্যতাতে পাওয়া যাচ্ছে- পশুপতি মূর্তির মধ্যে, শিবলিঙ্গের মধ্যে। সিন্ধুসভ্যতাকে এতদিন পর্যন্ত অনার্য সভ্যতা বলেই ভাবা হত। কিন্তু ইদানীং দেখা যাচ্ছে, সিন্ধু সভ্যতার উদ্ভাবকরা অনার্য ছিলেন না। দেব-আর্য না হলেও অসুর-আর্য ছিলেন অন্তত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শিব অনার্য নন। তবে ঋগ্বেদ রচনাকারী আর্যদের মধ্যে প্রথম দিকে তিনি নাও থাকতে পারেন। পরে রুদ্র নামে যে এসেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়রা যদি আর্য না হন,- তাদের মধ্যেও তিনি ছিলেন দেখা যায়। সেক্ষেত্রে শিবের মধ্যে একটা সর্বব্যাপকত্বের ভাব আছে। এমন কি মিশরের আমোন দেবতা ও অসিরিজ দেবতার সঙ্গেও তাঁর নানা মিল আছে। একই সঙ্গে তিনি হয়তো সর্বত্রই ছিলেন, নয় তো কোথাও আগে কোথাও পরে এসেছেন।

ঋগ্বেদে রুদ্র থাকলেও শৈব ধর্মের যে শিব আজ আমাদের কাছে পরিচিত সেই শিব তিনি নন। ঋগ্বেদের রুদ্রও যে দেব-আর্য সংস্কৃতিতে স্বয়ম্ভু তা নন। ঋগ্বেদের রুদ্রকে অথর্ববেদেই প্রথম উল্লেখ করা হয়েছে ভব বা পশুপতি বলে। অথর্ববেদ সম্ভবত অসুর-আর্যদের দ্বারা রচিত। সেই অর্থে কিন্তু এই আর্যরাই ভারতের আদি আর্য হতে পারেন। কারণ, একটি মতবাদে দেখা যায়,—অসুর-আর্য, যাঁরা দেব-আর্যদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে ভারত থেকে ইরাণে গিয়ে বসতি স্থাপত করেছিলেন—তাঁরা দেবতাদের দৈত্য হিসেবে কল্পনা করতেন। এদের এরা অপশক্তি হিসেবে ভাবতেন। এদের যথার্থ দেবতা ছিলেন অহুর (ভারতে যাঁকে তাঁরা বলতেন অসুর)। ঋগ্বেদেও কোন সময়ে অশুরকে প্রাণপ্রদ দেবতা হিসেবে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছিল।

অসুর-আর্যদের মধ্যে যাঁরা স্থির বসতি স্থাপন করেছিলেন তাঁদেরই দেবতা ছিলেন অহুর। যাঁরা ভ্রাম্যমাণ যাযাবরের জীবন যাবন করতেন তাঁরাই পুজো করতেন দেবতাদের। মধ্য এশিয়া ছিল এঁদের বিচরণ ক্ষেত্র। দেব-আর্যদের আদি বাসস্থান ছিল মজেন্দ্রন মধ্য এশীয় স্তোপর সীমান্ত অঞ্চল।

অসুর-আর্যদের পশুপতিই সম্ভবতঃ ঋগ্বেদে এসে রুদ্র হয়েছেন। তবে ঋগ্বেদ সংহিতাতে রুদ্র শব্দ অগ্নিবাচক, শিববাচক নয়। যেমন,

'জরাবোধ তিদ্বিবিঢ্টি বিশে বিশে যজ্ঞিযায় স্তোমং রুদ্রার্থ দৃশিকং।'

তবে দ্রাবিড়দের 'শিব' শব্দ ও ঋগ্বেদের 'রুদ্র' শব্দ আবার সমার্থবোধক। সংস্কৃতে রুদ্রের অর্থ রক্তবর্ণ। দ্রাবিড় ভাষাতেও শিব অর্থ রক্তবর্ণ। শিবন তামিল = রক্ত বর্ণ। ODBL. p 41 Rupa 1985।

সিন্ধু উপত্যকায় অসুর-আর্যদের যে পশুপতির চিত্র পাওয়া গেছে তিনি একদিকে যেমন পশুপরিবৃত অপরদিকে তেমনই বৃক্ষনিম্নে আসীন। ঋগ্বেদের

রুদ্রও গাছগাছড়া ও জন্তুজানোয়ারের সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং দুইয়ের সঙ্গে একটা মিল আছেই। মিল থাকার কারণ বোধহয় এই যে, আদিতে আর্যদের এই দুই গোষ্ঠী একই বিশ্বাসভুক্ত ছিলেন।

ঋগ্বেদে রুদ্রের স্থান প্রথম দিকে তেমন উঁচুতে ছিল না। পরবর্তীকালে তাঁর অন্তর্নিহিত ভাব যখন প্রকাশ পেয়েছে তখনই মহান হয়ে উঠেছেন। বিজ্ঞানের মতে রুদ্র হলেন গতিতত্ত্ব— Big Bang-এর ফলে যে গতি ছুটে গিয়ে দেশ (space) সৃষ্টি করেছে। তিনি নিজে আবার সৃষ্ট হয়েছেন মহাদেশ (supervoid) থেকে। তত্ত্বের দিক থেকে ব্রহ্মা হলেন প্রকাশতত্ত্ব, বিষ্ণু দেশ— তত্ত্ব ও রুদ্র বা শিব গতিতত্ত্ব। এই তিন তত্ত্ব পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে নিকট সম্পর্কে যুক্ত। এই কারণেই এই তিন প্রতিনিধি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর একাত্ম হয়ে ত্রিত্ব গঠন করেছেন।

রুদ্রকে দেখা যায়, প্রধানত তিনি তীর-ধনুকে সজ্জিত। কখনও কখনও তাঁর সঙ্গে দেখা যায় বজ্রবিদ্যুৎকেও। বেদে তিনি ক্ষতিকর দেবতা হিসেবেই যেন চিত্রিত। তবে এটাই যে তাঁর একমাত্র দিক তা নয়। তিনি আরোগ্যেরও কারণ। এজন্যে তিনি শ্রেষ্ঠতম বৈদ্য হিসেবেও চিহ্নিত। দেব-আর্যরাও শেষ পর্যন্ত তাঁকে মেনে নিয়েছেন। তাঁকে স্তব করছেন বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য; আবার মানুষ ও পশুর জন্য কল্যাণপ্রদায়ক হিসেবেও তাঁকে আহ্বান করেছেন। সেই জন্য দেখা যায়, রুদ্র শেষ পর্যন্ত শিব বা কল্যাণের দেবতা হয়েছেন। এই কল্যাণপ্রদ দিকে যাত্রা শুরু ঋগ্বেদের কাল থেকেই। পরে তাঁর কল্যাণপ্রদ গুণটি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই জন্য বেদোত্তর যুগে রুদ্র শেষ পর্যন্ত শিব নামেই পরিচিত হয়েছেন। কারণ, রুদ্র নামটি ক্ষতিকর দিকের ইঙ্গিতই বেশি বহন করে।

রুদ্রের যথার্থ উৎপত্তি কোথা থেকে তা আজও নিশ্চিতরূপে স্পষ্ট নয়। ঋগ্বেদ পাঠ করলে দেখা যায়—আদিতে তিনি বজ্রঝঞ্ঝার ধ্বংসাত্মক দিকটিরই প্রতিনিধিত্ব করতেন। তিনি পর্বতশৃঙ্গ ও অরণ্যের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। কারণ, বিশ্বাস ছিল যে, ঝড় ঝঞ্ঝা রোগাদি নেমে আসে পর্বতশৃঙ্গ ও পার্বত্য অরণ্য থেকেই।

ধীরে ধীরে সকল চিত্রটিই পাল্টে যায়। পরবর্তীকালে তিনি পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক হয়ে ওঠেন। তাঁর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রূপ ফুটে উঠে নটরাজের মধ্যে। নটরাজ রূপে তিনি সৃষ্টি করেন, ধ্বংস করেন, আবার বিশ্বনৃত্যে সৃষ্টিকে ধরেও রাখেন।

নটরাজের মূর্তি নৃত্যময় ভঙ্গীতে যে প্রতীক সৃষ্টি করেছে তা এই : এই নৃত্যের মধ্যে শুধুমাত্র মহাজাগতিক বৃত্তায়িত সৃষ্টি ও ধ্বংসের রূপই ফুটে উঠেনি প্রতিদিনকার জন্ম-মৃত্যুর ছন্দও ফুটে উঠেছে। এ মূর্তি এটাও ইঙ্গিত করছে যে, জগতের বিচিত্র রূপের সবটাই মায়া, কোনটাই নিত্য নয়। বিশ্বনৃত্যের শক্তি

প্রবাহে সবকিছুই নিত্য পরিবর্তনশীল। নটরাজের দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন অর্থ এই ধরনের :

তাঁর সকল দেহভঙ্গিমায় যে ভয়ঙ্কর ভাব ও প্রশান্তি ফুটে উঠেছে তাতে বিশ্বনিখিলের মায়াই প্রকটিত হয়েছে। তাঁর তরঙ্গায়িত হস্তভঙ্গিমা ও পদদ্বয় এবং মোচড় খাওয়া মধ্যদেহ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অক্লান্ত জন্ম-মৃত্যুর কথা ঘোষণা করছে। দুই হাতে রয়েছে জন্ম ও মৃত্যুর সাম্যাবস্থা। অপর দুই হাতের এক হাতে ধ্বংস ও অপর হাতে সৃষ্টির ইঙ্গিত।

দক্ষিণ ঊর্ধ্ব হস্তে রয়েছে ডম্বরু। এই ডম্বরু হল Big Bang-এর বিস্ফোরণের শব্দ—ওঁ। এই ওঁ- দ্বারাই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। ঊর্ধ্ব বাম হস্ত যাতে ধৃত রয়েছে লেলিহান অগ্নিশিখা— তা মৃত্যুর সূচনা করছে। হাত দুটি এমন ভাবে প্রসারিত যে, তাতে গতিময় ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম ও মৃত্যুর সাম্যাবস্থা বুঝায়। মধ্যস্থলে নটরাজের যে প্রশান্ত ও নিরাসক্ত মুখমণ্ডল দেখানো হয়েছে তাতে এ ইঙ্গিতই প্রকটিত হয়েছে যে, জন্ম ও মৃত্যুকে অতিক্রম করে প্রশান্ত একটি উত্তরণীয় অবস্থা আছে—যাতে মেরুপ্রান্তিক বৈপরীত্য তার সকল প্রকার পার্থক্য হারিয়ে ফেলে। দ্বিতীয় দক্ষিণ হস্ত এমন ভাবে উত্থিত হয়েছে যাতে 'ভয় পেওনা' এমন একটা ভাব প্রকাশ পেয়েছে। এই ভঙ্গিমা আরও বোঝাবার চেষ্টা করছে যে, এই হাত রক্ষা করবে ও শান্তি দেবে। নিম্ন বাম হস্ত উত্থিত বাম চরণের দিকে নির্দেশ করছে। এতে এটাই বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে, মায়া থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। দেখা যাচ্ছে নটরাজ একটি দৈত্যপৃষ্ঠে নৃত্যরত। এই দৈত্য হল মানুষের অজ্ঞানতা। মোক্ষের জন্য এ অজ্ঞানতাকে জয় করতে হবে।

মহারাষ্ট্রের এলিফ্যান্টা গুহার শিবের মূর্তিতে তিনটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে। দক্ষিণ দিকে তাঁর মুখ পুরুষের মুখ—বিজ্ঞানে Proton-এর প্রতীক। বাম দিকে মহিলার মুখ—বিজ্ঞানের Electron-এর প্রতীক। মাঝখানে প্রশান্ত মুখে দুইয়ের সাম্যাবস্থা-neutron-এর প্রতীক।

রুদ্রকে বহিরাগত বলে মনে করা হলেও ঋগ্বেদে খুব একটা গৌণ দেবতা নন। ঋগ্বেদে কোন্ দেবতার উদ্দেশে কতগুলি সূক্ত রচনা করা হয়েছে তা দিয়ে কারো গুরুত্ব প্রমাণ হয়না। এই প্রাচীন ধর্মগ্রন্থটির অনেক কিছুই সূক্তগুলির আড়ালে লুকিয়ে আছে। দেবতাদের গুরুত্ব বিচার হয় তাঁরা যে ধরনের কাজ করেন তাই দিয়ে। এদিক থেকে ঋগ্বেদে রুদ্র একটি পিতৃপ্রতিম চরিত্র। অন্যান্য বহু দেবতারই তিনি পিতা। ঝড়ের দেবতা ও মরুৎ দেবতারা রুদ্রেরই সন্তান। রুদ্র এখানে উগ্র নন।

অনেকে রুদ্রকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীয় একটি ব্যাপার বলে মনে করেন। মৃগব্যাধ নক্ষত্রকেই তাঁরা রুদ্র বলে মনে করেছেন।

রুদ্রকে অনেকে ব্রাত্য বলেও মনে করেন। এ-জন্য দায়ী একটি পুরাণ-কাহিনী— যেখানে রুদ্র দক্ষযজ্ঞ নাশ করেছিলেন। এই গল্পে শিব যজ্ঞনাশকারী

হিসেবে প্রতীয়মান। দক্ষ রুদ্র বা শিবকে পূজা করতে অস্বীকার করেছিলেন— এই জন্য শিবকে বেদবাহ্য বলে মনে করা হয়। এবং সেই কারণেই শিবকে অনেকে অনার্য বলে ভাবেন। কিন্তু দক্ষদুহিতা সতী শিবকে 'স্বয়ং যজ্ঞ' বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁকে বেদ বলেও চিহ্নিত করা হয়েছে। যজ্ঞনাশ শেষে দক্ষ শেষ পর্যন্ত শিবকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। আসলে প্রজাপতি বা ত্বষ্টা হলেন স্বয়ং যজ্ঞ। সময়ের বা কালের দেবতা হিসেবে রুদ্র তাঁকে হত্যা করতে বাধ্য ছিলেন।

দক্ষযজ্ঞনাশের একটি তান্ত্রিক বা যৌগিক গুরুত্ব এই ধরনের :- প্রজাপতি জগতের অধীশ্বর। অহং ত্যাগ করে অর্থাৎ যজ্ঞ (sacrifice) করে আত্মস্থ হয়ে আছেন। তাঁকে হত্যা করতে না পারলে জগৎ প্রকাশ পাবেনা। আত্মস্থ প্রজাপতিই সৎ। তাঁর আত্মজা অর্থাৎ আত্মা থেকে জাত শক্তি হলেন সতী। কালের অধীশ্বর (শিব) তাঁকেই কালের সঙ্গে বের করে নিয়ে আসেন। এই জন্য তাঁকে কালের (শিবের) সহধর্মিনী হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে।

সতী অর্থাৎ সতের গুণ ৫১টি তরঙ্গে দেশে ছড়িয়ে পড়েই জগৎ সৃষ্টি করেছিল। এই জন্যই কল্পনা করা হয়েছিল যে, দেশের দেবতা বিষ্ণু—যিনি এই তরঙ্গগুলিকে বহন করছেন, কালচক্র (সুদর্শন চক্র, ছন্দময় নৃত্যায়িত ও বৃত্তায়িত তরঙ্গ) দ্বারা তাঁকে খণ্ড বিখণ্ড করেছিলেন। এই গুহ্যতত্ত্ব জানা থাকলে রুদ্রকে অনার্য বলে বোধ হয়না। অপর পক্ষে বিশ্বযজ্ঞে অর্থাৎ, Big-Crunch-এ জগৎ নাশ করেও শিব 'প্রকাশিত যজ্ঞ' অর্থাৎ প্রজাপতিকে নাশ করেন। এই অর্থে দক্ষ হলেন দেবতার বহিরাবয়ব। শিব হলেন অন্তর্দেবতা— অধ্যাত্ম জ্ঞান। আসলে অধ্যাত্ম জগতে শিব হলেন সেইসকল ঋষিরই প্রতিনিধি যাঁরা বাহ্যিক নিয়ম বা অনুষ্ঠানের ধার ধারতেন না— বর্ণাশ্রম মানতেন না। সুতরাং, রুদ্র বা শিবের কাহিনী সেই আর্যদেরই কাহিনী যাঁরা বহিরানুষ্ঠানের উপর আন্তর সাধনাকে বেশি মূল্য দিতেন। ঋগ্বেদে রুদ্রকে মরুৎদের পিতা হিসেবে দেখানো হয়েছে, যে মরুতেরা ঋষি পুরুষ। এঁরা আন্তর সাধনা দ্বারা সত্য জ্ঞান লাভ করেছিলেন ঋগ্বেদে এমন উল্লেখ আছে।

আসলে আধুনিক গতিবিজ্ঞান ও শিবের গতিতত্ত্বের মধ্যে এমন একটা অদ্ভুত মিল আছে যে, সেটাই সবথেকে অবাক করে দেবার মত। সেটা লক্ষ্য করলে এটাই মনে হয় যে, প্রাচীন ঋষিরা শিবের কল্পনা করেছিলেন প্রকৃতির একটা অমোঘ নিয়ম লক্ষ্য করে। সেই নিয়মকে বলে-- The Principle of Motion. কিন্তু সেই বৈজ্ঞানিক তথ্য আলোচনা করার আগে বস্তুবাদী ঐতিহাসিক ও অঋষি দার্শনিকদের দৃষ্টিতে শিব ও শিবতত্ত্ব যে ভাবে ধরা পড়েছে তাই আলোচনা করে নেওয়া যাক।

আদি বৈদিক যুগে প্রকৃতির কয়েকটি ভয়ঙ্কর প্রকাশকে ব্যক্তিরূপ দান করে রুদ্র রূপে স্তুতি করা হ'ত, যেমন, ঝড়ঝঞ্ঝা, বজ্রবিদ্যুৎ ও অরণ্যাগ্নি। এই কারণে ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের চতুর্দশ সূক্তের অষ্টম পংক্তিতে শিব যাতে

কল্যাণপ্রদ ও দয়ালু হন সেই উদ্দেশে প্রার্থনা জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, 'ক্রোধবশতঃ আমাদের সন্তানদের ক্ষতি কোরো না, উত্তরাধিকারীদের ক্ষতি কোরো না; আমাদের জনগণ, পশুপাল ও গৃহের ক্ষতি কোরো না। আমাদের মানুষজনকে হত্যা কোরো না। আমরা পূজার্ঘ্য সহকারে তোমাকে প্রার্থনা জানাচ্ছি'।

শতরুদ্রীয়-তে দেখা যায়, রুদ্রকে শত নামে প্রার্থনা জানানো হচ্ছে। বর্তমানেও এই ধরনের প্রার্থনা চালু আছে। শিবকে বলা হয়েছে পর্বতবাসী বা গিরীশ। তাঁকে দেখানো হয়েছে নীলকণ্ঠ ও আরক্তিম ঝড়ের মেঘের মত মুখ করে। মাথায় বেণী পাকানো চুল ও পরিধানে পশুচর্ম। শিবকে স্তুতি করা হয়েছে অরণ্যের দেবতা, চোর জোচ্চোরের দেবতা ও যমের সঙ্গে বসবাসকারী দেবতা হিসেবে। আবার লতাগুল্ম হাতে আরোগ্যের দেবতা হিসেবেও তাঁকে চিত্রিত করা হয়েছে। তাঁর হাতে দেখা যাচ্ছে ডম্বরু, তিনি ত্রিসূত্র ধারণ করে আছেন। তাঁকে বলা হচ্ছে পশুপতি, যিনি বন্যপশুর মত ভয়াবহ। সেই জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে, তিনি যাতে শঙ্কর অর্থাৎ কল্যাণপ্রদ হন, শম্ভু, যাতে দয়ালু হন। তাঁকে প্রশংসা করা হচ্ছে শিব অর্থাৎ মঙ্গলময় হিসেবে। বাজসনেয়ি সংহিতাতে রুদ্রের বদলে তাঁকে শিব নামে অভিহিত হতে দেখা যায়। অথর্ববেদ, ঐতরেয় ও সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণেও তাঁকে শিব নামে অভিহিত করা হয়েছে। প্রত্যেক শৈবকেই দেখা যায় তাঁরা রুদ্রশিবকে শ্রেষ্ঠ দেবতা বা মহাদেব কিংবা মহেশ্বর নামে সম্বোধন করছেন। বিশ্বশাসক রূপে ঈশান হিসেবেও তাঁকে প্রার্থনা জানানো হয়। শ্বেতশ্বতর উপনিষদে বলা হয়েছে, রুদ্র-শিবকে বিশ্বাস ও প্রেমের মধ্য দিয়েই শুধু জানা যায়।

শ্বেতশ্বতর উপনিষদ হল ভক্তিসূত্রের তোরণ স্বরূপ। এখানেই প্রথম বাসুদেব কৃষ্ণের পরিবর্তে শিবকে ভক্তিঅর্ঘ্য নিবেদন করা হয়—যে ভক্তিসূত্র যথার্থরূপে শ্রীমদভগবদ্‌গীতাতেই চূড়ান্ত সিদ্ধি অর্জন করেছিল।

উপনিষদে দেখি বলা হচ্ছে যে, বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড ও ঐতিহ্যের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত সেই আর্যদের সকলেরই রুদ্র-শিবের পূজা করা উচিত। উপনিষদে দেখা যায় বৈদান্তিক ও সাখ্য দর্শন বিরাট মূল্য লাভ করেছে। অপর পক্ষে ধ্যান ও যোগাভ্যাস অধ্যাত্মতাকে একটা মরমিয়া রূপ দান করেছে। শতরুদ্রীয়তে দেখা যায় বহু রুদ্রকে একত্রে 'গণপতিম' নামে শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে। গণপতি অর্থ হল উপজাতি সমূহের প্রভূ এবং সেনাপতি। রুদ্রপূজারী অবৈদিক কুম্ভকার, সূত্রধর, কর্মকার, রথনির্মাতা, নিষাদ ও অরণ্যচারীদের পর্যন্ত এই গ্রন্থে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। শিবকে এখানে 'ভব' অর্থাৎ শাশ্বত স্রষ্টা, 'সর্ব' অর্থাৎ সংহারক ও 'শরনিক্ষেপক' প্রভৃতি নামেও শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। রুদ্রের অন্যতম একটি নরম প্রকৃতি হিসেবে দেখানো হয়েছে অগ্নিকে। পূর্ব ভারতীয় মানুষ একেই বলেন সর্ব। বাহিকরা বলেন, ভব বা 'পশুনাম পতি'। অগ্নি ব্যতীত

এই সব ভিন্ন নামকে অসংস্কৃত বলে মনে করা হয়। অথর্ববেদে দেখি রুদ্রকে লক্ষ্য করে প্রার্থনা জানানো হচ্ছে, যাতে তিনি তাঁর পূজারীদের অশুভ শক্তি থেকে রক্ষা করেন। প্রার্থনা এই : 'চিৎকারকারিণী আলুলায়িত কেশ মহিলা দৈত্যরা আমাদের কাছ থেকে দূরে থাক।' বৌদ্ধতন্ত্রে এই ধরনের মহিলাকে হাকিনী বলা হয়েছে— যারা উচ্চৈস্বরে চিৎকার করে।

অথর্ববেদে আরও বলা হয়েছে যে, মহাদেব নামে তিনি দ্যু-লোককে, রুদ্র নামে ভূ-লোককে এবং ঈশান নামে অন্তরীক্ষ লোককে শত্রুমুক্ত করেন। দক্ষিণাঞ্চলকে তিনি বিপদমুক্ত করেন উগ্র নামে, এবং পূর্বাঞ্চলকে ভব নামে। ভব ও সর্বকে অথর্ববেদে 'ভূতপতিম' বলা হয়েছে। ভূতপতিম অর্থ অশুভশক্তির প্রভু। সেই জন্য বলা হয়েছে—"তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই যাঁর ধ্বংসাত্মক শক্তি কাশি ও বজ্র, অশ্বের হ্রেষার মত আঘাত করে।"

মহাকাব্য ধরনের 'ভাগবতপুরাণে' দক্ষযজ্ঞনাশের কাহিনী রয়েছে। সেখানে দক্ষকে শ্রদ্ধা না জানানোর জন্য দক্ষ শিবের উদ্দেশে যে সব কটূক্তি করেছেন তাতে দেখি তাঁকে বলা হচ্ছে অশুচি, বেদানুষ্ঠানবিরোধী, শ্মশানচারী, ভূতপ্রেত পরিবৃত, উন্মাদ, উলঙ্গ, অবিন্যস্তকেশ, অট্টহাস্যকারী, ক্রন্দনাতুর, শ্মশান ভস্মচর্চিত ও নরকরোটীমাল্যধারী। শিব হিসেবে নিজেকে তিনি দাবি করছেন বটে, আসলে তিনি অশিব। তিনি উন্মাদ ও ভূতেশ্বর। দেবতাদের মধ্যে শিব ভব রূপে নিকৃষ্টতম। ইন্দ্র ও বিষ্ণুর পাশে পূজা পাবার অধিকারী নন।

ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে, কাহিনীটি হল বৈদিক ঐতিহ্য ও ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যের হাত থেকে ভারতীয় অধ্যাত্মতার দিক পরিবর্তনের একটা ইঙ্গিত মাত্র— যখন আর্যজগতের প্রান্তদেশীয় নিষাদশ্রেণী ও দ্রাবিড়দের আসুরিক দেবতা ও দেবপর্যায়ে উন্নীত বিশিষ্ট নেতারা আর্য-মন্দিরে স্থান করে নিয়েছিলেন। এই নিষাদ ও দ্রাবিড়েরা বেদপাঠ ও বৈদিক অনুষ্ঠানের অধিকারী ছিলেন না। অথচ দেশের বিস্তির্ণ প্রান্ত জুড়ে নানা 'থানে' এই সব দেবতা সাধারণ মানুষের পূজা পেতেন, বলি পেতেন। এই পূজার সঙ্গে যুক্ত ছিল তুক্‌তাক মন্ত্রতন্ত্র ইত্যাদি। এ-সব থানে পূজারী ছিলেন কোন ব্রাহ্মণ নন, স্থানীয় গুণিনরা। ক্রমশ যখন এই সব আঞ্চলিক সাধারণ মানুষের 'থানগুলির' গৌরব বৃদ্ধি পায়, সম্পদ বৃদ্ধি পায়, ঐই থানগুলিই মন্দিরে রূপান্তরিত হয়। আদি জনগোষ্ঠীর 'থানীয়' দেবতারাই ধীরে ধীরে মর্যাদা বৃদ্ধি ক'রে শিব বা বিষ্ণুর কোন অংশ হিসেবে বা তাঁদের শক্তির ভিন্নরূপ প্রকাশ হিসেবে সেই সব মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম বর্তমান হিন্দুধর্মের রূপ নিতে থাকে। তখন ভারতীয় আদি জনগোষ্ঠীর অসংখ্য দেবদেবী পুরাণ-কাহিনীর চাদর গায়ে জড়িয়ে কোন না কোন ভাবে বৈদিক দেবদেবীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে হিন্দু মন্দিরে এসে স্থান করে নেন।

হিন্দুধর্মে এসে ব্রাহ্মণদের প্রভাবে পড়ে এইসব আঞ্চলিক দেবদেবীর মধ্যে দেবতা হন শিব, তাঁর সহধর্মিনীদের কেউ হন কালী, কেউ ভবানী। এরা সবাই

শিবের শক্তি বা সহধর্মিনী হিসেবে স্বীকৃতি পান। ব্রাহ্মণদের প্রভাবে পড়ে নরবলি প্রথা বন্ধ হয়ে যায়। বলিপ্রথার পরিবর্তে আসে ধূপ ও ফুল। এই সব দেবদেবীর পূজারী হন আঞ্চলিক গুণিনদের পরিবর্তে ব্রাহ্মণেরা।

তবে আদি নরগোষ্ঠীর পুজোর ধারার সবটাই যে উবে যায়—তা নয়। বৎসরের কোন কোন সময় বলিদান হয়ে থাকে। থানের গুণিনদের ভারতীয় ক্ষত্রীয় সমাজে ঢুকিয়ে নেওয়া হয়। নানা কাহিনী তৈরি করে এদের বংশমর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এখনও এমন এমন ক্ষেত্র আছে যেখানে ব্রাত্য পারিয়া জাতের গুণিনরা আগে মন্দিরে প্রবেশের অধিকার পান। ওড়িশাতে যেমন আছে, জগন্নাথের মন্দিরে ঢোকার আগে ডোমের ঝাঁটা খেতে হয়। এইসব গুণিন পূজারী পূজা দিলে তবে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা পূজার সুযোগ পান। এরকম একটা মন্দির আছে দক্ষিণ ভারতের শ্রীশৈলমে। গল্প আছে, খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মল্লিকার্জুন মন্দিরে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের কন্যা নিত্য মল্লিকা ফুলে বেদি সাজিয়ে দিতেন।

নাগার্জুন নাকি বৌদ্ধ ভিক্ষু ও বৌদ্ধধর্মানুসারিদের ঐ মন্দিরে এসে বাস করতে বলেছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রগ্রন্থাদিও এই মন্দিরে এনে রাখা হয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয়ের পর ব্রাহ্মণেরা এই মন্দিরের নিয়ন্ত্রণ পান। এই মন্দিরকে তখন ভগবান শিব ও তাঁর শক্তির উদ্দেশে নিবেদন করা হয়। এখানে শক্তির নাম মাধবী বা ব্রহ্ম-রম্ভা। দক্ষিণ ভারতে এই একটি মন্দির, যেখানে সমস্ত জাত ও ধর্মের লোকেরা, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই পূজোয় অংশ নিতে পারেন। চতুর্দশ শতাব্দীতেও সেখানে নরবলি হ'ত। একটি উৎকীর্ণ লিপিতে দেখা যায় এমন ধরনের উল্লেখ রয়েছে : 'দলে দলে কঙ্গু বীরেরা এখানে এসে ধর্মীয় উন্মাদনার বশে তাদের মাথা ও জিহ্বা কেটে দেবতাকে উৎসর্গ করত। ফলে আশীর্বাদপুত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লাভ করত। এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উৎসর্গ করার পরের মুহূর্তেই তাঁরা ত্রিনেত্র, পঞ্চমুখ ও পঞ্চজিহ্ব হয়ে জ্বলে উঠতেন এবং অষ্টশিবে পরিণত হতেন।'

এখনও এখানে যে বাৎসরিক উৎসব হয় তা ফেব্রুয়ারি থেকে আরম্ভ হয়ে মে-মাসের শেষ অবধি চলে। এ সময় কুডাপাহ্-র পুষ্পগিরি মঠের ব্রাহ্মণ পুরোহিতই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। অন্য সময় শৈব সন্ন্যাসীরাই মন্দির দেখাশুনা করেন। পূজার দায়িত্ব থাকে জংলী চেনচুদের উপর। এই ঘটনাই স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, এই মন্দিরের দেবতা ছিলেন আদি নরগোষ্ঠীর দেবতা— যেখানে নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিল। ধীরে ধীরে বৌদ্ধরা মন্দিরের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নেন। তাদের কাছ থেকে মন্দিরের দায়িত্ব তুলে নেন ব্রাহ্মণেরা। তাঁরা আদি জনগোষ্ঠীর এই দেবতাকে হিন্দু ধর্মের মধ্যে নিয়ে এসে শিবরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিরুবত্তীয়ূরের শিব মন্দিরে ত্রয়োদশ শতাব্দীর একটি উৎকীর্ণ লিপিতে পাওয়া যায় যে, এখানে পশুবলি দেওয়া হ'ত। বর্তমানে বৎসরে একবার পশুবলি দেওয়া হয়, দেওয়া হয় মন্দিরের দেবীর উদ্দেশে। এ-

সময় দেবীর উদ্দেশে মদ্য জাতীয় পানীয় উৎসর্গ করা হয়। এতে দেবী প্রসন্না হন বলে বিশ্বাস।

মহিশুরের মেল্‌কোট-এর মন্দিরের সামনে যেমন আদি জনগোষ্ঠীর উপাস্য পিঁপ্‌ড়েব ঢিবি আছে, তিরুবত্তীয়ূরেও তেমনই রয়েছে। এখানে নানা দেবতা বাস করেন বলে বিশ্বাস।

দক্ষিণ ভারতে এখনও জড় ও প্রাকৃতিক পদার্থে প্রাণের আরোপ করে পূজা দেবার বিধি বর্তমান রয়েছে (এটা যে ভ্রান্ত বিশ্বাস নয় বর্তমান বিজ্ঞান জড় পদার্থের মধ্যে প্রাণ ও মানসসত্তার সাক্ষাৎ পেয়ে তা প্রমাণ করেছে। সেই জন্য P. Tompkins and C. Bird তাঁদের বিখ্যাত গ্রন্থ The Secret Life of Plants-এর ভূমিকাতে চমকপ্রদ ইঙ্গিত করে বলেছেন, 'That the awareness of plants might originate in a supramaterial world of cosmic beings to which long before the birth of Christ the Hindu sages referred as "devas" and which as faires, elves, gnomes, sylphs and a host of other creatures, were a matter of direct vision and experience to clairvoyants among the Celts and other sensitives.')। এরা বিশ্বাস করে যে, এতে কোন শক্তি বাস করে। এই পিঁপড়ের ঢিবি বা উইয়ের ঢিবি সম্পর্কে এরকম একটা প্রবাদ আছে যে, পশু চরাতে চরাতে এল্লোরের কাছে একটা গ্রামের মাঠে দুটি রাখাল এই উইয়ের ঢিবি থেকে শিঙ্গার শব্দ শুনতে পায়। কাহিনীটি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে স্থানটি তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। প্রতি রবিবার কম পক্ষে হাজর পাঁচেক নরনারী সেই ঢিবির কাছে সমবেত হয়ে পুজো দেয়—ঢিবির ধুলোতে গড়াগড়ি যায়। (ভারতবর্ষে বহু হিন্দু তীর্থস্থানের এই ভাবেই জন্ম হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও এমন বহু থান আছে যেখানে নানা গল্পকথাকে কেন্দ্র করে তীর্থস্থান গড়ে উঠেছে যেমন, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বাক্‌ড়ার বড়কাছারী, যেখানে প্রতি শনি মঙ্গলবার হাজার হাজার আর্ত নরনারী মনস্কামনা জানাবার জন্য ভিড় করে। শুধু গল্প কথাই লোকেদের দীর্ঘকাল ধরে সেখানে টেনে আনতে পারত না যদি না কিছু কিছু ফল লোকে পেতই। প্রশ্ন উঠতে পারে—এটা কাকতালীয় ব্যাপার। আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার সাফল্যও কিছুটা কাকতালীয় ব্যাপার। সব রুগীকে চিকিৎসকেরা নিরাময় করতে পারেন না। তখনই লোকে অতীন্দ্রিয়ের সন্ধানে হাত বাড়ায়।))।

কিছু কিছু স্থান বাদে দক্ষিণ-ভারতের প্রায় সব গ্রাম-দেবতাই দেবী। হয়তো কোন আত্মা, নয়তো দুর্ভিক্ষ মহামারী ইত্যাদির ব্যক্তিরূপ। ছাগল, মুরগি, শুয়োর, মেষ, মোষ ইত্যাদি বলি দিয়ে এঁদের শান্ত করার চেষ্টা করা হয়। দক্ষিণ ভারতে এইসব ভয়ঙ্কর রোগশোকাদির শক্তিকে দেবী-জ্ঞানে পুজা করার কারণ, মহিলাদের আত্মাকে এরা পুরুষের আত্মার চেয়ে বেশি ভয় করে। এই সব গ্রাম্য-

দেবীদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিবের সহধর্মিণী রূপে কল্পনা করা হয়। আসলে এটা হল এক ধরনের দ্রাবিড় কৌশল। শিবের সঙ্গে তারা তাদের আঞ্চলিক দেবীদের বিবাহ দিয়ে হিন্দু দেবদেবীর মন্দিরে তুলে নেন।

তবে বঙ্গদেশে যেমন বিশ্বশক্তিকে স্ত্রীরূপে কল্পনা করে পুজো করা হয়—দক্ষিণ ভারতে তেমন নেই। এই জন্য মনে করা হয় যে, সেখানে মাতৃদেবীদের গুরুত্বের কারণ হল এই যে, সেখানকার সমাজ মূলত ছিল মাতৃতান্ত্রিক।

দক্ষিণ ভারতে বহু মহাপুরুষকেও দেব পর্যায়ে উন্নীত করে পূজো করার বিধি আছে। বহু শৈবমন্দির খুঁড়ে সখানে নরকঙ্কাল ও চিতাভস্ম পাওয়া গেছে। হয়তো এখানে কোন সাধুসন্তের সমাধি ছিল—যাঁরাই দেবতা রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। কোথাও কোথাও সমাধিস্থানের উপর তোলা স্তম্ভযুক্ত পাথরের ছাদের নিচে শিব-বেদী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

দক্ষিণ ভারতে হিন্দু মন্দিরগুলিকে সম্প্রসারণ করা হয় দশম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে। করেন চোল রাজারা। বাংলার হিন্দু মন্দিরগুলির সংস্করণ ঘটে নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে পাল রাজাদের আমলে। পল্লব, পাণ্ড্য ও চোল শাসকদের প্রথম পর্যায়ে দক্ষিণ ভারতের শিবমন্দিরগুলিতে যে শিবলিঙ্গ প্রাধান্য অর্জন করেছিল তার কারণ বোধহয় এই যে, লিঙ্গের সঙ্গে সমাধি-স্তম্ভের স্পষ্ট মিল। এই সমাধি-স্তম্ভকে বলা হত বীরকল। এই বীরকল স্থাপন করা হত দ্রাবিড় যোদ্ধাদের সমাধির উপর। কখনও কখনও বীরকলকে পুজোও করা হ'ত।

পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের উদ্ভব হয় উত্তর ভারতে গুপ্ত রাজাদের অধীনে। সময় খ্রীষ্টীয় চতুর্থ থেকে পঞ্চম শতাব্দী। এই সময় মহাযানী বৌদ্ধদের মূর্তি পুজার ধারা গ্রহণ করা হয়। বৌদ্ধরা অধ্যাত্মপুরুষদের সমাধির উপর নির্মিত স্তূপকে পূজো করতেন। সেই স্তূপ পূজোকেই হিন্দুরা শিবলিঙ্গে রূপান্তরিত করে পূজো আরম্ভ করে।

শিবকে যে শুধু অর্ধনারীশ্বর রূপেই পূজো করা হয় তা নয়।[১] তাঁর সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাকে নন্দিরূপ ষাঁড় ও গৌরীপট্টসহ শিবলিঙ্গ। সাধারণত কল্পনা করা হয় লিঙ্গের প্রথম প্রকাশ খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে। এর একটি পাওয়া গেছে ভিটা-তে— লক্ষ্ণৌ যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। আর একটি পাওয়া গেছে

---

[১] এই অর্ধনারীশ্বর কল্পনার মধ্যে একটা বিরাট বৈজ্ঞানিক সত্যও লুকিয়ে আছে। এটা বিজ্ঞানের নিউট্রন তুল্য। বিজ্ঞানী Gamow-এর মতে মহাবিশ্বের আদি বস্তুসত্তা হ'ল ঘনীভূত নিউট্রন—যা অতিরিক্ত চাপের ফলে ভেঙে গিয়ে স্বতন্ত্র নিউট্রন সমুহ তৈরি করে। এই সব স্বতন্ত্র নিউট্রন থেকে স্বতই ফুটে বেরয় প্রোটন ও ইলেকট্রন। এই প্রোটন হল পুরুষ, ইলেকট্রন নারী—যারাই নাকি একত্রে যুক্ত হয়ে

উত্তর আর্কটের গুড়িমল্লম-এ। তবে হাইনরিশ জিমার তাঁর 'আর্ট অব্ ইন্ডিয়ান এশিয়া' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, প্রাচীন সিন্ধু উপত্যকাতেও শিবলিঙ্গের সন্ধান পাওয়া গেছে। ছবিসহ তিনি তা তুলেও দেখিয়েছেন। সেক্ষেত্রে শিবলিঙ্গের কল্পনা অতি প্রাচীন।

তবে এই লিঙ্গ-কল্পনার মধ্যে লজ্জা পাবার মত কোন কিছু নেই। এ হল শিবশক্তি, পুরুষ-প্রকৃতি, পিতা-মাতা, শক্তি ও বস্তুর কল্পনা—সৃষ্টির পূর্বে যা একত্রে যুক্ত অবস্থায় ছিল। বিশ্ব-সৃষ্টির এই হল উৎস। এই জন্যই হিন্দুরা কয়েক হাজার বৎসর ধরে শ্রদ্ধাবনত ভাবে এই শিবলিঙ্গের পুজো করে আসছে। এর মধ্যে অশ্লীলতার কোন গন্ধ খুঁজে পায়নি।

দক্ষিণ বোম্বাইয়ের লিঙ্গায়ৎরাই লিঙ্গপূজার সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক। মাদ্রাজেও বিরাট সংখ্যক লিঙ্গায়ৎ রয়েছে। বঙ্গদেশ শক্তিপূজারী হলেও সেখানেও শিবলিঙ্গ পূজা প্রচলিত। বর্তমানে ভারতবর্ষের সর্বত্রই শিবলিঙ্গ পূজা চালু আছে।

মাতৃশক্তি ও পুরুষকে একত্রে যুক্ত করে সৃষ্টির আদি উৎস কল্পনা অত্যন্ত প্রাচীন। প্রতীকের সাহায্যে পুরুষ-প্রকৃতির এই একাত্মরূপ কল্পনা করেছিলেন তাঁরা। এই প্রতীকই হল শিবলিঙ্গ। শিবলিঙ্গের গৌরীপট্ট বা যোনি দ্বারা বুঝিয়েছেন মাতৃশক্তিকে এবং লিঙ্গ দ্বারা পুরুষকে। শিব হিসেবে লিঙ্গকে যদি তাঁর প্রতীক হিসেবে ভাবি তাহলে কিন্তু আশ্চর্য প্রতীকী শিল্পের ব্যঞ্জনা রয়েছে সেখানে। পরবর্তী কালের তন্ত্রগ্রন্থে দেখা যায় লিঙ্গ হল সদাশিবের প্রতীক। আর এই সদাশিব অর্থ পুরুষের মনে যখন কেবলমাত্র জেগেছে বিশ্বকল্পনা, কিন্তু তার বস্তুরূপ দেখা দেয়নি। উপনিষদের কথায় অহম ও ইদম এক হয়ে আছে। লিঙ্গ ও যোনি একত্রে যুক্ত থাকা হল প্রথম উন্মেষের প্রতীক। মূর্তি হল ঈশ্বর তত্ত্ব হয়ে প্রকাশ। লিঙ্গ হল লাঙলের প্রতীক। যোনি ক্ষেত্রের। লিঙ্গ ও লাঙল উভয় শব্দই অস্ট্রিক ভাষার অন্তর্ভুক্ত। যোনি হল উপাদান কারণ (material cause)।

থাকে নিউট্রন ফিল্ডের মধ্যে। এই ঘটনাকেই ভারতীয়েরা অর্ধনারীশ্বর মূর্তির মধ্য দিয়ে কল্পনা করেছেন। এই আদি পিতামাতার একত্রে রূপ কল্পনা শুধু ভারতবর্ষেই নয় পৃথিবীর অন্যত্রও ছিল। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মাওরিদের দেশে পিতামাতার একত্রে সংযুক্ত মূর্তি আছে। মিশরে আতুমকে বলা হ'ত He-She-God. আপন ইচ্ছায় কারণ সলিল থেকে তিনি ফুটে উঠেছিলেন। তিনি নিজের দেহ থেকে শু (প্রোটন) ও তেফনুৎ (ইলেকট্রন) নির্গত করেছিলেন। উভয়ের মিলনে স্বতন্ত্র আত্মার সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রন মিলে হাইড্রোজেন অণুর সৃষ্টি হয়। মধ্য আমেরিকার ওম্‌টিওটল-এর মধ্যেও আদি পিতামাতা একত্রে যুক্ত ছিল। তাঁর বাস ছিল জগতের কেন্দ্রস্থলে অর্থাৎ নিউট্রন ফিল্ড-এ। তাঁর প্রকাশ হয়েছিল কারণ ছাড়াই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই জন্য বিশ্বাত্মাকে পুরুষ রূপে কল্পনা করা হয়েছে। পতি-পত্নীর যুগনদ্ধ অবস্থাতে তাঁকে কল্পনা করা হয়েছে। তিনি নিজেকে 'পত্' অর্থাৎ বিভক্ত করে নিজে পতি হয়েছেন এবং বিচ্ছিন্ন অংশকে পত্নীরূপে ব্যক্ত করেছেন।

লিঙ্গ হল নিমিত্ত কারণ। শিব যখন অরূপ, তখন তাঁর প্রতীক হল লিঙ্গ। যোনি হল মূলাপ্রকৃতি। পরবর্তীকালে শিবশক্তি সম্পর্কে এই রকম একটা চিন্তা গড়ে উঠেছে যে, শিব আর মাতৃ বা প্রকৃতিরূপা শক্তি এক। শিব হলেন পুরুষ অর্থাৎ মূল। অপরিবর্তনীয় এই সৎ-এর গুণই হলেন শক্তি। অবিচ্ছেদ্য 'এক' দৃষ্টিভেদে দুই।

এই লিঙ্গপূজা এক সময় সারা পৃথিবীতেই প্রচলিত ছিল। মিশরে অসিরিজের পূজো হ'ত তাঁর লিঙ্গকে প্রতীক করে। অসিরিজের সঙ্গে আমাদের শিবের নানা ভাবেই মিল আছে। শিবের শক্তি যেমন ভগবতী, বিশ্বরূপা, অসিরিজের শক্তিও তেমনই তাঁর পত্নী আইসিস। আইসিস পৃথিবীরূপা। তন্ত্রে শক্তির যন্ত্র যেমন ত্রিকোণাকৃতি, আইসিস দেবীর যন্ত্রও তেমনই ছিল ত্রিকোণ। শিব যেমন সংহার-কর্তা—অসিরিজও তেমনই প্রাণসংহারক। শিবের বাহন যেমন বৃষ, অসিরিজের বাহনও তেমনই এপিস নামে ষাঁড়। শিব ও অসিরিজ উভয়েরই শিরোভূষণ সর্প। শিবের হাতে যেমন ত্রিশূল, অসিরিজের হাতেও তেমনই আছে দণ্ড। শিবের মত অসিরিজও পরতেন ব্যাঘ্রচর্ম। শিবের বিল্বপত্রের মত অসিরিজের প্রিয়পত্রও ছিল ত্রিধাবিভক্ত। ভারতবর্ষে শিব নানাস্থান উজ্জ্বল করে থাকলেও তাঁর মুখ্য স্থান যেমন কাশী, তেমনই সারা মিশরে অসিরিজের থান ছড়িয়ে থকেলেও তার মুখ্য স্থান ছিল মেম্ফিস-এ। শিবের প্রিয় যেমন দুধ, অসিরিজও তেমনই ছিলেন দুগ্ধপ্রিয়। তবে পার্থক্য এই যে, শিবের বর্ণ দুগ্ধ ধবল, অসিরিজের বর্ণ ঘোরতর কৃষ্ণ। তবে মহাকাল নামক শিবমূর্তিও আছে—যাঁর বর্ণ ঘোরতর কালো। তন্ত্রসার গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে এই ভাবে ঃ—

"মহাকালং যজেদ্দেব্যাদক্ষিণে ধূম্রবর্ণকম্।
বিপ্রতং দণ্ডখটাঙ্গৌ দংষ্ট্রাভীমমুখং শিশুম্।।"

শ্বেতবর্ণ শিবের অর্থ—তিনি পূর্ণ চৈতন্য বা জ্ঞান। কিন্তু তিনি যখন তাঁরও আগের, আদি, বোধের অতীত, তখন তিনি কৃষ্ণবর্ণ। কৃষ্ণবর্ণ শিব হলেন নিষ্কল শিব যাঁর মধ্যে প্রকাশের ইচ্ছাও জাগেনি। সৎ + চিৎ + আনন্দের তিনি সৎ অংশ। চিৎ-এ তিনি শ্বেতবর্ণ। আনন্দে যোনিযুক্ত শিবলিঙ্গ।

অসিরিজের লিঙ্গপূজার মধ্যে এমন কোন তত্ত্ব ছিল কি না জানি না। তবে প্রাচীন মিশরীয়রাও যে মহান তত্ত্ব ও বৈজ্ঞানিক কল্পনায় কারো অপেক্ষা পিছিয়ে ছিলেন না তা বলাই বাহুল্য। এবং সে বিষয়েও এখানে শিব প্রসঙ্গে আলোচনা করা হবে। তবে আপাত গল্পে অসিরিজের লিঙ্গ পূজার যে কাহিনী পাওয়া যায় তা এই : অসিরিজের ভাই সেট সিংহাসন লোভে অসিরিজকে হত্যা করে নীলনদে ভাসিয়ে দেন। আইসিস পাগলের মত খুঁজে খুঁজে শেষ পর্যন্ত তাঁকে পেয়ে যান। কিন্তু সেট তাঁকে সেই দেহ ফিরিয়ে নিতে দেননি। কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছড়িয়ে দেন। আইসিস আবার ছড়ানো ছিটানো সেই অংশগুলি সংগ্রহ করেন। কিন্তু তাঁর লিঙ্গ খুঁজে পান না। লিঙ্গ বাদে বাকি অংশগুলিকে

একত্রে সংগ্রহ করে আইসিস তা সমাধিস্ত করেন। তবে অসিরিজের লিঙ্গকে প্রতীক করে পরবর্তীকালে সেখানে লিঙ্গপূজার প্রচলন হয়।

এই লিঙ্গপূজা একসময় গ্রীসেও প্রচলিত ছিল। গ্রীসের বহু নগরে, পথে পথে, মন্দিরে মন্দিরে এই লিঙ্গমূর্তি ছিল। গ্রীসে ফেলিফোরিয়া নামে বেক্সদেবের এক উৎসব হ'ত। কাষ্ঠদণ্ডে চর্মলিঙ্গ বেঁধে, মেষচর্ম পরিধান করে বেক্সদেবের শিষ্যরা নৃত্য করত। নৃত্যের সময় তারা গায়ে কালো কালি মেখে নিত।

প্রাচীন ব্যাবিলন ও আসিরিয়াতেও এই ধরনের লিঙ্গপূজার ব্যবস্থা ছিল। রোমানরাও লিঙ্গ পূজা করত। ককেশাস অঞ্চলেও লিঙ্গ পূজার ব্যবস্থা ছিল।

লিঙ্গ পূজা উদ্ভবের ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পেলেও—আধুনিক বিজ্ঞান এর মধ্যে একটি অদ্ভুত বিজ্ঞান-তত্ত্ব খুঁজে পেয়েছে। যদি সমাধিস্তম্ভ লিঙ্গপূজা উদ্ভবের উৎস হয়—তবে সমাধিস্তম্ভ বা Menhir জাতীয় স্তম্ভে অদ্ভুত এক পদার্থ বিজ্ঞানীয় সত্যকে কাজ করতে দেখা গেছে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, এই ধরনের স্তম্ভকে ঘিরে ঘিরে এক ধরনের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স উঠেছে। দেখা গেছে যে, এই শক্তির আবর্তিক গতি মাটি থেকে উঠে স্তম্ভকে সাতটি প্যাঁচে জড়িয়ে উপরের দিকে উঠছে। D.N.A যা উত্তরাধিকার বহন করতে বিরাট ভূমিকা পালন করে— দেখা গেছে তাও এই আবর্তিক ভঙ্গীতেই তৈরি। প্রকৃতির সর্বত্রই এই আবর্তিক ভঙ্গী রয়েছে। বিশ্বপ্রকৃতির সব কিছুই এই আবর্তিক ভঙ্গীতে গতিময়। এই আবর্তিক ভঙ্গী লক্ষ্য করেই সাপকে প্রাচীন প্রায় সব সংস্কৃতিতেই বিরাট মূল্য দেওয়া হয়েছে। চীন, ভারত, এশিয়া মাইনর, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপঞ্জ, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, গ্রেট ব্রিটেন সর্বত্রই ধর্মের ক্ষেত্রে সাপ তাই বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই আবর্তিক ভঙ্গী হল গতির প্রতীক। এই গতি নিম্ন থেকে উর্ধদিকে উঠে গেছে।

ভারতবর্ষে শিবের দেহে যে সর্প জড়ানো রয়েছে তা এই গতিকে বোঝাবার জন্যই। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই এই গতির উপর দাঁড়িয়ে আছে। এই ছন্দময় গতিতে এতটুকু ব্যতিক্রম হলেই বিপর্যয় অনিবার্য। এই ছন্দময় গতি লক্ষ্য করেই বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত প্রকৃতিতে একটি মানসশক্তির ক্রিয়া কার্যকর রয়েছে বলে মনে করেন। এই মানস শক্তিই ঈশ্বরের মানস শক্তি। ফ্যারাওরা মিশরে সর্পশোভিত মুকুট ধারণ করতেন। মধ্য আমেরিকাতে দেবতা কোয়েৎজলকোয়াটলের নামই ছিল পালকময় সর্প। রোমক পুরাণ কাহিনীতে সর্প আরোগ্যের প্রতীক হয়েছিল। আমেরিকাতে প্রবহমান স্রোতস্বিনীর শক্তিকে ড্রাগন হিসেবে দেখা হ'ত। তাদের উড়ন্ত ড্রাগন ছিল অনেকটা দূর প্রাচ্যের ড্রাগনেরই মত। ভারতবর্ষে সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতিতে যেমন এই শক্তিকে লক্ষ্য করা হয়েছিল— তেমনই যোগের লক্ষ্যও ছিল মানুষের অন্তস্থ এই আবর্তিক শক্তি বা সর্পশক্তিকে জাগরিত করা। তাই

কুণ্ডলিনী শক্তিকে প্যাঁচানো সর্পাকৃতিতে দেখানো হয়। শিবলিঙ্গকেও দেখা যায় সাপ জড়িয়ে ধরে আছে। সম্ভবতঃ শক্তির এই আবর্তিত গতিকে লক্ষ্য করেই এমন ভাবনা করা হয়েছিল। ষট্‌চক্রের তিনটি চক্রে এই জন্য শিবলিঙ্গকে সর্পজড়ানো অবস্থায় দেখা যায়। তাকে মূল আধার অর্থাৎ মূলাধার বা ভিত্তিভূমি থেকে সর্বোচ্চ স্থান অর্থাৎ সহস্রারের কূটস্থানে নিয়ে যাওয়াই যোগীদের লক্ষ্য।

শিবলিঙ্গকে ঘিরে সত্যি সত্যিই কোন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স ভূমি থেকে ঊর্ধ্ব দিকে উঠছে কিনা, বিখ্যাত শৈব তীর্থগুলির শিবলিঙ্গকে পরীক্ষা করলেই তা জানা যাবে। জানি না এ ধরনের কোন পরীক্ষা হয়েছে কিনা। হলে অতীন্দ্রিয়তা বাদ দিয়েও এর মধ্যে অদ্ভুত এক বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত হবে। শিবলিঙ্গ তখন বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সবার চোখে নতুন দৃষ্টিতে দেখা দেবে।

শাক্ত—যাঁরা শিবকে পূজো না করে শক্তিকে পূজা করেন, তাঁরা বলেন যে, শিব ও শক্তির সঙ্গম থেকেই বিন্দুর প্রকাশ। বিন্দু থেকেই আসে মহিলাত্মিকা শক্তি—নাদ। এই নাদের মধ্যেই রয়েছে সৃষ্টির সব কিছু উপাদান।

দ্বাদশ শতাব্দীতে রামানুজ বলেছেন যে, শৈবদের মধ্যে দুটি চূড়ান্ত সম্প্রদায় ছিল, যেমন, কাপালিক ও কালামুখ। তাঁরা যে তত্ত্ব পোষণ করত তা বেদ বিরোধী। কাপালিকেরা ধ্যানের সাহায্যে নির্বাণ লাভের পক্ষপাতি। কালামুখেরা নরকরোটিকে পানপাত্র হিসেবে ব্যবহার করত। এদের প্রধান মন্দির ছিল শ্রীশৈলমে। এরা চিতাভস্ম গায়ে মেখে থাকত। মড়ার মাংস খেত। হাতে রাখত গদা। মদ্যপাত্রকে দেবস্থান মনে করে দেবতার উদেশে তাঁদের বলি নিবেদন করত। মদ্য দ্বারা তর্পণ করত। এই জন্য উজ্জয়িনীতে শঙ্করাচার্যের সঙ্গে এদের বিতর্ক হয়েছিল। উজ্জয়িনীতে শিব 'ভৈরব' নামে পরিচিত ছিল। তন্ত্রালোকে অভিনবগুপ্ত এই ভৈরবের অর্থ করেছেন এই ভাবে : "সুখ দুঃখাত্মক সংসার থেকে জগৎ-কে যিনি মুক্ত করেন, তিনি মহাভীম বা ভীষন।" একান্নপীঠের নানাস্থানে শিব এই জন্য ভব ও ভীষণ নামে পরিচিত। ভৈরব তিনি সর্বত্রই।

বেদান্ত সূত্র-ভাষ্যে শঙ্কর বলেছেন—'শৈব বা মাহেশ্বররা মনে করেন যে, পশুপতি বা শিব-ভগবান (পাশ দ্বারা বন্ধ জীবকে বলে পশু। তাদের অধীশ্বরকে বলে পশুপতি) সৃষ্টির আদি কারণ। তিনি পাঁচটি তত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছিলেন—(১) কার্য (ফল) (২) কারণ (৩) যোগ (৪) বিদ্ধি (অনুষ্ঠানরীতি) ও (৫) দুঃখান্ত।

চতুর্দশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মাধব তিনটি শৈবপদ্ধতির কথা বলেছেন। এই তিনটি পদ্ধতি হল তিনটি শৈব সম্প্রদায়ের, যেমন নকুলীশ পাশুপাত, শৈব ও প্রত্যাভিজ্ঞ। নকুলীশ পাশুপতেরা পাঁচটি তত্ত্ব শিক্ষা দেন— যে পাঁচটি তত্ত্বের কথা শঙ্কর উল্লেখ করে গেছেন। যেমন, কার্য, কারণ, যোগ, বিদ্ধি ও দুঃখান্ত। যে গ্রন্থে তাঁরা এই পঞ্চতত্ত্বের কথা বলেছেন তার নাম পঞ্চাধ্যায়ি বা পঞ্চার্থবিদ্যা। শিবের এক

নাম লকুলিন। লকুলিন অর্থ গদাধারী। পুরাণ মতে শিব যোগবলে শ্মশানে কোন মৃতদেহে প্রবেশ করে লকুল নামে অবতাররূপে আবির্ভূত হন। ঘটনাটি ঘটেছিল বরোদার লতা অঞ্চলে। স্থানের নাম—কল্যাবরোহণ বা কারোহন। 'পঞ্চাধ্যায়ি'র লেখক ছিলেন সম্ভবতঃ এই লকুল। সময় খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী। এই পঞ্চাধ্যায়ি থেকেই পরবর্তী শৈবপদ্ধতি আত্মপ্রকাশ করে। মাধবের মতে শৈবদের প্রধান লক্ষ্য হল জীবাত্মার সঙ্গে শিবের মিলন ঘটানো। এ এক ধরনের মরমিয়া ব্যাপার। পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ, ধ্যান ও কর্মবিরতির দ্বারা এটা করা হয়। ফলে সম্বিত্ পর্যায়ে জীবের অধিষ্ঠান হয়। এই পর্যায়ে একটা বোধ থাকে মাত্র, আর কিছু নয়। শৈবরা যোগবলে সিদ্ধপুরুষে পরিণত হন এবং অভূতপূর্ব শক্তি অর্জন করেন। তাঁরা ইচ্ছামত যে-কোন রূপ গ্রহণ করতে পারেন এবং মৃতদের কথা শুনতে পান। ধর্মীয় আবেগ সৃষ্টির অদ্ভুত্ উপায় আছে এঁদের, যেমন নৃত্য, সঙ্গীত, অট্টহাস্য, প্রেমাকুল ভাব, বন্যদের মত কথাবলা, গায়ে ভস্ম মাখা, প্রতিমা থেকে মালা নিয়ে নিজের গলায় পরা এবং উচ্চৈস্বরে 'হুম' শব্দ উচ্চারণ করা। কালামুখদের ভজন পদ্ধতিও লকুলীশ পাশুপত্দের মতই। অনেকে মনে করেন যে, কালামুখদের থেকেই হিন্দু মন্দিরে অশ্লীল ভাস্কর্য স্থান পেয়েছিল। প্রত্যাভিজ্ঞ সম্প্রদায়ই সোহহং এই তত্ত্বের জন্মদাতা। শৈবতত্ত্বের আরো বিকাশ ঘটান একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কাশ্মীরে অভিনবগুপ্ত। সিদ্ধ সোমানন্দের শিবদৃষ্টির উপর ভাষ্য রচনা কালে (প্রত্যাভিজ্ঞ বিমর্ষিনি ও পরামার্থ সার) তিনি শৈব দর্শনের ব্যাপ্তি ঘটান। শিবদৃষ্টির অধ্যাত্ম বক্তব্য আজ আর পাওয়া যায় না। তবে উৎপল নামে অভিনব গুপ্তের এক শিষ্য এর সংক্ষিপ্ত সার রেখে গেছেন। শিবদৃষ্টির বক্তব্যের সঙ্গে তামিলভূমির শৈবসিদ্ধান্ত পদ্ধতির মিল আছে। তবে এই দর্শনের দ্বৈতবাদী সুর কাশ্মীরী শৈবদের অদ্বৈতবাদী দর্শন থেকে মৌলিক ভাবে পৃথক। কাশ্মীরী ও তামিল শৈবদের উদ্ভব ঘটেছিল লকুলীশ পাশুপত্দের দুই মেরুপ্রান্ত থেকে। তবে মরমিয়া অভিজ্ঞতার চূড়ান্ত অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে উভয়েই অসুবিধার মধ্যে পড়েছিলেন। মরমিয়া অভিজ্ঞতার চূড়ান্ত পর্যায় হল জীবাত্মার পরমাত্মার অচিৎ-অবস্থার মধ্যে ডুবে যাওয়া—যার পরিণতি বৌদ্ধদের পরিনির্বাণ বা মহাশূন্যতা। আবার একই সঙ্গে দিব্যভাবে প্রকাশিত ব্যক্তিগত ঈশ্বরের আস্বাদন।

শিবতত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছিল আগম অনুসারে শিবের পঞ্চমুখ থেকে। এই পঞ্চ আনন পাঁচটি ভাবদ্যোতক, যেমন, চিৎ, আনন্দ, ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া। এই পাঁচটি দিকের প্রতিনিধিত্বকারী নাম হল ঈশান, তৎপুরুষ, সদ্যোজাত, অঘোর ও বাম। এখানে শিবের প্রত্যাদেশ দ্বৈতবাদের উপর দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কাশ্মীরে নবম শতাব্দীতে কলট তাঁর স্পন্দসূত্র কারিকা-তে শিবের অদ্বৈত প্রত্যাদেশের কথা জানিয়েছিলেন। এই কাশ্মীর পদ্ধতি 'ত্রিক' নামে পরিচিত। স্পন্দদর্শন অনুসারে জীবাত্মা যথার্থ জ্ঞান লাভ করে যোগ দ্বারা,— যেখানে বিশ্বের সর্বোচ্চ

আত্মা হিসেবে পরম শিব সম্পর্কে জ্ঞান হয়। সেই পরম শিবের মধ্যে জীবাত্মা মরমিয়া প্রশান্ত ভাবে বিলীন হয়ে যায়। প্রত্যাভিজ্ঞ সম্প্রদায়ের মতে জীবাত্মা গুরু পরিচালিত হয়ে নিজের অন্তরানুভূতিতে বুঝতে পারে যে, সে নিজেই ঈশ্বর। সুতরাং মরমিয়া আনন্দে ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বাস করে। কৈবল্য উপনিষদে শিব সম্পর্কে তাই বলা হয়েছে—' তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই শিব, তিনিই ইন্দ্র, তিনি অক্ষয়, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, আপনাতে আপনি পরিপূর্ণ। তিনি বিষ্ণু, তিনিই শ্বাস, তিনিই আত্মা, তিনিই পরমেশ্বর। এ-পর্যন্ত যা হয়েছে তা তিনিই, যা হবে তাও তিনি। তিনি শাশ্বত।'

অথর্ব বেদে বলা হয়েছে—'রুদ্রই শিব যিনি জগতের বিকাশ ঘটান, সৃষ্টি করেন, পালন করেন। নীলরুদ্র উপনিষদে বলা হয়েছে 'আমি পৃথ্বীময়, আকাশ থেকে নীলকণ্ঠ রুদ্রকে অবতরণ করতে দেখি।' পঞ্চব্রহ্ম উপনিষদে চমকপ্রদ বক্তব্য আছে এই ভাবে ঃ— এই ব্রহ্মনগরে (দেহে) হে ঋষি একটি ক্ষুদ্র পদ্মসদৃশ গৃহ আছে। এর কেন্দ্রে আছে সূক্ষ্ম ব্যোম। তিনিই শিব—সচ্চিদানন্দ। মোক্ষকামীরা তাঁর সন্ধান করবেন।'

শিবের যথার্থ চরিত্র নির্ধারণের জন্য, বিশ্বে তাঁর প্রকাশের গুহ্য তত্ত্ব জানার জন্য বিশেষ শৈবতত্ত্ব আত্মপ্রকাশ করেছে। বাস্তব সত্যকে অতিক্রম করে সেই তত্ত্ব এমন এক পর্যায়ে গিয়েছে যে, পূর্ব-ভারতীয় ঋষিদের চিন্তাধারার সঙ্গে যাঁরা দীর্ঘ প্রশিক্ষণের সাহায্যে তৈরি হননি তাঁরা বুঝতে পারবেন না। বলা হয়েছে, শৈব তত্ত্ব বুঝতে হলে আত্মচর্চা, মনঃচর্চা, নৈতিক চর্চা, অধ্যাত্মতা চর্চা, এমনকি দেহচর্চা পর্যন্ত প্রয়োজন। যোগের জন্য এ-সব দিকের চর্চাই অত্যন্ত জরুরী। যোগদ্বারা সীমিত সত্তার পাশগুলি অতিক্রম করে তত্ত্বের বহুমাত্রিক অবস্থাতে যাওয়া যায়। যাঁরা এই ধরনের যোগে অভ্যস্ত, যাদের যোগিন বলা হয়—তাঁরা সরাসরি অভিজ্ঞতায় এই তত্ত্বগুলিকে বুঝতে পারেন, যেমন পদার্থিক সত্তাকে বোঝা যায়।

এই তত্ত্ব হল ৩৬টি। সর্বোপরি তত্ত্ব হল শিবের তথতা অবস্থা,— বিশ্ববিকাশের পূর্বে তিনি যে অবস্থাতে ছিলেন। ভগবান শিব আপন করুণায় নিজেকে বিশ্বজগতে বিকশিত করেছেন পাশবদ্ধ জীবাত্মাকে পরমাত্মার স্বরূপ বুঝিয়ে মুক্ত করতে। অতিক্রান্তিক বোধ দ্বারা কার্য-কারণের অজ্ঞতা থেকে মুক্ত হয়েই এই মোক্ষ অর্জন করা যায়।

বিশ্ববিকাশকে তত্ত্বের মাধ্যমেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কাশ্মীরী শৈবতত্ত্ব ও দক্ষিণভারতীয় শৈবতত্ত্ব সর্বত্রই এই একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এই তত্ত্বে দেখানে হয়েছে যে, পরম ব্রহ্মন বা শিব, শক্তির সঙ্গে সঙ্গমে জীবাত্মার জন্য নানা ভুবনের বিকাশ ঘটিয়েছেন। আদি পর্যায়ে নৈর্বাস্তবিক এই শক্তিকে বলা হয়েছে—মায়া বা শুদ্ধমায়া। এই শুদ্ধ মায়াকেই বলা হয়েছে কুটলী

কুণ্ডলিনী বা বিন্দু বা শক্তি। এর প্রথম প্রকাশই হল নাটম বা বাক্। এ হল বাকের সূক্ষ্ম অবস্থা—বস্তুবিশ্ব আবির্ভাবের পূর্বের অবস্থা।

শিবশক্তি তত্ত্ব থেকে এসেছে সদাশিব তত্ত্ব। সদাশিব তত্ত্ব অবস্থা হ'ল শিবের চিরন্তন অবস্থা—যাকে বলা হয় সাদাখ্য। এখানে জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি পরস্পর সাম্যে থাকে। সাদাখ্য অর্থ বস্তুবিশ্ব সম্পর্কে অধিপদার্থিক ধারণার প্রথম আভায। কাশ্মীরী ও দক্ষিণী ভারতীয় উভয় শৈব তত্ত্বেই এই ধরনের চিন্তা প্রতিফলিত হয়েছে। দক্ষিণ ভারতে শিবশক্তির প্রতীক হিসেবে পদ্মের কল্পনা করা হয়েছে। সেখানে পদ্মের পুং-কেশরকে সদাশিবের সঙ্গে এবং গর্ভকেশরকে শক্তিতত্ত্বের সঙ্গে তুলনা করা হয়। শক্তির উপর বসে আছেন পরম শিব।

বোধাতীত মায়া হল বিন্দুজাত। বিন্দু অর্থ বীজ, ফোঁটা, অস্তিত্ব, যার পরিমাপ করা যায় না। যোগে বিন্দুকে বলা হয় মরমিয়া চক্রের কেন্দ্র। মানুষের দেহের মধ্যে ছয়টি চক্র আছে। চক্র হল গতিময় তাত্ত্বিক কেন্দ্র। এর মধ্যে প্রথম হল মূলাধার— প্রধান অঞ্চল, মেরুদণ্ডের সর্ব নিম্নস্থানে লিঙ্গ ও গুহ্যের মাঝখানে অবস্থিত। এই চক্র বা গতিকেন্দ্রে মন নিবেশ করে যোগীরা প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই পূর্ণজ্ঞান লাভের চেষ্টা করে আসছেন (যদিও চক্রে মনোনিবেশ করার ধারণা সঠিক ধারণা নয়। বর্তমান লেখকের 'দিব্যজগৎ ও দৈবী ভাষা' দু'টি খণ্ড পঠিতব্য)। এই চক্রধ্যান দ্বারা আত্মশক্তির মধ্য দিয়ে অর্থাৎ কুণ্ডলিনীর সাহয্যে সৃষ্টিরহস্য উন্মোচনের চেষ্টা চলে। হঠযোগ ও রাজযোগে কুণ্ডলিনীকে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। মনে করা হয়, দেহের মধ্যভাগ থেকে ৯ ইঞ্চি পর্যন্ত ঝিল্লি দ্বারা আবরিত হয়ে সাপের মত কুণ্ডলীকৃত হয়ে আছে এই শক্তি। যোগে এই জন্য কুটলি, কুণ্ডলিনী, শক্তি, ঈশ্বরী, বিন্দু প্রভৃতি শব্দ দ্বারা মানুষের মধ্যে সৃষ্টিশক্তির উৎসকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়। এই শক্তি স্রষ্টার শক্তি।

শৈব দর্শনে (কাশ্মীর ও দক্ষিণ ভারত) সাদাখ্য তত্ত্ব বা সদাশিব তত্ত্ব হল প্রকাশিত জগতের প্রারম্ভ পর্যায়। শিব-শক্তি তত্ত্ব থেকে এই শক্তির উদ্ভব। সাদাখ্য দ্বারা বোঝায় বস্তুবিশ্বের প্রথম সত্তা (সৎ)-র প্রারম্ভ। এটি যৌগিক মরমিয়া জ্ঞান বা দার্শনিক অনুমানের বাইরে। সাদাখ্য তত্ত্ব দ্বারা যদিও বস্তুবিশ্বের প্রারম্ভ বোঝায়, তথাপি এ তত্ত্ব হল মানসক্রিয়ার আরম্ভ পর্যায়। প্রাণশক্তির প্রথম স্ফুরণ। সুতরাং জগৎ কল্পনাও এ পর্যায়ে অত্যন্ত ক্ষীণ, বহুদিন আগের বিস্মৃত কোন দৃশ্যের মত যা কারো স্মৃতিতে ফিরে আসার চেষ্টা করছে। ঠিক চেতন পর্যায়ের নয়, তার পটভূমির মত।

সৃষ্টিপদ্ধতি এই রকম :—সদাশিব তত্ত্ব থেকে আসে মহেশ্বর তত্ত্ব। মহেশ্বর তত্ত্ব এমন এক পর্যায় যা জ্ঞানকে জীবাত্মার কাছে আবরিত করে রাখে যতক্ষণ পর্যন্ত না তত্ত্বজাত কর্মফল সে ভক্ষণ করে। এর পরই শুদ্ধ জ্ঞানতত্ত্ব আত্মপ্রকাশ করে—যাকে বলা হয় শুদ্ধাবিদ্যা তত্ত্ব। একেই বলা হয রুদ্র ধ্বংস

ও নবসৃজনের উৎস। এই রুদ্র শুদ্ধাবিদ্যার সাহায্যে বিকাশ ঘটায় স্রষ্টারূপে ব্রহ্মা ও পালক রূপে বিষ্ণুর।

শুদ্ধা (শাস্ত্রে সুদ্ধা লেখা আছে) বিদ্যা থেকে আসে অশুদ্ধা মায়া— অর্থাৎ সীমিত অভিজ্ঞতার পঞ্চ তত্ত্ব, যেমন, কাল, নিয়তি (শৃঙ্খলা বা প্রয়োজনীয়তা, যার মধ্য দিয়ে কর্ম তার পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়), কলা (জ্ঞান, যা দ্বারা মানুষ বুঝতে পারে।) বিদ্যা (জীবাত্মার বুদ্ধি-শক্তি), বিদ্যাজাত রাগ (ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা)। রাগ থেকে আসে পুরুষ অর্থাৎ পঞ্চকঞ্চুক (কাল, নিয়তি, কলা, রাগ ও বিদ্যা), আবরিত সীমিত জীবাত্মিক সত্তা কলাতত্ত্ব থেকে আসে প্রকৃতি অর্থাৎ অস্ফুট বস্তুসত্তা। এই অস্ফুট বস্তুসত্তার মধ্যে থাকে তিনট গুণ —সত্ত্ব, রজ ও তম সাম্যাবস্থায়। এ থেকে আসে বুদ্ধি, মন, অহংকার (স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্ত্বা জ্ঞান) ও চিত্ত (ইচ্ছা)। এ সব থেকে আসে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ সূক্ষ্ম উপাদান— শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। আসে ব্যোম, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথ্বীর সূক্ষ্ম উপাদান।

কাশ্মীর শৈবদর্শন মনে করে যে, মনঃসংযোগকে চূড়ান্ত সিদ্ধিতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। এবং তা হলে এই মনঃসংযোগ দ্বারা প্রত্যেকটি জিনিসকে সরাসরি অভিজ্ঞতাতে জানা যায়, বোঝা যায়। এই দর্শন মতে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা জীব বুঝতে পারে যে, জীবই শিব। এই শিব হলেন বিশ্বের নির্ভেজাল অচেতন সত্তা (য়ুঙের মতে এই অচেতন অবস্থাই সর্বব্যাপ্ত সত্তা)।

দক্ষিণ ভারতের তামিল শৈবরা তাঁদের শিবজ্ঞানের ভিত্তি করেছেন সংস্কৃত সাহিত্যের দ্বাদশ সূত্রকে— যা নাকি রৌরভ আগমের বিদ্যা পর্যায় ভুক্ত। এই আগম প্রচার করেন ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বেল্লাল মেকণ্ড ডেবার অর্থাৎ-সত্যদ্রষ্টা দিব্যঋষি। এই জ্ঞান তিনি রেখে গেছেন 'শিবজ্ঞান বোধম' গ্রন্থে। শিবজ্ঞান বোধম অর্থ—'সত্যজ্ঞানের প্রতি নির্দেশ।' শৈব আগমের প্রত্যেকটি চারটি ভাগে বিভক্তঃ— চর্যা, ক্রিয়া, যোগ ও বিদ্যা। প্রধান শৈব আগম হল ২৮টি। বিশ্বাস—আগম শাস্ত্র সরাসরি শিব থেকে এসেছিল। এই আগম জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য। শূদ্র ও মহিলারাও শৈবধর্মে দীক্ষা নিতে পারেন। প্রত্যেকেই মোক্ষের সাধনা করতে পারেন। শৈব ঋষি তিরুমূলর তাঁর তিরু মতিরম (নবম শতাব্দী) গ্রন্থে বলেছেন ঃ-

"বেদ ও আগম উভয়ই সত্য। উভয় গ্রন্থই ঈশ্বর নিসৃত বাক্য থেকে রচিত। বেদ হল সার্বিক রচনা, আগম বিশেষ রচনা। গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করা হলে বেদান্ত ও সিদ্ধান্তের মধ্যে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যাবে না।

বেদ ও আগমের মধ্যে যে পার্থক্য তা যে শুধু ধর্মীয় পার্থক্য তা নয়। জাতিগত পার্থক্যও। শৈবদের মধ্যে যাঁরা ব্রাহ্মণ তাঁরা আজও বৈদিক অনুষ্ঠান রীতিই অনুসরণ করেন। কারণ, বেদ ও বেদান্তকে তাঁরা আর্যদের জন্য ঈশ্বরের

বিশেষ প্রত্যাদেশ বলে মনে করেন। শূদ্র ও দ্রাবিড়— যারা আর্যবৃত্তের বাইরে ছিল—তাদের বেদ পাঠ শুনতে পর্যন্ত দেওয়া হ'ত না। মোক্ষলাভের জন্য বৈদিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান করার তাদের অধিকার ছিল না। সেই জন্য যাঁরা ব্রাহ্মণ তাঁরা বৈদিক অনুষ্ঠানরীতি অনুসরণ করেই শিবের আরাধনা করতেন। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়েরা দাবি করেন যে, বেদ, আগম ও তন্ত্র একই মর্যাদাসম্পন্ন। শ্রীকান্থ শিবাচার্য (নবম শতাব্দীর পূর্বের) আগমিক শিক্ষা অনুসারে একটি ভাষ্য রচনা করে বলেছিলেন যে, বেদ ও আগমে কোন ভেদ নেই। বেদকেও শিব-আগম বলা চলে, কারণ, বেদও সরাসরি শিব থেকেই এসেছিল। শিব-আগম দু'ধরনের ঃ— একটি তিনটি উচ্চবর্ণের জন্য, আর একটি সকলের জন্য।

শৈবগুরু অপ্পয় দীক্ষিতর (১৫৫২-১৬২৪) প্রথম দুটো ধারাকে এক করে দেখাবার চেষ্টা করেন। অপ্পয় দীক্ষিতর শঙ্করের মায়াবাদ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বৈষ্ণব আচার্য রামানুজের নারায়ণ দেবতাকে উপাস্য দেবতা হিসেবে গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করেন নি। তিনি তাঁর 'সিদ্ধান্ত লেশ' গ্রন্থে এই ধরনের মন্তব্য করেছেন ঃ— 'গঙ্গা যেমন বিষ্ণুর পদ থেকে উৎপন্ন হয়ে বহু দেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হতে হতে বিস্তার লাভ করেছে— তেমনই শঙ্করের মুখপদ্ম থেকে প্রবাহিত হয়ে সহস্রধারায় তাঁর জ্ঞানস্রোত বহু গুরুর কাছে পৌঁচেছে। তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরের চরিত্র ও আত্মার বন্ধন নিয়ে মতভেদ গড়ে উঠেছে। আসলে সকল শিক্ষাই সত্যজ্ঞানের পক্ষে একটি পদক্ষেপ মাত্র; সত্যজ্ঞান এই যে, ব্রহ্মন এক ও দ্বিতীয় বিহীন।'

তামিলনাদের শৈব সিদ্ধান্তের ভিত্তি হল মেকণ্ড (ত্রয়োদশ শতাব্দী) ভাষ্য ও রৌরভ আগমের দ্বাদশ সংস্কৃত সূত্র। খ্রীষ্টীয় শতকের ৫ম ও ৮ম শতাব্দীর মধ্যে আগমের উদ্ভব বলে ধারণা। তবে তন্ত্রশাস্ত্রের উদ্ভব বৌদ্ধাচার্য নাগার্জুনেরও আগে (২০০ খ্রীঃ) 'উত্তরকারণ আগম'-এ দেখা যায়, সপ্তম শতাব্দীতে জৈনদের বিরুদ্ধে নিপীড়নের উল্লেখ আছে। নির্দেশ আছে, মন্দিরে অনুষ্ঠান কালে শৈব সাধক অপ্পর ও সুন্দর রচিত স্তোত্র পাঠ করতে হবে। শৈব সাধক মানিক্য বাচকরের স্তোত্রে আগমের কথা বার বার পাওয়া যায়। মাণিক্য বাচকর সম্ভবত নবম শতাব্দীর সাধক।

অদ্যাবধি লক্ষ্য করা যায় যে, অনার্য শৈবরা আগম শাস্ত্রীয় পূজা-অনুষ্ঠান রীতি অনুসরণ করেন। আর্য শৈবরা বৈদিক অনুষ্ঠান রীতি অনুসরণ করেন। তবে ব্রাহ্মণ শৈবরা মন্দিরে শিব পূজা করছেন এও দেখা যায়। আগম অনুষ্ঠান রীতি ত্রয়োদশ শতাব্দীর বহু পূর্ব থেকেই দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত ছিল। চোলরাজ রাজ রাজ (৯৮৫-১০১৪ খ্রীঃ) তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বর মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। এই মন্দিরে ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিয়োগ করেছিলেন আর্য, মধ্য ও গৌর দেশ থেকে এনে। এঁরা শৈব ধর্মের কথাও প্রচার করতেন। আগমন্ত গ্রন্থে দেখা যায়,

একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে ব্রাহ্মণ শৈব গুরু নিয়ে এসেছিলেন গোদাবরী তীরস্থ অমর্দক মঠ থেকে। এর ফলে শৈব ধর্ম প্রচারে গতি সঞ্চারিত হয়েছিল। শৈব ধর্মের উপর আগমন্ত সম্প্রদায়ের বহু মৌলিক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল।

পঞ্চম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে আদি পর্যায়ের শৈব সাধকেরা শিবের উদ্দেশে তাঁদের বিশ্বাসের সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। ফলে প্রেম ও আর্শীবাদের ধারাতে শিব তাঁদের কাছে নিজেকে তুলে ধরেছিলেন। এই শৈব সাধকদের সংখ্যা ছিল ৬৩ জন। ২৭৪ টি শিবমন্দিরে তাঁদের সংগীত গীত হত। অদ্যাবধি এই সব মন্দির তাঁদের জন্য পরম পবিত্র স্থান হয়ে আছে। সবচেয়ে নাম করা মন্দিরগুলি নির্মাণ করেছিলেন পল্লব ও চোল রাজারা। মন্দির গুলি গড়ে উঠেছিল আদি শৈব বেদীগুলিকে কেন্দ্র করে। শৈব সাধকেরা মনে করতেন যে, তাঁরা অন্তর্চক্ষুতে দিব্য অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। পরবর্তী শৈবসাধকেরা তাঁদের সেই মরমিয়া অভিজ্ঞতাকেই ভিত্তি হিসেবে ধরে নিয়ে ধর্ম প্রচারে অগ্রসর হয়েছিলেন। এই জন্য শৈবসিদ্ধান্ত অনেকটাই মরমিয়া অভিজ্ঞতার উপর রচিত। সাধারণ দর্শনের মত আরোহ প্রণালীতে জ্ঞাত বিষয় থেকে অজ্ঞাত বিষয়ে যাবার প্রচেষ্টা নেই। এই সাধকেরা শৈবসিদ্ধান্তসূত্রের চোদ্দটি সূত্রে স্পষ্ট ভাবে মরমিয়া পথে অগ্রসর হয়েছেন, যে পথে ব্যক্তিসত্তা ব্রহ্মসত্তার অচেতন অবস্থাতে বিলীন হয়ে গেছে। তামিল শৈবরা এই জন্য অদ্যাবধি মরমিয়া ভাবকেই শৈবতত্ত্ব হিসেবে বেশি মূল্য দেন।

শিবসিদ্ধান্তের মতে আত্মা হল শাশ্বত, নিরাকার ও সর্বব্যাপ্ত (বিভূ) এবং এই ব্যাপকতাই আত্মাকে অনিত্যদেহে সাময়িক কালের জন্য আবদ্ধ হতে সাহায্য করে। আদি পাপ হল অজ্ঞতা, যা নাকি আত্মাকে আণবিক অবস্থাতে ক্ষুদ্র করে নিয়ে আসে। ফলে বস্তুসাত্তিক দেহ-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সর্বব্যাপকতা লাভ করতে পারে না। যেহেতু আত্মা বস্তুসত্তার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলে— যে বস্তুসত্তার মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি নেই, যা অজ্ঞান, যা মায়াজাত অর্থাৎ বস্তুর উপাদানিক অবস্থা জাত, সেই কারণে, কামনা, বাসনা, ভ্রান্তি ইত্যাদি তাকে ভালমন্দ কর্মে লিপ্ত করে। তার আণব অবস্থার জন্যই জীবাত্মা পরমাত্মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে থাকে। তবে এর যথার্থ আকূতি থাকে পদার্থিক বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য, নিরঙ্কুশ সত্যের মধ্যে নিজেকে স্থাপিত করার জন্য— যে সত্য আদর্শ প্রেম ও আনন্দপূর্ণ। এই আদর্শের জন্যই শিব তামিলভূমিতে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত।

জীবাত্মা নিজের সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেনা। পরমাত্মার মত জীবাত্মা শুদ্ধ জ্ঞান (চিৎ)-এর অধিকারী নয়। জীবাত্মার চতুর্দিকে যে কর্ম, মায়া ও আণব বন্ধন রয়েছে সে জন্যই শুদ্ধজ্ঞান সম্ভব নয়। কারণ, এই আবরণগুলি বুদ্ধিহীন। তাহলে জীবাত্মা দিব্যজ্ঞান কি করে লাভ করবে? উত্তর হল এই যে, দিব্যজ্ঞান

পরমেশ্বরের করুণাতেই কেবলমাত্র হতে পারে। জীবাত্মা বুদ্ধিমান হবে বা বুদ্ধিহীন, তা নির্ভর করে ঈশ্বরের করুণার উপর। ঈশ্বরের করুণার আলো পেলে জীবাত্মা আলোকিত হয়, আলো সরে গেলে অন্ধকারে থাকে। মেকণ্ড শিষ্য অরুণন্দি শিব আচার্যের 'শিবজ্ঞানসিদ্ধিয়র' গ্রন্থে তাই বলা হয়েছে :— 'যদি তুমি তাঁকে অচিন্ত্যনীয় বলে মনে কর- তবে কোন লাভ নেই। কারণ এরকম চিন্তা মনগড়া চিন্তা মাত্র। 'তুমিই তিনি' যদি এরকম চিন্তাও কর তাও হবে মনগড়া চিন্তা মাত্র। তাকে জানার একমাত্র পথ হল করুণার সাহায্যে তাঁকে জানা।' ঠিক একই ধরনের চিন্তার প্রতিধ্বনি করেছেন চতুর্দশ শতাব্দীতে শৈব সাধক উমাপতি তাঁর তিরু-অরুল-পয়ন (ঐশ্বরিক করুণার ফল) গ্রন্থে :— 'যেখানে অনুসন্ধান শেষ হয় প্রভু সেখানেই বাস করেন।'

যদি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যায়—তা হলে শিবকে নিয়ে গ্রন্থের পর গ্রন্থ রচনা করা যায়। কারণ, অসংখ্য শৈব সম্প্রদায় রয়েছে তাঁদের নিজ নিজ বিশ্বাস নিয়ে। এ ছাড়া আছে আঞ্চলিক ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতিজাত বিশ্বাস নিয়ে নানা আঞ্চলিক শিব। ভক্তদের বিশ্বাসের উপরেই তাঁরা জাগ্রত। লোকচরিত্র, ভৌগোলিক পরিবেশ, জন্তু জানোয়ার, গাছগাছড়া সবই প্রভাব বিস্তার করেছে আঞ্চলিক শিবের রূপ গড়তে। যেমন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লাল বর্ণের পঞ্চানন বা পেঁচো ঠাকুর, যিনি ব্যাঘ্রবাহন, সুন্দর বর্ণের ব্যাঘ্রই হয়তো তাঁকে ব্যাঘ্রবাহন হতে সাহায্য করেছে,—নইলে মূল শিব তো ষণ্ডবাহন। আবার আমাদের দেশের (টাঙ্গাইল, বাংলাদেশ) শ্মশানকালীর পূজোতে তাঁর পাশে হস্তীপৃষ্ঠে উপবিষ্ট যে হরিপাগলাকে দেখা যায়, তিনিও মূলত শিবই। তাঁর পরনে ছিল ব্যাঘ্রাম্বর। কানে ধূত্‌রোফুল—যা শিবেরই লক্ষণ। হাতে সম্ভবত গাঁজার কল্কেও ছিল। শিব আদিতে গজচর্ম পরিহিত ছিলেন বলেই জানা যায়। আসলে দেবদেবীর রূপ, বসনভূষণ, খাদ্যাখাদ্য সবই এক এক অঞ্চলে এক এক রকমের হয় আঞ্চলিক পরিবেশ অনুসারে। প্রত্যেকটি ধর্মই এইভাবে দেশে দেশে অঞ্চলে অঞ্চলে এক এক দেশ ও অঞ্চলের চরিত্র অনুসারে অনেকটাই পাল্টে গেছে। মূল ব্যতীত শাখা প্রশাখা নিয়ে আলোচনা করে লাভ নেই—যদিও অনেক শাখা-প্রশাখা মূল কাণ্ড থেকেও সুন্দর হতে পারে। সুতরাং ভারতবর্ষে শৈবধর্মের মূল প্রবাহের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের বাইরে শিব প্রসঙ্গে বিস্তৃততর আলোচনা করার ইচ্ছা বর্তমান লেখকের নেই।

যে-কোন দেবদেবীর ইতিহাস নিয়ে মতপার্থক্যের অন্ত নেই। যিনি যেমন চিন্তা করেছেন—তিনি তেমন ভাবেই বলেছেন। এঁদের কেউই নিশ্চিন্তরূপে দেবদেবীর উৎস সম্পর্কে জ্ঞাত নন। আবার মরমিয়ারা— যারা তাঁদের অন্তর্দর্শন জাত বিশ্বাসকে যে-ভাবে প্রচার করেছেন, অ-মরমিয়াদের তা বোঝার উপায় নেই। সাধারণ মানুষ শুধু বোঝে বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা বোধের মধ্যে যদি কিছু

আনা যায় তাকে— যাকেই আমরা বলি বিজ্ঞান। ইদানীং বিজ্ঞানও দেখছি কোয়ান্টাম ফিজিক্স-এর আবির্ভাবের ফলে অনেকটা মরমিয়া ভাব নিচ্ছে। সেই বিজ্ঞানের আলোতে ব্যাখ্যা করলে- অনেক ধর্মের মরমিয়া সত্যই অভিনব ভাবে ধরা পড়ে। মরমিয়া অভিজ্ঞতাকে তখন বৈজ্ঞানিক সত্য বলে মনে হয়। তবে শিবের ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম ফিজিক্স অবধি যেতে হয় না— সাধারণ বিজ্ঞানই তাঁকে নতুন ভাবে ধরিয়ে দেয়। সেখানে শিব এমন চমকপ্রদ ভাবে ধরা পড়ছেন যে, বর্তমান নিবন্ধ লেখার মূল উদ্দেশ্যই সেই বিজ্ঞানের আলোতে আলোকিত শিবকে তুলে ধরা। এবং শিবকে সেই আলোতে দেখলে ধর্ম সম্পর্কে তথাকথিত আঁতেলরা যে উন্নাসিকতা প্রদর্শন করেন সেই উন্নাসিকতা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রোগ্রেসিভ বলার ইচ্ছাটাই যেন উবে যায়। বিজ্ঞান শিবকে দেখেছেন Principle of Motion হিসেবে। এবং যে হিসেবে শিবকে যে-ভাবে দেখা হয়েছে— তা লক্ষ্য করা যাক।

ভারতবর্ষে তিনটি দেবমূর্তিকে ভাস্কর্যশিল্পে একত্রে খোদাই করা অবস্থায় দেখা যায় :— ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। হিন্দুরা এই তিন দেবতাকে সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংসের দেবতা হিসেবে দেখে থাকেন। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই তিন দেবতা তিনটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রকাশক। ব্রহ্মা হলেন প্রকাশতত্ত্ব, বিষ্ণু দেশতত্ত্ব ও শিব গতিতত্ত্ব। শিবের চরিত্রের মধ্যে নানা ভাবে এই চিরন্তন গতিতত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

শিবের চরিত্র একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায়— তাঁর গতির কোন বিরাম নেই। সর্পসূত্র গলায় পরে তিনি পর্বতশৃঙ্গ থেকে শ্মশান ভূমি পর্যন্ত সর্বত্র অক্লান্ত চরণে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সর্প প্রকৃতপক্ষে তাঁর আবর্তিক গতিশক্তির প্রতীক। শিব নিজের এই চরিত্রের কথা পার্বতীর একটি প্রশ্নের জবাবে নিজেই দিয়েছেন এইভাবে :—'হে প্রিয়তমা, আশ্রয়হীন আমি চিরন্তন গতিতে অরণ্যে (সংসার অরণ্য) ঘূর্ণায়মান।' (বামন পুরাণ)।

এই গতিময় চরিত্র থাকা সত্ত্বেও শিবকে মহান যোগী হিসেবে দেখানো হয়েছে, যিনি যোগে স্থির হয়ে আছেন। কিন্তু যোগে তাঁর স্থূল দেহটি স্থির হলেও মনের দিক থেকে তিনি স্থির নন। মন নিত্য নতুন চিন্তার ঢেউয়ে এগিয়ে চলেছে। চূড়ান্ত সত্য জানার উদ্দেশে যোগে মনকে নিয়ন্ত্রণ করার যে বিধি আছে, তার অর্থ এই নয় যে, মন সেখানে নিক্রিয় হয়ে আছে। মনের মধ্যে তখনও এক ধরনের সুশৃঙ্খল উত্তেজনা কাজ করে। শিবলিঙ্গ— যার দ্বারা শিবকেই বোঝানো হয়, সেই লিঙ্গের অর্থ সর্বস্তরে, জৈব অজৈব সর্বক্ষেত্রে সৃষ্টির সহজাত অক্লান্ত কর্মপদ্ধতি। কারণ-সলিলে এই লিঙ্গই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

দেবতাত্রয়ের যে চিত্র হিন্দু পুরাণ-কাহিনীতে রয়েছে তার মধ্যে শিবই সৃষ্টির

বিঘ্নকারী শক্তি ধ্বংস করতে সর্বাপেক্ষা প্রবল। এই সৃষ্টিবিঘ্নকারী শক্তিকেই ভারতীয় পুরাণ-কাহিনীতে অসুর নামে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই জন্যই পুরাণে এমনতর কাহিনী লক্ষ্য করা যায় :—ব্রহ্মা অসুরদের বর দিলেন যে, তারা ত্রিলোকজয়ী হবেন। ফলে অসুররা দেবতাদের বিপদের কারণ হয়ে উঠলেন। অসুরদের প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়ে দেবতারা শিবকে গিয়ে ধরলেন। শিব দেবতাদের সাহায্য করার জন্য তাঁর অর্ধেক শক্তি তাঁদের দান করলেন। কিন্তু এই শক্তি লাভ করে দেবতারা বলশালী হওয়া তো দূরের কথা, মাতালের মত টলতে লাগলেন—কারণ, শিবের এই শক্তি ধারণ করার মত ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। শিব নিজের ভুল বুঝতে পেরে শক্তি প্রত্যাহার করে নিলেন। দেবতারা আবার তাঁদের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন।

সামান্য একটু ভাবনার সূত্র ছেড়ে দিলেই এই গল্পের মধ্যে আমরা বিজ্ঞানের 'Optimum Motion' এর তত্ত্ব লক্ষ্য করতে পারব। সকল স্তরের শক্তি সংরক্ষণ ও ব্রহ্মাণ্ডের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এই 'Optimum Motion' নিতান্ত প্রয়োজন।

সৃষ্টির ক্ষুদ্রতম একক থেকে সৌর বিশ্ব, মহাবিশ্ব যেদিকেই আমরা তাকাই না কেন, গতির এই অপরিসীম মাহাত্ম্য আমরা লক্ষ্য করতে পারব। অণু বিশ্লেষণ করলেও দেখা যায় যে, বস্তুসত্তার একক হিসেবে তারা স্থির নয়। একটি অণু তৈরি নিউট্রন, প্রোটন ও ইলেকট্রন দিয়ে।

তবে এরা কোন বস্তুসত্তা নয়, শক্তি-পরমাণু মাত্র। এর মধ্যে দুটি আবার বৈদ্যুৎ চার্জ সম্পন্ন। প্রোটনের আছে ধনাত্মক চার্জ। ইলেকট্রনের ঋণাত্মক চার্জ। নিউট্রনের কোন বৈদ্যুৎ চার্জ নেই। ইলেকট্রন কেন্দ্র অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের চারদিকে নির্দিষ্ট বৃত্তে কেন্দ্রকে পরিক্রমা করে চলেছে। অণুর গঠন পদ্ধতি যদি বিচার করি— দেখতে পাব যে, সৌরবিশ্বে গ্রহাদি যেমন সূর্যকে পরিক্রমা করছে— ইলেকট্রনও তেমনই নিউক্লিয়াসকে পরিক্রমা করছে। ইলেকট্রনের এই ঘূর্ণন যে বৃত্তাকার, তা নয়। আমাদের সূর্যকে পৃথিবী যেভাবে পরিক্রমা করে সেই ভাবে ডিম্বাকৃতিতে ঘূর্ণায়মান।

নিউক্লিয়াসের চারদিকে ইলেকট্রন যেমন ঘূর্ণায়মান, তেমনই শাঁসের মধ্যে প্রোটন ও নিউট্রনও স্থির নয়। সীমিত বৃত্তের মধ্যে তারাও গতিময়। ইলেকট্রন যতটা নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি আসবে, ততটাই তার ঘূর্ণনের বেগ বাড়িয়ে দেবে। কারণ, তা না হলে কেন্দ্রের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক আকর্ষণে ধরা পড়ে যাবে। ইলেকট্রনের গতি যত বাড়বে তার বস্তুসাত্তিকতাও (ভর) তত বেড়ে যাবে।

ইলেকট্রনের ঘূর্ণনের মধ্যে তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষার একটা প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষায় তার এই প্রযত্ন সহজাত। যদি না ইলেকট্রন চিরন্তন

গতিতে ছুটে যেত তা হলে কেন্দ্রের আকর্ষণে সেখানে মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে তার অস্তিত্ব নাশ হয়ে যেত! তার গতিই তাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। কেন্দ্র যত বেশি ইলেকট্রনকে টানবে ইলেকট্রন ততই বেশি তার ঘূর্ণনের মাত্রা বাড়িয়ে দেবে। ফলে এর গতি প্রতিসেকেণ্ডে ৬০০ মাইল পর্যন্ত হয়। আর এই তীব্র গতির জন্যই অণুকে দেখায় ঘনীভূত পিণ্ডের মত, যেমন একটি তিন ব্লেড যুক্ত পাখা দ্রুত ঘুরলে পাখাগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও ঘূর্ণায়মান পাখাকে একটি ঘনীভূত অপরিচ্ছিন্ন চাক্‌তির মত দেখাবে।

এই তিনটি পরমাণুকেই আপন অক্ষরেখায় ঘূর্ণায়মান বলে মনে করা হয়। এক্ষেত্রে প্রোটন ও ইলেকট্রনের অপরিসীম জীবনবৃত্ত থাকলেও নিউট্রন অবক্ষয়ের মুখোমুখি হয়, কারণ, স্বভাবতই প্রতি ১২ থেকে ১৫ মিনিটে নিউট্রন ভেঙ্গে একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে। এমনকি অ্যান্টি-নিউট্রিনোও নির্গত হয়। এই জন্য অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন যে, সৃষ্টির আদিতে প্রথন পরমাণুই ছিল নিউট্রন। তা থেকেই প্রোটন ও ইলেকট্রন বেরিয়ে এসে প্রথম অণু সৃষ্টি করে।

এই যে গতি, এ গতি শুধু যে অণুবিশ্বেই সীমিত তা নয়। একই ধরনের গতি রয়েছে মহাবিশ্বেও। সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহাদিও ডিম্বাকৃতি পথেই ঘুরে বেড়ায়। পৃথিবী আপন অক্ষরেখায় প্রায় চব্বিশ ঘণ্টায় একবার পরিক্রমণ শেষ করে। পৃথিবীর জীবকূল এই ছন্দময় পরিক্রমণের সঙ্গে এমন নিকট সম্পর্কে যুক্ত যে, যদি এই ঘূর্ণনে দীর্ঘদিনের জন্য কোন ব্যতিক্রম ঘটে, তবে বিপর্যয় অনিবার্য।

৩৬৫.২৫৬ দিনে পৃথিবী সূর্যকে পরিক্রমা শেষ করে। গতিপথে পৃথিবীর হেলানো অক্ষরেখা বর্তমানে আছে ২৩½ ডিগ্রি। ৪০.০০০ বছরের এই হেলানো ভাবে ২২ ডিগ্রি থেকে ২৪½ ডিগ্রি পর্যন্ত হেরফের ঘটে। এর ফলে পৃথিবীতে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে যায়। প্রতি ৯২০০০ বছরে সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর ঘূর্ণনে ৯৩.৪ মিলিয়ন মাইল থেকে ৯৭.৫ মিলিয়ন মাইল পর্যন্ত হেরফের ঘটে— যখন পৃথিবী সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থান করে। যখন সব থেকে কাছে থাকে তখন এই দূরত্বের হেরফের হয় ৯২.৮ মিলিয়ন থেকে ৮৮.৭ মিলিয়ন মাইল পর্যন্ত। ফলে পৃথিবীর আবহাওয়া ও প্রাণীজগতে এর বিরাট প্রভাব পড়ে।

মনে করা হয় যে, ৩৪ মিলিয়ন বছরে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে তার পরিক্রমণের দিক পরিবর্তন করে।

পৃথিবী ও গ্রহাদির এই যে গতি এটা তার স্বাভাবিক গতি। প্রকৃতিরও এটা সহজাত বিধি। এই বিধির উপরই আমাদের জীবন ও অস্তিত্ব নির্ভর করে আছে। ধরা যাক, কোন কারণে যদি সূর্য পরিক্রমায় পৃথিবীর গতি কমে যায়।

তাহলে পৃথিবী সূর্যের মধ্যে মুখ থুব্‌ড়ে পড়বে—ঠিক ইলেকট্রন যেমন নিউক্লিয়াসে পড়বে তেমনই। পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সূর্যের কাছে এলেই তাদের গতি বাড়িয়ে দেয়। দূরে গেলেই গতি কমিয়ে দেয়। এটা করে সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ এড়াবার জন্য।

এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, নির্ভেজাল গতি দ্বারা শক্তি বা বস্তুসত্তা কোনটাই সম্ভব নয়, কিন্তু গতির মধ্যে যদি বাড়া কমার লক্ষণ থাকে তবেই এ-সব সম্ভব। ইলেকট্রন ও সূর্যের চারদিকে গ্রহাদির গতি লক্ষ্য করলে এটাই প্রমাণিত হতে চায় যে, গতির নিজস্ব একটা বুদ্ধিবৃত্তি আছে।

এই যে অক্ষরেখায় ঘুর্ণন ও কেন্দ্র পরিক্রমণ, এযে শুধু অণুর মধ্যে বা গ্রহাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা নয়। সূর্যের মধ্যেও এই একই ধরনের গতি রয়েছে। সূর্যও আপন অক্ষরেখায় ঘোরে, সূর্যও কোন কেন্দ্রকে পরিক্রমা করে। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই এইভাবে ঘুর্ণায়মান। এই চিরন্তন সার্বিক ঘুর্ণন সম্পর্কে সকল দেশেই প্রাচীন মরমিয়া ঋষিরা অবগত ছিলেন। এর প্রমাণ ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৬৪ নং সূক্তের ১৪ নং পংক্তিতে। সেখানে বলা হয়েছে :—

"সনেমি চক্রমজরং বিবাবৃত উত্তানায়াং দশ যুক্তা বহন্তি।
সূর্যস্য চক্ষুরজসৈত্যাবৃতং তস্মিন্নাপিতা ভূবনানি বিশ্বা।"

অর্থাৎ 'সমান বেড় বিশিষ্ট জরারহিত কালচক্র নিরন্তর ঘুরছে। দশটি অশ্ব একে ঊর্ধ্বদিকে টেনে চলেছে। সূর্যের চোখে এই বিশ্ব গতিশীল, অন্ধকার দেশের উপর দিয়ে ঘুরছে।'

বিজ্ঞানীরা যেমন বস্তু বিশ্লেষণ করে ও জ্যোতির্মণ্ডলীয় ঘটনাবলী লক্ষ্য করে এই গতির গুরুত্ব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, প্রাচীন ঋষিরা তেমনই আত্মচর্চা করে এই গতির স্বরূপ ধরতে পেরেছিলেন। সমগ্র সৃষ্টিতে গতির এক বিশাল ভূমিকা। এই গতি কমবেশী হলেই জগতের রূপান্তর ঘটে যাবে। একটি অণু-কেন্দ্রের চারদিকে ইলেকট্রন যে গতিতে ঘুরছে সেই ঘুর্ণনের বেগ যদি অত্যধিক বেড়ে যায় তাহলে ইলেকট্রন অণু-কেন্দ্রের আকর্ষণ ছিন্ন করে বেরিয়ে যাবে। আবার যদি এই গতির পরিমাণ খুব বেশি কমে যায় তাহলে পরমাণুর বস্তুসত্তা কমে যাবে। অণুটির অবক্ষয় ঘটবে। পরমাণুটি ভিন্ন পরমাণুতে রূপান্তরিত হবে। আমাদের পৃথিবী যে গতিতে সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে যদি সেই ঘুর্ণনের বেগ আরও বেড়ে যায় তবে পৃথিবী গ্রহটি ছিট্‌কে সৌরমণ্ডলের বাইরে চলে যাবে। যদি গতি খুব কমে যায় তাহলে সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ এড়াতে না পেরে তার মধ্যে মধ্যে মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। ঠিক অনুরূপভাবে আমাদের ছায়াপথের নক্ষত্রগুলির ঘুর্ণনের বেগ যদি বেড়ে যায় তারা ছায়াপথের বাহু এড়িয়ে মারাত্মক পরিণতির দিকে ছুটে যাবে। সমগ্র ছায়াপথের বিধানটিই ভেঙে

পড়বে। সুতরাং পরিমিত গতিই সৃষ্টি ও স্থিতির ক্ষেত্রে কাজ করে। ধ্বংসের ক্ষেত্রেও এই গতিশক্তিই মূল ভূমিকা পালন করে। গতির পরিমান প্রয়োজনের কম বেশি হয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছুলেই বিপর্যয় দেখা দেবে।

এই যে গতি এই গতিকেই বলে ছন্দময় গতি। এই গতিতে ছন্দপতন ঘটলেই বিপর্যয় অনিবার্য। শিবকে এই ছন্দময় গতির প্রতীক হিসেবেই ভারতীয়েরা লক্ষ্য করেছেন। সুতরাং শিবের যে ভাস্কর্য মূর্তি তাতে তিনি নর্তক হিসেবেই খোদিত। শিবের নৃত্যের মধ্যে আছে সৃষ্টির নৃত্য ও ধ্বংসের নৃত্য উভয়ই। সতীর মৃত্যুতে শিব উন্মাদ নৃত্য শুরু করলে সৃষ্টি তাই রসাতলে যাবার উপক্রম হয়েছিল।

ত্রিমূর্তিতে শিবকে প্রলয়কর্তা হিসেবেই দেখানো হয়েছে অর্থাৎ ধ্বংসের কারণ। কিন্তু ধ্বংসতো শুধু ধ্বংস নয়, নবজীবনেরও কারণ। সুতরাং ধ্বংসকারব হিসেবে শিব নির্ভেজাল ধংসশক্তিই নন, নতুন সৃষ্টির শক্তিও। কারণ, ধ্বংস হলে তবেই নতুন সৃষ্টি হয়।

নটরাজের মূর্তিতে শিবের গতিশক্তির অভিনব রূপ ফুটে উঠেছে। নটরাজের যেটি কল্যাণপ্রদ দিক সেই কল্যাণপ্রদ দিকের মধ্যে ফুটে উঠেছে সংরক্ষণ ও শৃঙ্খলাশক্তি। ধ্বংসাত্মক দিক ফুটে উঠেছে Optimum Motion-এর ব্যতিক্রম থেকে।

শিবের সর্পও তাঁকে বিশেষ ভাবে মহিয়ান করে তুলেছে। সর্পের মধ্যে, গতির মধ্যে যে সুপ্তশক্তি, সর্পপ্রতীকে তার কথাই বলা হয়েছে। একেই বর্তমান বিজ্ঞানীরা বলেন Kinetic energy'.

কপালে শিবের তৃতীয় নয়নও বিশেষ ইঙ্গিত বহনকারী। এই চোখ দ্বারাই অতীত ও ভবিষ্যৎ দুইই দেখা যায়। একথার তাৎপর্য বুঝতে হলে যোগের গূঢ় রহস্য বুঝতে হবে। ত্রিনেত্র হল প্রকৃত পক্ষে পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ড। এই পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ড সূক্ষ্ম দর্শনের অধিকারী। কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণে পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ড অত্যন্ত প্রভাবিত হলে তার সূক্ষ্ম দর্শনের ক্ষমতা বেড়ে যায়। অতিরিক্ত চার্জ হেতু পিনিয়াল গ্ল্যান্ড গতিসম্পন্ন পরমাণুর মত হয়ে যায়। যখন এর ক্রিয়াক্ষমতা (গতি) আলোর ক্ষমতা (গতি) থেকে বেশি হয় তখন তা পশ্চাৎমুখী হয় ও অতীত দৃশ্য দর্শন করায়। আলোর গতিতে গতি সম্পন্ন হলে ভবিষ্যৎ দর্শন হয়। সাধারণ গতিতে চললে বর্তমানের মধ্যে পড়ে থাকে। এই তৃতীয় নয়নের মধ্যেই শিব যে কালস্রষ্টা সে ইঙ্গিতও রয়েছে। এক্ষেত্রে মিশরের আমোন দেবতার সঙ্গে তাঁর নিকট সম্পর্ক আছে। আমোন হলেন এমন এক দেবতা যিনি অদৃশ্য। কিন্তু স্থিতির মধ্যে গতির আবেগসঞ্চারকারী।

মিশরীয় পুরাণ-কাহিনী অনুযায়ী আলোর বিকাশের পূর্বে বিশ্ব ছিল অন্ধকারে

আচ্ছন্ন। যদিও আদিশক্তি (নুন) তখনও বিদ্যমান ছিল তবু বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটা বিশৃঙ্খলার মধ্যে ছিল। যখন গতিশক্তি (আমোন) এই স্থির শক্তিকে আলোড়িত করেন তখনই আলো প্রকাশিত হয়।

আমোন এমন শক্তির প্রতীক যিনি আদি শক্তিকে (নুন) তার অগতি থেকে গতিময় করেন। সুতরাং তিনি সকল কিছুর মধ্যে যে গতিশক্তি আছে তার প্রতীক হিসেবে দেখা দেন। সৃজনী শক্তি নুনের মধ্যেই ছিল, কিন্তু তাকে সক্রিয় করার জন্য আমোনের প্রয়োজন ছিল।

আমোনকে নিয়ে যে পৌরাণিক কাহিনী আছে তাতে তাঁকে গতিশক্তির সঙ্গে এক করে দেখা চলে। তাঁকে বায়ু হিসেবেও বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ, বায়ুও সতত সঞ্চরণশীল। আমোনের মত বায়ুও অদৃশ্য। বলা হয়, আমোনের কোন পিতামাতা নেই। তিনি ভারতীয় শিবের মত স্বয়ম্ভু। নিজের ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই তিনি নিজেকে সৃষ্টি করেছেন। সেই হিসেবে আমোন ইচ্ছাশক্তিরও প্রতীক। এই ইচ্ছাই সব কিছুকে কর্মগতিময় করে। শিবের গতি যেমন ছন্দময় আমোনের গতিও তেমনই। এইজন্য আমোনকে মেষরূপে দেখানো হয় যাঁর সামনে বসে আছে মায়েৎ বা বিশ্বঋত্। তাঁর পেছনে পক্ষযুক্ত ভাসমান সর্পকেও দেখা যায়।

বিশ্বে দেখা যায়, যে শৃঙ্খলা আছে তা বিজ্ঞানের ভাষায় optimum motion-জাত। এই optimum motion-এ কোন ব্যতিক্রম ঘটলেই বিশৃঙ্খলা অনিবার্য। সেইজন্যই আমোনের সামনে মায়েৎকে দেখানের প্রয়োজন হয়েছে। গতিশক্তি বা kinetic enegy রূপে তাঁর পেছনে দেখানো হয়েছে পক্ষযুক্ত ভাসমান সর্পকে।

মেষ স্ফীংস-এ আমোনের আত্মাকে ধরে রাখা হয়েছিল কিংবা কম অটেফ্ নামে সর্পদণ্ডে। কম অটেফ হল সৃষ্টির অন্তরস্থ সুপ্তশক্তি। শিবের সঙ্গেও কম অটেফ বা বৈদিক কাম-দেবের নিকট সম্পর্ক আছে। ভারতীয় কাম অর্থ আদি সলিলে আলোড়ন সৃষ্টিকারী। কিন্তু পুরাণকাহিনীতে কামের পরিবর্তে শিবই আদি গতিশক্তি হিসেবে দেখা দিয়েছেন।

এই গতিশক্তি কতটা গুরুত্বপূর্ণ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে বিচার করলেই তা বোঝা যাবে। আমরা কাল সম্পর্কে অবহিত হলেও গতি সম্পর্কে তেমন সচেতন নই। এটা বুঝতে হলে গতিকে স্তব্ধ করে দিলে তার পরিণতি কি হবে তা ভাবতে হবে। যদি পৃথিবী আপন অক্ষরেখায় ঘূর্ণন থামিয়ে দেয় তাহলে দিন রাত্রির যে সময়ের হিসেব তা বন্ধ হয়ে যাবে। যদি পৃথিবী সূর্য পরিক্রমা বন্ধ করে, তাহলে দেয়ালপঞ্জিকা থেকে বৎসর অন্তর্হিত হবে। এই একই ভাবে চন্দ্র যদি পৃথিবী পরিক্রমা না করে, ছায়াপথগুলি ঘূর্ণন ও দূরে সরে যাওয়া বন্ধ করে দেয়, আমাদের ঘড়ির কাঁটা থেমে যায়, মানুষ জমে গিয়ে গতি হারিয়ে ফেলে,

তা হলে কি হবে? 'সময়' বলতে যা বুঝি তা হারিয়ে যাবে। সময় হল গতি থেকেই জাত। সেই গতিকে আবার ভিন্ন কিছুর সঙ্গে তুলনা করলেই বোঝা যায়। সুতরাং আমোনকে 'সময় স্রষ্টা' করে প্রাচীন মিশরীয়েরা তাঁকে গতিশক্তির প্রতীক হিসেবেই দেখেছিলেন।

ধ্যানী শিবের মধ্যে মানসগতি ফুটিয়ে তোলার জন্য এই কারণে হিন্দুরা তাঁর জটাতে ক্ষীণচন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। এই চন্দ্র হল আপাতস্থির যোগস্থ ব্যক্তির মানসক্রিয়া অর্থাৎ শিবেরই সুশৃঙ্খল মানসগতি। শিবের ত্রিশূল হল তাঁর মধ্যে প্রারম্ভিক গতির প্রতীক। ত্রিশূলের তিনটি মুখ তিন গুণের প্রতীক (সত্ত্ব, রজঃ তমঃ)— যে গুণগুলি সৃষ্টির প্রারম্ভে সাম্যাবস্থায় ছিল এবং যেগুলির মধ্যে ক্ষোভ (গুণক্ষোভ) দেখা দেওয়াতেই সৃষ্টির আবেগ বা গতি ফুটে ওঠে।

সুতরাং ভারতীয় শিব শুধুমাত্র পুরাণ-কাহিনীর নায়ক নন, তিনি বৈজ্ঞানিক ভাবেও গতিতত্ত্বের মূল্যবান রূপক। এই গতিতত্ত্বের প্রতিনিধিকে মনের গতির সুশৃঙ্খল প্রসার ঘটিয়েই ধরতে হবে। পরাবিজ্ঞান বুঝি না বুঝি বহুমাত্রিক বিজ্ঞানের আলোতে তাঁকে ধরার চেষ্টা হলে নতুনতর রূপে তিনি ধরা দেবেনই। তাঁকে সেভাবে ধরার চেষ্টা হলে প্রোগ্রেসিভদের প্রোগ্রেস-সংক্রান্ত আঁতেলপনার কোন হানি হবে না।

ব্রহ্মা ও প্রকাশতত্ত্ব

ভারতবর্ষে আজ দেবতা হিসেবে ব্রহ্মার কোন গুরুত্ব নেই। এই দেবতা যে আজ অপ্রচলিত দেবতাতে পরিণত হয়েছেন তার কারণ, সাধারণ মানুষের চিত্তে আবেদন করা মত তাঁর কোন গুণ ছিল না— যে গুণ শিব এবং বিশেষ করে বিষ্ণুর মধ্যে ছিল। ব্রহ্মা বরাবরই ছিলেন দার্শনিকদের দেবতা। মহাভারতের যুগ থেকেই ব্রহ্মার অবক্ষয় শুরু হয়। ভারতবর্ষে রাজপুতনার পুষ্করতীর্থে একটি মাত্র স্থানেই তাঁর বেদী আছে। তবে গুজরাটের মহীকাণ্ডেও খেদ ব্রহ্মাতে তাঁর একটি মন্দির রয়েছে। দক্ষিণ-ভারতে কিন্তু ব্রহ্মা-পূজার ধারা ধারাবাহিকভাবেই রয়েছে। তাঁর মন্দির আছে কৃষ্ণা জেলার চেব্রোলু, দক্ষিণ আর্কটের কালহস্তী, ত্রিবান্দ্রমের কাছে মিত্রানন্দপুরম প্রভৃতি স্থানে। গৃহ-পূজায় তিনি ভাগ্যদেবতারূপ 'বিধাতৃ' নামে পূজা পান। তবে এখানে তাঁর স্থান ষষ্ঠীর নিচে। তবু আদিতে ব্রহ্মাই ছিলেন প্রথম দেবতা যাঁর থেকে সৃষ্টি প্রকাশ পেয়েছিল।

ভারতবর্ষে সব দেবতাই পণ্ডিতজনের মতে মহৎ দার্শনিক চিন্তার প্রতীকী রূপ মাত্র। এই প্রতীকীরূপ দেবার প্রয়োজন হয়েছিল দুটি কারণে ঃ- (১) অধরাকে ধর্তব্যের মধ্যে আনার জন্য। চর্মচক্ষে দেখার জন্য। শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শোনার জন্য। মানুষের চিন্তা করার সীমিত ক্ষমতার জন্যই এমন করতে হয়েছিল। আমরা যে ভাষা ব্যবহার করি তা সেই অর্থে প্রতীকী ভাষা মাত্র। ধর্মীয় ভাষা তো আবার বিশেষ রকমে প্রতীকী। কারণ, এমন সত্যকেই এই ভাষা দ্বারা ধরার চেষ্টা হয় যে সত্য রহস্যময়, ভাষা দিয়ে ধরার পক্ষেও অত্যন্ত গভীর। তবে ভারতীয় হিন্দুদের ভাষা এতই নরম যে, তাকে যে-কোন ভাবের প্রকাশক হিসেবে ইচ্ছে মত দুমড়ানো মোচ্‌ড়ানো যায়। এই ভাষার শব্দ এমনই যে, তাকে নানা ভাবে ব্যবহার করলেও তার ক্ষমতা নিঃশেষিত হবার নয়। গ্রীষ্ম মণ্ডলীয় দেশের সম্পদ, সৌন্দর্য ও ইঙ্গিতময়তা রয়েছে এই ভাষার মধ্যে। ফলে প্রতীক তৈরি করে এই ভাষা ব্যবহারে, বিশেষ করে অধ্যাত্ম সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাকে সাফল্য সহকারে প্রয়োগ করা গেছে। ভারতীয় অধ্যাত্ম সাহিত্যের প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য দেবতারই জীবজগতে ও বস্তুজগতে এক ধরনের মিল আছে। এ-সবের মধ্য দিয়েই তাঁরা মূর্তি ধরে মানুষের দৃষ্টিতে ধরা দিয়েছেন। ফলে ভক্তেরা দেবতাদের সহজেই পূজো করার সুযোগ পেয়েছেন—, নইলে তাঁদের যথার্থ যে গুণ-সত্ত্া, সাধারণ মানুষের কল্পনার মধ্যে তা আনা সম্ভব নয়। বহু প্রতীক দেবতাদের গুণেরই প্রকাশক— যেমন, পদ্ম। পদ্ম হ'ল নির্ভেজাল পবিত্রতার প্রতীক, যাকে অসহযোগিতামূলক পরিবেশের মধ্যেও রক্ষা করা সহজ। এই জন্যই পদ্মকে বলা হয়েছে পঙ্কজ—অর্থাৎ পঙ্ক বা কাদা থেকে যার জন্ম—অথচ কাদা দ্বারা যা কর্দমাক্ত নয়। বিজ্ঞানে অবশ্য এর ভিন্ন রকম দ্যোতনা আছে। অধুনা বিজ্ঞানীরা পদ্মকে নিউট্রন ফিল্ডের সঙ্গে তুলনা করার

চেষ্টা করেছেন, যে নিউট্রন ফিল্ড শূন্যতার বুকে স্বয়ম্ভু। এবং এর যে আবর্তিক ভঙ্গী আছে তা অনেক্টাই পদ্মের দলের মত। এই নিউট্রন ফিল্ডকেই বস্তুজগতের আদি বস্তুসত্তা বলে এখন মনে করা হচ্ছে।

অধ্যাত্ম মরমিয়া ব্যাখ্যা সবার জন্য নয়, কারণ মনশ্চক্ষে সরাসরি অভিজ্ঞতা না হলে—এই মর্মজাত ভাবের অনুভব সাধারণ মানুষের হবার নয়। তাই বিজ্ঞানের ব্যাখ্যাই সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধ্য ও বিশ্বাস্যভাবে গ্রহণীয়। সেই বিজ্ঞান দিয়েই ব্রহ্মাকে ব্যাখ্যা করার জন্য এই নিবন্ধের অবতারণা। কিন্তু তার আগে ইতিহাসের পথ ধরে কিছুটা হাঁটতে হবে।

যে প্রতীকের কথা বলা যাচ্ছিল তাই বলা যাক। হিন্দুদের সকল প্রতিমা, সকল অভিজ্ঞানই প্রতীক মাত্র। তাই যথার্থ যাঁরা গুণী তাঁরা মাটি কাঠ পাথরে এই প্রতিমার পূজা করেন না। যে যথার্থতার প্রতীক হিসেবে তাঁরা বিরাজ করেন সেই যথার্থতারই তাঁরা পূজা করেন।

(২) প্রতীকের দ্বিতীয় প্রয়োজনীয়তা এই ঃ— যাঁরা অজ্ঞ, যাঁরা অজ্ঞানতার অন্ধকারে আছে, যারা অরূপ যথার্থতা ধারণার মধ্যে আসতে পারেনা— অধ্যাত্ম জগতে তাদের ধরে রাখার জন্য প্রতীক হল বিরাট সহায়। এই প্রতীককে ধরে নিয়ে তারা ধর্মের জগতে অগ্রসর হতে পারে। প্রতীকের প্রতি মনকে নিবেশ করে তারাও এক ধরনের যোগযুক্ত হয়। ফলে ধীরে ধীরে প্রতীকের মধ্য দিয়েই তাঁদের মর্মের দুয়ার খুলে যায়— এবং শেষ পর্যন্ত তাদেরও মরমিয়া অভিজ্ঞতা হয়। এদের কাছে যদি প্রতীকের বন্ধনে অধ্যাত্ম জগৎ না আসতো তাহলে তারা হয়তো ভ্রান্ত পথেই পরিচালিত হত। পূজা আর্চা না করা অপেক্ষা ভ্রান্ত প্রতীকের পূজা করাও ভাল। এই জন্য হিন্দুরা প্রতিমা পূজাকে অধ্যাত্ম জগতে অগ্রসর হবার পথে একটি ধাপ বলে মনে করেন। ফলে কোটি কোটি হিন্দুর কাছে পূজা আজ নিঃসঙ্কোচে গৃহীত সত্য।

তবে জগৎ যখন মানস সৃষ্ট (অধুনা বিজ্ঞানীরাও বলতে আরম্ভ করেছেন যে, জগতের মৌল উপাদান যথার্থ অর্থে মানস উপাদান। যেমন স্যার আর্থার এডিংটন বলেছেন 'বস্তুবিশ্বের মূল উপাদান মানসিক'—(The world is made of mind stuff.') এবং সীমিত মানসও যথার্থ অর্থে সেই একই মহামানস। সুতরাং মানুষ যে প্রতীকীরূপ চিন্তা করেছে তাও তাই সত্য হয়েই ফুটে উঠেছে। প্রতিমাও মানস উপাদানে তৈরি হয়েছে। এই জগৎ যেমন আমাদের দর্শনে সত্য, তেমনই প্রতিমাও ভক্তের কাছে সত্য হয়ে ফুটে উঠেছে। তাই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের মত অনেকেই মনে করেন যে, ঈশ্বর তত্ত্বেও সত্য, রূপেও সত্য। জগজ্জননী মা সেই জন্য তত্ত্বগতভাবে তাঁর কাছে জ্ঞাত হলেও প্রতিমা-রূপেও সত্য। এইজন্য মায়ের সঙ্গে তিনি কথা বলেন বলে দাবি করতেন।

হিন্দুরা দাবি করেন যে, প্রতিমা অনেক বেশি সার্থক ভাবে ঈশ্বরের কাছে ভক্তকে ঠেলে দিতে পারে, যে অরূপ ঈশ্বরকে কোন রূপেই যথার্থ ভাবে সে ধরতে পারে না।

সেই প্রতীকী ব্যঞ্জনার পটভূমিতে এবার ব্রহ্মা ও তাঁর ঐতিহাসিক পটভূমি আলোচনা করা যাক।

হিন্দু দেবদেবীর মধ্যে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন এবং সর্বোপরি স্থান। এই তিন দেবতার মধ্যে ব্রহ্মাকে স্রষ্টা বলে কল্পনা করা হয়। বেদ ও ব্রাহ্মণে তাঁকে প্রজাপতি, পিতামহ ও হিরণ্যগর্ভ নামে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তবে তাঁর উৎপত্তি ঋষিদের কল্পনার মধ্যে রয়েছে, জনসাধারণে তিনি স্থান করে নিতে পারেননি। সুতরাং দেবতা হিসেবে ব্রহ্মার পূজা প্রায় নেই বললেই চলে। বরং এই তিন দেবতার মধ্যে বিষ্ণু ও শিব জনচিত্ত অধিকার করে নিয়েছেন। তা সত্ত্বেও তত্ত্বগত ভাবে এই তিন দেবতাই কিন্তু সমান মর্যাদার। এই জন্যই তাঁরা একাত্ম ত্রিমূর্তি গঠন করে আছেন। পুরাণ কাহিনীতে এই ত্রিমূর্তি খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকেই স্বীকৃত হয়ে আসছে।

তবে ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে প্রজাপতির চিন্তার মধ্যে কিছু বৈপরীত্য আছে। কখনও তাঁকে ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে এক করে দেখানো হয়েছে, সেখানে হয়েছে সৃষ্টির আদি উৎস হিসেবে। কখনও বা আবার তাঁকে দেখানো হয়েছে ব্রহ্মনের অধীনস্ত দেবতা হিসেবে। পরবর্তীকালের পুরাণেও ব্রহ্মা দ্বিতীয় সত্তা। ব্রহ্মন থেকে তাঁর উদ্ভব, একথাই বলা হয়েছে। ব্রহ্মন হয়েছেন সৃষ্টির আদি কারণ। কখনও বা আবার তাঁকে ব্রহ্মনের সঙ্গে এক করেও দেখানো হয়েছে— যেখানে তাঁকে বলা হয়েছে স্বয়ম্ভু, অজ (অর্থাৎ অজাত)। তবে এক্ষেত্রে মনুর অভিমতই সাধারণত গ্রাহ্য। মনু বলেছেন, আদি অন্ধকার থেকে উদ্ভূত হয়ে তিনি স্বয়ম্ভু সলিল তৈরি করেন। সেই সলিলে তিনি বীজ স্থাপন করেন। সেই বীজই হয় স্বর্ণডিম্ব— যার মধ্য থেকে তিনি ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভরূপে জন্ম নেন। কিন্তু ঋগ্বেদের (দশ-১০) পুরুষসূক্তে পুরুষকেই বলা হয়েছে প্রথম, তাঁর থেকেই ব্রহ্মাণ্ডের উদয়। এই পুরুষ থেকে যে দেবতার উদয় হয়েছিল তাঁর নাম নারায়ণ। আদি 'নর' থেকে তাঁর উদ্ভব হয়েছিল বলেই তাঁকে বলা হয় নারায়ণ। এই নারায়ণকেই বলা হয় বিষ্ণু। নারায়ণের উদ্ভবে ব্রহ্মার সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়।

আর একটি কারণেও ব্রহ্মার গুরুত্ব অনেকটা হ্রাস পেয়েছিল। কারণ, দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রজাপতিদের উপর মানুষ, দেবতা ও অন্যান্য দিব্যসত্তা সৃষ্টির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এঁরা হলেন দক্ষ, মরীচি, অত্রি ও অন্যান্য ঋষি। মহাকাব্য ও পুরাণে এঁদের কাহিনী পাওয়া যায়। সুতরাং নানা কারণেই ব্রহ্মার গুরুত্ব হ্রাস পায়। ব্রহ্মার প্রতি মানুষের ভক্তি কমে যায়। নিজে কন্যা বাকের সঙ্গে যৌন সম্পর্কও তাঁকে ভক্তজনের কাছে হেয় করে তুলেছিল। তবুও স্রষ্টা হিসেবে এবং ললাট-লিখনের বিধাতা হিসেবে ব্রহ্মা সেই ধ্রুপদী লেখকদের সময় থেকে আজ পর্যন্ত হিন্দু মানসে বিরাট স্থান অধিকার করে আছেন।

নারায়ণ বা বিষ্ণু কোন সময় ব্রহ্মার স্থান অধিকার করে নিলেও এক সময় ব্রহ্মা এবং নারায়ণকে এক করেই দেখানো হ'ত। মনু মনে করেন, ব্রহ্মা এবং

নারায়ণ একই। পরে ভগবান বিষ্ণু নারায়ণ হিসেবে দেখা দেন। শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে যে, কূর্মের (কচ্ছপের) আকৃতি গ্রহণ করে প্রজাপতি তাঁর বংশবৃদ্ধি করেন। আবার তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে যে, প্রজাপতি বরাহের রূপ ধারণ করে পৃথিবীকে সলিল-তলদেশ থেকে তুলে ধরেন। তবে সাধারণ বিশ্বাস কূর্ম ও বরাহের রূপ বিষ্ণুই তাঁর অবতার রূপ গ্রহণের সময় ধারণ করেছিলেন।

এই ধরনের গল্পের মধ্য দিয়েই প্রথম তত্ত্বের অবতারণা ঘটে। বৈষ্ণব ধর্ম ভগবান বিষ্ণুতে অবতারত্ব আরোপ করে বহু লৌকিক ধর্মকে নিজের অঙ্গীভূত করে নেয়। পশুতে দেবত্ব আরোপ করে বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর মধ্যে যে পূজা করার ব্যবস্থা ছিল, সম্ভবত অবতার তত্ত্বে তারও প্রভাব পড়েছিল। কিংবা সেই সব নরগোষ্ঠীর ধর্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্ম গ্রহণ করাতেই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে এই ধরনের গল্পের সৃষ্টি হয়েছিল। বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর পশুরূপী দেবতাকে ব্রাহ্মণরা এইভাবে নিজেদের উল্লেখযোগ্য দেবতার মর্যাদা দিয়ে নিজস্ব ধর্মের এক্তিয়ার বৃদ্ধি করেছিলেন। প্রথম দিকে কূর্ম অবতার ছিলেন প্রজাপতিই। তবে প্রথম দিকে প্রজাপতিকে কূর্মের রূপ ধারণ করতে দেখা গেলেও পরে দেখা যায় দ্বিতীয় শ্রেণীর স্রষ্টা কশ্যপ-এর সঙ্গে কূর্ম এক হয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত বিষ্ণুই সকল অবতারের আদি কারণ হয়ে দেখা দেন। বিষ্ণুর মৎস্য ও নরসিংহ রূপ সম্ভবত আদি কোন নরগোষ্ঠীর দেব-মঞ্চ থেকে তুলে আনা। বিষ্ণুর দশ অবতারের চিন্তা সম্ভবতঃ জয়দেবের সময় থেকেই এসেছে। তবে অনেকে গুপ্ত যুগেও এদের উৎস খুঁজে পান। শেষ পর্যন্ত এই অবতার তত্ত্ব পৃথিবীতে প্রাণী জগতের ক্রমবিকাশ তত্ত্ব হয়ে ধরা পড়ে। ইদানীং কালে বিজ্ঞানই পুরাণ-কাহিনীগুলির মধ্যে বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতত্ত্ব খুঁজে পেতে আরম্ভ করেছে। ঋগ্বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতিতে ব্রহ্মা সম্পর্কে যে-ধরনের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে তাতে তাঁর মধ্য থেকে বিজ্ঞানের উপাদান খুঁজে পাওয়া খুব কষ্টকর হয় না। সেই বিজ্ঞানের আলোতেই এখন ব্রহ্মা-কল্পনার পেছনে কি ধরনের মানসিকতা কাজ করেছিল তাই দেখা যাক।

ব্রহ্মাকে বলা হয় ব্রহ্মণের প্রকাশিত সত্তা। ব্রহ্মণ যদি সূক্ষ্ম, ব্রহ্মা তবে স্থূল। সুতরাং ব্রহ্মাকে বুঝতে গেলে ব্রহ্মণকে আগে বোঝা প্রয়োজন। লিঙ্গের দিক থেকে ব্রহ্মণ হলেন নিরপেক্ষ। ফলে কোন কিছুর যদি কোন আদি কারণ থেকে থাকে তবে তা ব্রহ্মণ। সেই আদি কারণ হিসেবে ব্রহ্মণকে বলা যেতে পারে আত্মিক মানসক্ষেত্র (psychic mindfield)। প্রাচীন সৃষ্টিতত্ত্বের প্রবক্তা মরমিয়া ঋষিরা সর্বদাই একটি মানসক্ষেত্রের কথা বলেছেন— যা থেকেই যাবতীয় তেজরূপ পরবর্তীকালে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই যে তেজরূপ ক্ষেত্র এ হল নির্ভেজাল দ্যুতি মাত্র (pure radiation)। কোয়ান্টাম ফিজিক্স-এ এভাবেই তেজক্ষেত্রকে দেখা হয়েছে।

ব্রহ্মণ সম্পর্কে বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে যে, বৃহ (বৃদ্ধি পাওয়া) এই উৎস

থেকেই ব্রহ্মণ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। অনেকে একে বলেন বৃহ + মন, অর্থাৎ সম্প্রসারণশীল মানস। নানা হিন্দুগ্রন্থে ব্রহ্মন সম্পর্কে একই সঙ্গে বিপরীত অর্থবোধক শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে, যেমন, প্রকাশিতব্য ও অপ্রকাশিতব্য, ভিত্তিহীন ও ভিত্তিসম্পন্ন, ইত্যাদি। ব্রহ্মনই হলেন আদি সত্তা, পূর্ণ চিৎ, আলোর আলো ও অদ্বিতীয়। তিনি সর্বত্র বিরাজমান, সর্বদৃষ্টি ও সর্বশক্তিমান। তিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত, অসীম, সময়াতীত, ক্ষুদ্র অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর ও বৃহৎ অপেক্ষা বৃহত্তর। বিশ্বরূপে তিনি বিশ্বকে সিক্ত করে আছেন। তিনি অমর, কিন্তু মরণশীলতার আবরণে জড়িয়ে আছেন। সকল দেবতাই তাঁর উপর নির্ভরশীল। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত অগ্নি একখণ্ড দুর্বাকেও পুড়াতে পারে না, বায়ু এক টুক্‌রো খড়কেও নাড়াতে পারে না।

অথর্ববেদের মতে গোরু যেমন গোয়ালে থাকে সকল দেবতাও তেমনই ব্রহ্মনের মধ্যে থাকেন। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আদিতে ছিল ব্রহ্মন হিসেবেই। তিনিই দেবোকুল সৃষ্টি করেন।

ঐতরেয় উপনিষদে বলা হয়েছে :— 'যিনি আকাশে বাস করেন তিনি আকাশ থেকে পৃথক। ব্রহ্মনের দেহই হল আকাশ, কিন্তু আকাশ তা জানতে পারে না। তিনি আকাশের মধ্যে থেকেই আকাশ শাসন করেন। তিনি আত্মা, আন্তর পরিচালক, অমর।'

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুই একটি চিৎসত্তা দ্বারা পরিচালিত, চিৎসত্তাতে স্থিত। এই ব্রহ্মাণ্ড সেই চিৎসত্তা দ্বারাই শাসিত। ব্রহ্মাণ্ডের ভিত্তিই হল চিৎসত্তা। এই চিৎসত্তাই ব্রহ্মন।

ব্রহ্মন সম্পর্কে প্রাচীন ভারতীয়দের এই যে ধারণা, বহু প্রতীকের মধ্য দিয়ে তাঁরা তা প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে এমন তত্ত্ব ফুটে উঠেছে যা আধুনিক কালের কোয়ান্টাম পদার্থবিদেরা অনুমান করছেন। এই ব্রহ্মনই হলেন বিজ্ঞানের common energy field.

দেশ (space) ব্যাপি এই যে তেজক্ষেত্র রয়েছে, বর্তমান বিজ্ঞানের সেটা একটা বড় ধারণা। অণু পরমাণুর ব্যবহার লক্ষ্য করলেই এটা প্রমাণিত হবে। নানা পরমাণু যখন অবক্ষয়ের মুখে আসে— দেখা যায় তাদের রূপান্তরের সময় তা থেকে কিছুটা শক্তি হারিয়ে যাচ্ছে। সেই অবক্ষয় থেকে নতুন যে সব পরমাণু গড়ে উঠছে তাদের সমগ্র বস্তুসত্তা (mass) আদি পরমাণুর স্থিরবস্তুসত্তা (rest mass) থেকে কম। বস্তুসত্তা হল ঘনীভূত শক্তিমাত্র। তাহলে রূপান্তরের সময় আদি পরমাণু থেকে যে শক্তি হারিয়ে যায় তা যায় কোথায়? যদি তাকে গ্রহণ করার মত কোন শক্তিক্ষেত্র না থাকে— তাহলে তা হারিয়ে যেতে পারে না। এ-জন্য একটি সাধারণ ক্ষেত্রের দরকার, যার চার্জ হবে নিরপেক্ষ বা নিউট্রাল। এ ধরনের ক্ষেত্রকেই বলা যাবে ব্রহ্মন। এই যে ক্ষেত্র, এই ক্ষেত্র পরমাণু প্রতিপরমাণুর অবক্ষয়ের ফলে যে শক্তিটুকু হারিয়ে যায় সেই হারোনো

শক্তিকে গ্রহণ করে। অন্য সকল তেজও এই ক্ষেত্র থেকেই নির্গত হয়। এরকম একটা ক্ষেত্রকে বলা যায় নিউট্রন ফিল্ড। নিউট্রন নিরপেক্ষ চার্জ সম্পন্ন। অথচ যখন আপনা আপনিই প্রতি ১২ থেকে ১৫ মিনিটের মধ্যে তা থেকে একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রন বেরয়— তারা চার্জ সম্পন্ন হয়ে বেরয়। প্রোটনের হয় ধনাত্মক চার্জ। ইলেকট্রনের হয় ঋণাত্মক চার্জ। সুতরাং আদি যে শক্তি তা নিউট্রনেরই মত নিরপেক্ষ হতে পারে। সুতরাং তার মধ্যে বিপরীত গুণসম্পন্ন পরমাণু যুক্ত হয়ে থাকতে পারে এমন ভাবা যায়। অর্থাৎ তার মধ্যে সত্তা ও অসত্তা, সময় ও না-সময় ইত্যাদি একত্রে যুক্ত থাকতে পারে। প্রকাশের সময়ই শুধু এই সত্তাগুলি নিজেদের গুণ প্রকাশ করে দেখা দিতে পারে। আদিসত্তার মধ্যে এই স্বত বিভক্তিকরণ না ঘটলে সেই সত্তা কখনই বস্তুসত্তায় অবতরণ করতে পারত না।

এই কারণেই সৃষ্টির আদিসত্তাকে আদি-মানস শক্তি বলা হয়। সেই মানস শক্তিকে প্রাচীনেরা নিরপেক্ষ চরিত্রের বলে বর্ণনা করেছেন। এই মানস সত্তা যখন বস্তুসত্তার গুণ প্রাপ্ত হয়ে প্রকাশতত্ত্ব হিসেবে দেখা দেয়— সেই প্রকাশের মাধ্যেও ধনাত্মক ও ঋণাত্মক শক্তি, পুরুষ-শক্তি ও মহিলা-শক্তি একত্রে বিধৃত হয়ে থাকে। বিজ্ঞানে এই প্রকাশতত্ত্বই নিউট্রন হিসেবে দেখা দিয়েছে। নিউট্রন চার্জ-নিরপেক্ষ হবার জন্য বহু নিউট্রন একত্রে সমবেত হয়ে থাকতে পারে। অন্যান্য পরমাণুর মত সমচরিত্রের হওয়া সত্ত্বেও তারা একে অপরকে ঠেলে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেনা। বরং পরস্পর যুক্ত হবার জন্য যে চাপ সৃষ্টি করে তাতেই আদি এক ধরনের ডিম্ব জাতীয় পদার্থের সত্তা তৈরি হয়। বৈজ্ঞানিক Gamow এই জন্য বলেছেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি বস্তুসত্তা ছিল ঘনীভূত নিউট্রন। এই নির্ভেজাল ঘনীভূত নিউট্রন চাপের ফলে বিস্ফোরিত হয়ে স্বতন্ত্র নিউট্রন সমূহ সৃষ্টি করেছিল। সেই নিউট্রনগুলি ইলেকট্রন ও প্রোটন সমূহ নির্গত করেছিল। এই প্রোটন ও ইলেকট্রনই দেশের বুকে হাইড্রোজেন অণু তৈরি করে। কিন্তু আদি বস্তুসত্তা ছিল আদি নিউট্রন। আদি এই বস্তুসত্তার মধ্যে বিপরীত ঐক্যবদ্ধ হয়ে ছিল। প্রাচীন মিশর ও হিন্দু পুরাণ-কাহিনীতে উপরোক্ত সত্তাটি অত্যন্ত সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। শুধু নিরপেক্ষ মানসশক্তিক্ষেত্র সমূহ ছিল তাই নয়— ছিল তাদের ঘনীভূত প্রকাশও। মিশরীয় পুরাণ-কাহিনীতে নুন ছিলেন আদি আত্মিক সলিল। এই নুনের প্রকাশ ঘটেছিল আতুম-এর মধ্য দিয়ে। এই জন্য আতুমকে HE-SHE- দেবতা বলা হ'ত— যিনি নিজের ইচ্ছাশক্তি বলে অর্থাৎ স্বতই নুন থেকে নির্গত হয়েছিলেন। এই স্ব-ইচ্ছা ছিল এক ধরনের ব্যক্ত শব্দ। গল্প আছে এই রকম : নিজেকে নিঃসঙ্গ বোধ করে তিনি নিজের ছায়ার সঙ্গে মিলে অন্যান্য দেবতার সৃষ্টি করেন। সৃষ্টিশক্তিবলে নিজের মধ্য থেকে তিনি (পুরুষ) ও তেফ্‌নুৎ (মহিলা) নির্গত করেন। যারা পরবর্তীকালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একাত্ম হয়ে যায়।

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানীদের চিন্তার সঙ্গে মিশরীয় এই কাহিনীটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে মিলে যায়। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, শক্তিক্ষেত্রগুলি ঘনীভূত হয়ে নিউট্রন সমূহ সৃষ্টি করেছিল। সেই নিউট্রন থেকে প্রোটন ও ইলেকট্রন নির্গত হয়। এই প্রোটন ও ইলেকট্রন মিলে হাইড্রোজেন অণু তৈরি করে। ফলে প্রোটন ও ইলেকট্রন একাত্ম হয়ে যায়, ঠিক যেমন শু ও তেফ্‌নুৎ হয়েছিল। বিশ্বসৃষ্টি কল্পনায় আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানীদের মত মিশরীয় ঋষিদেরও যে ধারণা ছিলনা এ-কথা জোর দিয়ে বলা যায় কি?

আমরা আগেই বলেছি যে, প্রাচীন ঋষিরা তাঁদের অতি উচ্চ কল্পনাকে সাধারণ মানুষের মধ্যে আনার জন্য গল্পের আকারে তা পরিবেশন করতেন। প্রাচীন গল্পগুলি তাই রূপক গল্প। আধুনিক বিজ্ঞানের ধারণা যাঁদের স্বচ্ছ তাঁরা একটু লক্ষ্য করলেই পৌরাণিক কাহিনীগুলির অন্তরালে রূপকের মুখোস পরে ঘুমিয়ে থাকা বৈজ্ঞানিক সত্যকে আবিষ্কার করতে পারবেন।

রূপকের আড়ালে প্রাচীন কালের সব উন্নত সভ্যতার গল্পগুলিই এই ধরনের বৈজ্ঞানিক সত্যের কথা বলে গেছে। মধ্য আমেরিকার সর্বোত্তম দেবতা 'ওম্‌টিওট্‌ল' ছিলেন বিজ্ঞানের আদি তত্ত্বের অর্থাৎ psychic mind field-এর মতন। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তিনিই সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর স্বতন্ত্র অবস্থার মধ্যেই ছিল পুরুষ ও মহিলাত্মক দিক। দেব-দেবীর চরিত্র একত্রে যুক্ত করে তিনি প্রারম্ভে বিশ্বডিম্বের ঠিক মধ্যখানে অবস্থান করেছিলেন। আপন সত্যকে তিনি নিজেই আবিষ্কার করেন, আবার নিজেকে তিনি নিজেই সৃষ্টি করেন। আদি আত্মিক চেতনা হিসেবে তিনি সব কিছুর মধ্যে আছেন, আমেরিকানদের এরকম ধারণাই ছিল। সেই জন্য কখনই তাঁর সম্পূর্ণ রূপ আঁকা হয়নি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁর সৃষ্টি, অন্যান্য দেবতাও তাঁরই সৃষ্টি— এমন কি মহান দেবতা কোয়েৎজল-কোয়াট্‌লও। তাঁর এই দেবদেবী একত্রে সংযুক্ত রূপের অর্থ শুধু উন্নত চিন্তার অধিকারী ব্যক্তিরাই বুঝতেন। তাঁর সহধর্মিনী হিসেবে নক্ষত্রখচিত যে সায়া বা ঘাগ্‌রা দেখানো হয়েছে তার দ্বারা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকেই বোঝানো হয়েছে। হিন্দু মতে সমগ্র প্রকৃতি ও প্রকৃতিজাত জিনিষই স্ত্রীলিঙ্গাত্মক। এইজন্য বৈষ্ণব-শাস্ত্রে পার্থিব পুরুষ ও নারীকে পুরুষপ্রকৃতি (মহিলা) ও নারী-প্রকৃতি (মহিলা) বলা হয়। ওম্‌টিওটল সম্পর্কে যে-সব গল্প আছে তা থেকে তাঁর অস্থায়ীত্বের মধ্যে স্থায়ীত্বকেই বোঝায়, বোঝায় ধ্বংসের মধ্যে অমরত্বকে। পদার্থবিজ্ঞানে elementary particle-গুলি ঠিক এমনতর ব্যবহারই করে, বিশেষ করে নিউট্রনগুলি।

পরমাণুর অবক্ষয় বলতে বিজ্ঞানে যে কথা আছে তা দ্বারা যথার্থই অবক্ষয় বোঝায় না, বোঝায় রূপান্তর। একটি পরমাণু অবক্ষিত হয়ে ভিন্ন পরমাণু রূপে দেখা দেয়।

সকল দেশের পুরাণ-কাহিনীই হল এক ধরনের প্রতীকী গল্প, যে গল্পের মধ্য দিয়ে এক ধরনের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক সত্য প্রকাশ করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা এখন ব্যবহার করেন code language, আর প্রাচীন ঋষিরা ব্যবহার করতেন রূপক গল্প।

ব্রহ্মার বৈজ্ঞানিক পটভূমি বোঝার জন্য সৃষ্টি প্রকাশের মধ্যে যে দ্বৈতচরিত্র দেখা যায়, লক্ষ্য করা যাক ব্রহ্মা সম্পর্কিত পুরাণ কাহিনীর মধ্যেও সেই ধরনের চরিত্র ছিল কিনা।

বেদ ও উপনিষদের একাধিক সূক্তে বিজ্ঞনে উক্ত শক্তিক্ষেত্রের দিকে ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়— যে শক্তিক্ষেত্র হল বস্তুবিশ্ব আরম্ভ হবার প্রারম্ভ পর্যায়, যার মধ্যে ছিল আদি ভ্রূণ। এই একাত্ম ভ্রূণই বিভক্ত হয়ে নানা বিচিত্র বস্তুসত্তার জন্ম দেয়। এই স্বতন্ত্র সত্তাগুলি বিসদৃশ চরিত্রের হলেও (proton ও electron) তাদের মধ্যেই ছিল পরস্পর মিলিত হবার বাসনা— যে মিলন তাদের স্বতন্ত্র সত্তাকে নষ্ট করবেনা (ঠিক ইলেকট্রন ও প্রোটন যেমন মিলিত হয়েও অণুর মধ্যে সতন্ত্র সত্তা বজায় রেখে অবস্থান করে)। ঠিক একই ধরনের ঘটনা ঘটতে দেখা যায় আমাদের এই সৌর বিশ্বেও যেখানে সূর্যের আকর্ষণে আকর্ষিত হয়ে গ্রহগুলি সূর্য পরিক্রমা করে স্বতন্ত্র এক সৌর বিশ্ব তৈরি করেছে। কিন্তু সূর্যের মধ্যে তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেনি।

আদি একাত্ম ভ্রূণের এই যে বিভক্তিকরণ তারই মধ্যে ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তের গোপন রহস্য নিহিত রয়েছে। প্রকাশতত্ত্বের জন্য এই ধরনের বিভক্তিকরণের প্রয়োজন আছে—যাকেই পুরুষ সূক্তে যজ্ঞ নামে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু পুরুষ সূক্তের সেই যজ্ঞকে যদি বাচ্যার্থে গ্রহণ করা হয় তাহলেই বিরাট রকমের ভুল হয়। এতে যে কোন আদি পুরুষের দেহকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল তা নয়। তাছাড়া এ-সব গল্পের মধ্যে বিপরীত ধর্মী সত্তার মিলনকে যদি যৌন সংসর্গ বলে গ্রহণ করা হয় তাহলেও বিরাট ভুল করা হয়।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই রকম একটি বক্তব্য আছে : 'পুরুষ রূপে আদিতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছিল আত্মন অবস্থায়। তিনি ছিলেন এমন অবস্থায় যেভাবে নর ও নারী আলিঙ্গনাবদ্ধ মিলনের অবস্থায় থাকে। সেই পুরুষ নিজেকে দু'ভাবে পত্ অর্থাৎ বিভক্ত করেন। এবং তা থেকে একজন পতি ও পত্নীর উদ্ভব হয়। তিনি জানালেন যে, তিনিই সৃষ্টি, কারণ তিনিই এসব সৃষ্টি করেছেন। এই ভাবেই সৃষ্টির উদ্ভব হয়।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের পুরুষ সূক্তে আছে :—

"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম।।[1]

পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র চরণ। তিনি পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করে দশ অঙ্গুলী পরিমাণ অতিরিক্ত হয়ে বিরাজ করেন।

"পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্য।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি।।"[2]

"যা হয়েছে এবং যা হবে— সবই সেই পুরুষ। খাদ্যের মধ্য দিয়ে যখন তিনি সবকিছু অতিক্রম করে বেড়ে ওঠেন তখন তিনি অমৃতত্ত্বের শাসক।"

"যৎপুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ।।"

"যখন পুরুষকে হব্যরূপে গ্রহণ করে দেবতারা যজ্ঞ আরম্ভ করলেন তখন বসন্ত ঘৃত হল, গ্রীষ্ম কাষ্ঠ হল এবং শরৎ হল হব্য।"

"নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা লোকাঁ অকল্পয়ং।।"

"তাঁর নাভি থেকে আকাশ, মস্তক থেকে স্বর্গ, দু'চরণ থেকে ভূমি, কর্ণ থেকে দিক ও ভুবন সকল নির্মিত হয়েছে। এইভাবে তাঁরা জগৎকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন।"

"যজ্ঞেন যজ্ঞম যজন্ত দেবাস্তানি ধর্মানি প্রথমান্যাসন্।
তেহ্ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্রপূর্বে সাধ্যা সন্তি দেবাঃ।।"

"দেবতারা যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞ করলেন। এই অনুষ্ঠানই প্রথম ধর্মানুষ্ঠান। যে স্বর্গলোকে প্রধান প্রধান দেবতা ও সাধ্যেরা আছেন, মহিমান্বিত দেবগণ সেই স্বর্গ প্রতিষ্ঠা করলেন।"

উপরোক্ত সূক্তগুলিতে যে সত্যই কোন মনুষ্যরূপী পুরুষকে দেখানো হয়েছে তা নয়। আসলে এসবই কোন ব্যোমমার্গীয় ঘটনা। সহস্রচক্ষু হল দেশের অসংখ্য তেজকায়া (particles)। সহস্রচরণ হল ব্রহ্মাণ্ডের নানা স্তর যেখানে বস্তুসত্তা আকৃতিগ্রহণ করেছে। যেখানে খাদ্যের কথা বলা হয়েছে সেই খাদ্য হল আমাদের চিন্তা যা দ্বারা বিশ্বমানসকে শক্তিশালী করা হচ্ছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ও মানুষের মধ্যে সাদৃশ্য টানা হয়েছে এই কারণে যে, মানুষের দেহ যেমন তার চিন্তাদ্বারা পরিচালিত, বিশ্বও তেমনই বিশ্বমানস দ্বারা পরিচালিত।

যে যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে, তা বাচ্যার্থে কোন যজ্ঞ নয়। এ হল যথার্থ অর্থে আত্মসেবা। সেই কারণেই 'যজ্ঞের উদ্দেশে যজ্ঞ করা হল' এ-কথা বলা হয়েছে। এই তত্ত্বই সৃষ্টিকে শাসন করছে। এ ধরনের ঘটনা অব-অণু পর্যায়েও লক্ষ্য করা যায়। অব-অণু (sub-atoms) নিজেদের অবক্ষয় ঘটিয়ে ভিন্ন পরমাণুতে পরিণত হয় এবং বস্তুসত্তা সৃষ্টি করে।

এই যে যজ্ঞ, একাত্ম পুরুষের দেহ থেকে স্বতন্ত্র পুরুষ ও মহিলারূপে আত্মবিচ্ছেদকরণ,— এই গল্পকেই পরে ব্রহ্মারূপে কল্পনা করে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্রহ্মার মধ্যে বিপরীত গুণাত্মক বস্তুসত্তা একীভূত হয়ে আছে। ব্রহ্মা হলেন আত্মিক তেজক্ষেত্রের (psychic energyfield) ঘনীভূত রূপ।

ব্রহ্মপুরাণে 'অপব' নামে একটি শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। 'অপব' অর্থ যিনি জলে ক্রিড়া করেন। সেই অর্থে এই নামটি ব্রহ্মাকে দেওয়া হয়েছে। অপব-এর মধ্যে রয়েছে পুরুষ ও মহিলা তত্ত্ব একত্রে যুক্ত। এই একত্রে সংযুক্ত অবস্থাই পরে বিভক্ত হয়ে দুটি স্বতন্ত্র ভাবে প্রকাশ পায়, যেমন নিউট্রন থেকে ধনাত্মক চার্জ (পুরুষ) সম্পন্ন প্রোটন ও ঋণাত্মক চার্জ (মহিলা) সম্পন্ন ইলেকট্রন প্রকাশ পায়।

এই জন্যই মৎস্য পুরাণে এই ধরনের গল্প পাওয়া যায় ঃ—

ব্রহ্মা তাঁর পবিত্র দেহ থেকে (অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন সত্তা থেকে) একটি মহিলার জন্ম দিলেন—যার নাম হল শতরূপা বা সাবিত্রী বা সরস্বতী বা গায়ত্রী বা ব্রাহ্মণী। সেই আত্মজাকে দেখে ব্রহ্মা কামমোহিত হলেন। (কামমোহিত হওয়া মানে electro magnetic আকর্ষণ বোধ করা)। বললেন, আঃ! কী সুন্দর! শতরূপা তাঁর দৃষ্টির দক্ষিণ দিকে গেলেন। ব্রহ্মা তাঁর দিকে তাকাতে গেলে তাঁর স্কন্ধে দ্বিতীয় একটি মস্তিষ্ক গজালো। শতরূপা ব্রহ্মার দৃষ্টি এড়াবার জন্য তাঁর বাঁ দিকে ও পেছন দিকে গেলেন। ব্রহ্মা তাঁকে দেখার চেষ্টা করলে তাঁর স্কন্ধ থেকে আরও দুটি মস্তিষ্ক নির্গত হল। অবশেষে শতরূপা আকাশে উঠে গেলেন। ব্রহ্মা তাঁকে দেখার চেষ্টা করলে তাঁর মাথা থেকে পঞ্চম মুণ্ডটি নির্গত হল। [হিন্দু পুরাণ-কাহিনীতে পঞ্চমুণ্ড সহ 'পঞ্চানন' নামে এক দেবতার কথাও আছে। তবে তিনি আসলে শিব (গতিতত্ত্বের প্রতীক)। প্রকাশ তত্ত্বের রূপধারী ব্রহ্মার মত তাঁর পঞ্চমুণ্ড থাকলেও তিনি হলেন গতি ও প্রকাশ তত্ত্বের একত্রে গ্রথিত রূপ]। পঞ্চমুণ্ড গজাবার পর ব্রহ্মা শতরূপাকে বললেন, 'এস আমরা প্রাণসম্পন্ন জীব তৈরি করি— মানুষ, দেবতা, অসুর সব। ব্রহ্মার এই কথা শুনে শতরূপা নেমে এলেন। নির্জন একটি স্থানে গিয়ে তাঁরা শতবর্ষ একত্রে কাটালেন।

যদি একটু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করা যায়, তাহলে আধুনিক বিজ্ঞান তত্ত্বের কথা আমাদের মনে পড়ে যাবে। ব্রহ্মার চতুর্দিকে ব্রাহ্মণীর নৃত্য একটি হাইড্রোজেন অণুর কথা আমাদের মনে করিয়ে দেয়— যেখানে সে একটি ইলেকট্রন হয়ে একটি প্রোটনের চতুর্দিকে বৃত্তায়িত ভঙ্গীতে নৃত্য করছে।

তবে যাঁরা অত্যন্তই বস্তুবাদী তাঁরা এ ধরনের গল্পের অন্তরালস্থ সত্যিকারের ব্যাপারটি খোঁজ করতে চান না। এবং ঘটনাটিকে আর্য মানসিকতার যৌন জীবনের একটি চিত্র বলে মনে করেন। তবে ঘটনাটিকে যে বাচ্যার্থে গ্রহণ করলে ভুল করা হবে মৎস্য পুরাণই সে বিষয়ে বলে গেছে। মৎস্য পুরাণ বলেছে ঃ— 'যৌনতার চিন্তা মানুষের মধ্যেই আসা সম্ভব, কারণ, মানুষের হল বস্তুসাত্তিক দেহ। তাদের যৌন সংসর্গ ভিন্ন ধরনের— যে যৌন সংসর্গ দ্বারা তারা জন্ম দেয়। কিন্তু সৃষ্টির আদি পর্যায়ে সব ঘটনাই স্বর্গীয়। এ-সময় রজঃগুণই প্রাধান্য অর্জন করে ছিল। স্বর্গীয় সত্তার সৃষ্টি হয় ভিন্ন ভাবে। মানুষের পক্ষে এই নিবিড় রহস্য অনুধাবন করা খুবই কষ্টকর।'

পৃথিবীর সকল দেশেই সৃষ্টিতত্ত্বে এই ধরনের যৌন সংসর্গের কথা থাকলেও— বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বে এমন ধরনের কোন উল্লেখ নেই বলে অনেকে মনে করেন। তবে সেখানে স্থূল ভাবে এমনতর কোন ঘটনার উল্লেখ না থাকলেও সূক্ষ্ম ভাবে কিন্তু রয়েছে। বাইবেলের (Old Testament) প্রথম অধ্যায়ের ২৭ নং সূক্তে যে ধরনের বক্তব্য দেখা যায় :—

"So God created man in His own image, in the image of God created He-him; male and female created He-them,"[1]

এখানে অন্যান্য দেশের সৃষ্টিতত্ত্বের মতই রয়েছে সৃষ্টির আদি কারণের কথা ও পুরুষ ও মহিলাত্মক শক্তির একত্রে থাকার কথা, যদিও অত্যন্ত সূক্ষ্ম অবস্থায়। বাইবেলকার সৃষ্টিতত্ত্বে ঈশ্বরের যে রূপ কল্পনা করেছেন—একটু লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে—তার মধ্যে রয়েছে ধনাত্মক (পুরুষ) ও ঋণাত্মক (মহিলা) শক্তি একত্রে যুক্ত। অন্যান্য দেশের, বিশেষ করে ভারতীয় সৃষ্টিতত্ত্বের কল্পনার সঙ্গে আদি-কারণ চিন্তায় এখানে কোন পার্থক্য নেই।

ভারতবর্ষে ত্রিমূর্তির মধ্যে সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংসের যে একত্র গ্রথিত রূপ রয়েছে অব-অণুপর্যায়ে প্রকৃতির ব্যবহার লক্ষ্য করলে তার মধ্যেও ভারতীয়দের এই ধরনের চিন্তার সত্যতা লক্ষ্য করা যাবে। যদি 'মেসন' নামে পরমাণুটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় তাহলে অদ্ভুত ব্যবহার দেখা যাবে। মেসন-এর হল ধনাত্মক চার্জ। এর অবক্ষয় হলে তা অ্যান্টি-পার্টিকুলে পরিণত হয়। মেসন যেমন ধনাত্মক চার্জ সম্পন্ন, অ্যান্টি-মেসন আবার তেমনই ঋণাত্মক চার্জ সম্পন্ন। সেই ঋণাত্মক মেসনের যদি অবক্ষয় হয় তবে তা পরিবর্তিত হয়ে পার্টিকল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, অ্যান্টি-পার্টিকল হিসেবে নয়। ধনাত্মক পাইয়ন (pion) অবক্ষয়ের ফলে ঋণাত্মক অ্যান্টি-মুয়ন হয়। আবার ঋণাত্মক পাইয়নের মত অ্যান্টি-পার্টিক্ল অবক্ষিত হয়ে মুয়নের মত পার্টিক্ল-এ রূপান্তরিত হয়।

এর অর্থ দাঁড়ায় এই :— হওয়া ও না হওয়া, সৃষ্টি ও প্রলয়, একই অন্তর্নিহিত সত্যের দু'টি দিক্; খারাপ থেকে ভালর এবং ভাল থেকে খারাপের জন্ম হতে পারে। তবে ভাল বা মন্দ সবই আপেক্ষিক শব্দ। আপনি যে অবস্থায় আছেন সেই অবস্থার উপর ভাল ও মন্দের যথার্থতা নির্ভর করে। অ্যান্টি-পার্টিক্ল-এর কোন ছায়াপথে পার্টিক্ল অসুর-শক্তিরূপে বিবেচিত হবে। আবার পার্টিক্ল-এর জগতে অ্যান্টি-পার্টিক্ল দৈত্যরূপে আবির্ভূত হবে। আমাদের কাছে অ্যান্টি-পার্টিকল দৈত্য-এর প্রতীক।

কিন্তু যথার্থ ব্যাপারটা এই যে, অ্যান্টি-পার্টিক্লও আদি মানসক্ষেত্র, এখন বিজ্ঞানে যাকে বলে কোয়ান্টাম ফিল্ড— তারই প্রকাশ মাত্র। এই কোয়ান্টাম ফিল্ডে পার্টিক্ল অ্যান্টি-পার্টিক্ল, ধনাত্মক ও ঋণাত্মক অবস্থা সবই এক হয়ে আছে।

পার্টিক্ল-জগতে 'নিউট্রাল মেসন' নামে এক ধরনের পার্টিক্ল আছে। এই পার্টিক্ল-এর মধ্যে প্রকাশতত্ত্ব ও গতিতত্ত্ব একত্রে যুক্ত হয়ে আছে— অর্থাৎ

(১) He-him = ব্রহ্মারূপী একক সত্তা, নিউট্রন ফিল্ড। Male and Female = প্রোটন ও ইলেকট্রন-, নিউট্রন জাত। He-them = প্রোটন ও ইলেকট্রনের মিলনে - অর্থাৎ নানা সংখ্যার প্রোটন ও ইলেকট্রনের মিলনে অন্যান্য অণু-পরমাণু।

প্রকাশের উপকরণ ও গতির উপকরণ একত্রে যুক্ত হয়ে আছে। রেস্ট মাস (Rest mass) থাকা সত্ত্বেও এই পার্টিক্‌লটি অবক্ষয়ের ফলে হয় ফোটনে (চূড়ান্ত গতি-অবস্থার প্রকাশক) রূপান্তরিত হয় নয়তো পেছনে কোন বস্তুসত্তা (mass) না ফেলে সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়। দ্বৈতের মধ্যে এই ঐক্যের সম্পর্ক প্রাচীন মরমিয়া সাধকেরা জানতেন। এরই একটি চিত্র ফুটে উঠেছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের চিন্তার মধ্যে।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, পাইয়ন নামক পার্টিকলটি স্ট্রং-ফোর্স বাহক। এই স্ট্রং-ফোর্সই পরমাণুকে তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে সাহায্য করে। সেই অর্থে এই পাইয়নের মধ্যে প্রকাশ-তত্ত্বের স্বাভাবিক সংরক্ষণিক দিকেরও পরিচয় মেলে। এই স্ট্রং-ফোর্সই অণুর নিউক্লিয়সের মধ্যে প্রোটন ও নিউট্রনকে আটকে রাখে। ধনাত্মক চার্জ সম্পন্ন প্রোটনগুলি স্বাভাবিক ভাবে একে অপরকে ঠেলে সরিয়ে দেবার কথা, তা হয়না এই স্ট্রং-ফোর্সেরই কারণে। অতি ক্ষুদ্র অঞ্চলের মধ্যে এই স্ট্রং-ফোর্সই প্রোটনগুলিকে সমচার্জ সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও বেঁধে রাখে। এখানে বার্তাবহের কাজ করে পি-মেসন বা পাইয়ন। অব-আণবিক পর্যায়ে পরমাণুগুলির যে ভূমিকা, তা লক্ষ্য করলে এদের সবাইকে যেন সচেতন বলে মনে হয়। এবং সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে একটি মানস সত্তার খেলা চলেছে সে দিকেই ইঙ্গিত দেয়। এই জন্যই এডিংটনের মত বৈজ্ঞানিক বলতে পেরেছেন যে, সমগ্র বিশ্ব জগৎ মানস উপাদানে তৈরি। প্রাচীন ঋষিরা সেই মানস-উপাদানের কথা জানতেন বলেই অব-আণবিক পর্যায়ে পরমাণুগুলির লীলা লক্ষ্য করে ব্যক্তিরূপের মধ্য দিয়ে তাদের কাহিনী প্রকাশ করেছিলেন। সেই সত্যই প্রাচীন মরমিয়া ঋষিগণ কথিত পুরাণ কাহিনী। ব্রহ্মা তাঁদের কাছে নিউট্রন ফিল্ড স্বরূপ যা থেকে জগতের প্রকাশ হয়েছিল। সেই জন্য তিনি নিরপেক্ষগুণের অধিকারী। তিনি শুধুমাত্রই প্রকাশতত্ত্ব। সৃষ্টি করতে পারেন, নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। সেটা পারেন শিব। সেই নিয়ন্ত্রণযুক্ত বিশ্বকে ধারণ করেন বিষ্ণু বা দেশ।

বিষ্ণু ও দেশতত্ত্ব

ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণু এই হিন্দু দেবতা ত্রয়ীর মধ্যে যে একাত্ম রূপ— তা একেরই মধ্যে বহুর অবস্থানের কথা ঘোষণা করে— বিজ্ঞান আজ যার সাক্ষাৎ পেয়েছে। সাধারণ অর্থে এই হিন্দু দেবতা ত্রয়ীর অর্থ হল :— ব্রহ্মা স্রষ্ঠা, শিব সংহারক এবং বিষ্ণু পালক। তবে বিজ্ঞানে কিন্তু এঁদের প্রকাশতত্ত্ব, গতিতত্ত্ব ও দেশতত্ত্বের প্রতীক বলে মনে করা হয়। সেই শিব বা গতিতত্ত্ব, এবং ব্রহ্মা বা প্রকাশতত্ত্বের কথা আগের দুটি নিবন্ধে আলোচনা করেছি। এবার বিষ্ণু বা দেশ তত্ত্বের কথা আলোচনা করা যাক। মূল লক্ষ্য, এঁদের পেছনে যে বিজ্ঞান রয়েছে তাই ধরিয়ে দেওয়া। কিন্তু সেই বিজ্ঞানে আসার আগে বিষ্ণুর সাধারণ ধর্মীয় দিকটি আলোচনা করে নেওয়া যাক।

ভারতের জনপ্রিয় ধর্মগুলির অধিকাংশই ঈশ্বরবাদী। ভারতবর্ষে বৈষ্ণব ধর্ম ও শৈবধর্ম, দু'টি বড় ধর্ম। বৈষ্ণবেরা অধ্যাত্মজগতে ভগবান বিষ্ণুকেই সর্বাপেক্ষা বড় বলে মনে করেন। আবার শৈবরা মনে করেন শিবই সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা। তবে এই দুই দেবতার উৎসই অতি প্রাচীন। সম্ভবত ভারতের আদি নরগোষ্ঠীর মধ্য থেকেই তাঁরা উঠে এসেছিলেন। আর্য প্রাধান্যের প্রথম দিকে তাঁরা তেমন গুরুত্ব না পেলেও পরে মহান দেবতা হিসেবে আবির্ভূত হন। বিষ্ণু, বিষ্ণু নামেই আসেন। ঋগ্বেদে বিষ্ণুর অর্থ স্বয়ংপ্রকাশ। আবার অনেকে মনে করেন বিষ্ণু শব্দের উদ্ভব—দ্রাবিড়দের থেকে। দ্রাবিড় 'বিন্' আকাশ এই শব্দ থেকেই বিষ্ণু শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। বিষ্ণুর চরিত্রের মধ্যে দেশতত্ত্বের কথাই মূল বক্তব্য হিসেবে ফুটে উঠেছে। এই জন্য বিষ্ণুর উৎস হিসেবে রয়েছে দেশতত্ত্ব। বিষ্ণুর বর্ণের সঙ্গেও আকাশের অনেকটা মিল আছে। পরে বিষ্ণুর অবতার তত্ত্ব থেকে যে কৃষ্ণ-ভক্তি সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল দেখা যায় তাও এসেছিল দক্ষিণ ভারতের আভির জাতির মায়ন দেবতা থেকে। উত্তর ভারতে অভিবাসন কালে তাঁরা সঙ্গে করে এই দেবতাকে নিয়ে এসেছিল। প্রথম এরা বসতি স্থাপন করে মথুরা অঞ্চলে— সেখান থেকে সরে যায় সৌরাষ্ট্রে, দ্বারকায়। সুতরাং অনেকেই যে মনে করেন যে, এই দেবতা আর্যদের সংস্পর্শে এসে মহান দেবতায় পরিণত হয়েছিলেন—তা নয়। তাঁকে কেন্দ্র করে যে মহান ভক্তিতত্ত্ব ও দর্শন তার সবটাই আর্য-পূর্ব ভারতীয়দের বলেই মনে হয়, কিংবা আর্যরাও ভারতীয়ই— তাদের বহিরাগত বলে ভাবার চিন্তাটাই ভুল। তারা ভারতবর্ষে বহিরাগত— এমন বলার জন্য তর্কের অতীত কোন প্রমাণ নেই। আবার তারা ভারতীয় এ কথাও সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়ে দেখা দেয়নি। সুতরাং বিষ্ণুর জন্য আর্য বা আর্য-পূর্ব ভারতীয় কাউকেই স্বতন্ত্রভাবে গুরুত্ব না দিয়ে, এই দেবতাকে ভারতীয় দেবতা বলে ধরে নেওয়াই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।

বৈষ্ণব ও শৈবধর্মের মধ্যে শৈবধর্মকেই অনেকে প্রাচীনতর বলে মনে করেন। এর মধ্যে আদি নরগোষ্ঠীর চিন্তাধারার অনেক কিছুই বিদ্যমান। সমালোচকদের মতে (বর্তমান লেখকের মতে নয়, কারণ তিনি মনে করেন যে ভারতের মহান দার্শনিক আদর্শ ভারতীয়দেরই। তাঁরা এ মাটিতেই জন্ম নিয়েছিলেন। যদি আর্যরা বহিরাগত হয়ে থাকেন প্রাগার্যদের থেকে কোন রকমেই তাঁরা উন্নত ছিলেন না। আর আর্যরা ভারতীয় হলে আর্য-প্রাগার্য ভেদরেখা টানার কোন প্রয়োজনই নেই। ঋগ্বেদকে অনেকে নির্ভেজাল আর্য মানসিকতার প্রকাশ বলে মনে করেন। কিন্তু ডি. ডি. কোশাম্বি দেখিয়েছেন যে, ঋগ্বেদের বহু সূক্ত অনার্যদের দ্বারা রচিত) আর্য ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে এসে বৈষ্ণব ধর্ম যতটা রঙ পাল্টেছে শৈবধর্ম ততটা পাল্টায়নি। শৈবধর্ম দার্শনিকতায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগৎকে অতিক্রম করে অদ্ভুত এক মরমিয়া জগতে প্রবেশ করেছে। দার্শনিক দৃষ্টিতে শৈবধর্ম অনেকটাই সাংখ্য দর্শনের কাছাকাছি। তবে আবেগময়তায় শাক্ত-ধর্মের সঙ্গে নিবিড় ভাবে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে। শাক্তধর্মে রয়েছে প্রকৃতির শক্তি পর্যায়ের পূজা যা থেকেই জগৎ-এর উদ্ভব হয়েছে। শাক্ত ভক্তিবাদীদের কাছে শক্তি মা হিসেবে প্রতিভাত হয়েছেন। তবে তন্ত্রের উদ্ভব, বিশেষ করে স্থূল পঞ্চ-'ম'-কার-তন্ত্রের উদ্ভব একে কিছুটা সুস্থ সংস্কৃতি বর্জিত করেছে—এবং এর মধ্যে আদি নরগোষ্ঠীর নানা ভাব-ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছে। বঙ্গদেশে এই শাক্ততত্ত্ব যেভাবে বিকশিত হয়েছে তাতে এই তত্ত্ব আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের কোয়ান্টাম পদার্থতত্ত্বের সমপর্যায়ে উঠে এসে একে মহান তাত্ত্বিক দর্শনে দাঁড় করিয়েছে। অপর পক্ষে শৈবদর্শনও কাশ্মীর শৈবধর্ম থেকে আরম্ভ করে এমন মরমিয়া পর্যায়ে পৌঁচেছে যে, একে আধুনিক বিজ্ঞানেরও ঊর্ধ্বস্তরে ধরা যেতে পারে।

তবে শৈবধর্ম অপেক্ষা বৈষ্ণব ধর্মের আবেদনই জনগণকে বেশি করে আকৃষ্ট করেছে। ভারতবর্ষের প্রায় তিন চতুর্থাংশ লোকই বৈষ্ণব ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত। ফলে বৈষ্ণব ধর্ম হিন্দুদের প্রতিনিধিস্থানীয় ধর্মে পরিণত হয়েছে। বৈষ্ণব ধর্মের তাত্ত্বিক আদর্শ বাদ দিলে শৈবধর্ম থেকে এধর্ম বেশি ঈশ্বরবাদী। এই ঈশ্বরবাদের জন্য অন্যান্য দেবদেবীকে অস্বীকার না করেও ভগবান বিষ্ণুতেই এই ধর্ম বেশি আত্মসমর্পণকারী। তাঁদের এই ঈশ্বরবাদ একেশ্বরবাদী চরিত্রে বৈষ্ণব ধর্মকে রঞ্জিত করেছে। নানা রূপে বৈষ্ণবদের ধর্মবিশ্বাস লক্ষ্য করলে খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে এই ধর্মের যেন একটা নিকট সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। কঠোর নিয়মনিষ্ঠার যে সন্ন্যাসবৃত্তি, বৈষ্ণবদের সে ধরনের বৃত্তি খুব একটা আকর্ষণ করেনি। শৈব কাপালিকদের ভয়ঙ্করীতাও এ ধর্মের মধ্যে নেই। বৈষ্ণব মন্দিরে রক্তের প্লাবন ঘটিয়ে কোন পশুবলি দেবার প্রথাও নেই। অধ্যাত্মতার জন্য আত্মনিগ্রহের পথও বৈষ্ণবেরা পছন্দ করেনি। ঈশ্বর সম্পর্কে বৈষ্ণবদের মনোভাব কোমল ভাবনা-

দ্বারা আবৃত। এই ধর্ম মানব প্রেম দ্বারাও বেশি উদ্বোধিত। ঈশ্বরে নরত্ব আরোপ করে দেখার ফলে এই ধর্ম মানুষের কাছে আরও বেশি আকর্ষণীয় হয়েছে। সাধারণ মানুষেরই মত ভগবান বিষ্ণু বা কৃষ্ণকে বা রামকে মানুষ কাছে পায়। আবেগপ্রবণ ভক্তেরা তাঁর কথা পর্যন্ত শুনতে পায়। ধর্মের গ্লানির সময় যুগে যুগে তিনি ধরাধামে আবির্ভূত হন। অশুভ শক্তির হাত থেকে ভক্তজনকে তিনি রক্ষা করেন। অবতার হিসেবে ভগবান বিষ্ণু পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ও রাজা রাম রূপে এত ব্যাপক ভাবে জনচিত্ত অধিকার করে আছেন যে, ভারতীয় জনচিত্ত থেকে বৈষ্ণব ভাব দূর করা প্রায় অসম্ভব। শ্রীমদ্‌ভগবত্‌গীতায় ভক্তিমার্গের ক্ষেত্রে যে দর্শনের প্রকাশ ঘটেছে—তা দার্শনিকতায় যেমন অত্যুচ্চ তেমনই সকল ধর্মের সারকে নিজের অঙ্গে স্থান দিয়ে প্রায় ভারতীয় সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কাছেই সাদরে গৃহীত হয়েছে। শুধুমাত্র যোগের সর্বোৎকৃষ্ট ফলশ্রুতিই যে এই ভগবত্‌গীতা তাই নয়। আধুনিক বিজ্ঞানের পটভূমিতে আলোচনা করলে সমান ভাবে বৈজ্ঞানিকও।

ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনকালে যে-ভাবে সাধারণ মানুষ নির্যাতিত হচ্ছিল তাতে অতীন্দ্রিয় সহজ কোন আকর্ষণে তাদের ধরে রাখতে না পারলে হিন্দুধর্মের অস্তিত্বই বিনষ্ট হত। ঠিক সেই সময় বৈষ্ণবধর্ম বিরাট এক আকর্ষণের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় সাধারণ মানুষের কাছে। বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে একটা শ্রেণীবর্ণ নির্বিশেষে গণতান্ত্রিক আবেদন ছিল। ফলে সমাজের তথাকথিত অচ্ছুৎ ব্যক্তিরাও এই ধর্মের মধ্যে সহজে প্রবেশ করতে পারে। কবীরের মত জোলা, সেনার মত নরসুন্দর, রামদাসের মত চর্মকার এই ধর্মে নিজস্ব ধারা প্রবর্তন করতে পেরেছিলেন। চিন্তার স্বাধীনতায় এখানে কখনও হাত দেওয়া হয়নি। ফলে বৈষ্ণব ধর্মে ব্যক্তি-মানসিকতা অকৃত্রিমভাবে প্রকাশিত হবার সুযোগ পেয়েছে। বৈষ্ণব ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতারা প্রতিটি সম্প্রদায়ে দিব্য মর্যাদার অধিকারী হয়ে উঠেছেন।

বৈষ্ণব ধর্ম একদিক থেকে ধরতে গেলে শৈবধর্মের ঠিক বিপরীত। শৈবধর্মের মত এই ধর্মেরও নিজস্ব দর্শন আছে। সেই দর্শনে বিষ্ণুর মধ্যে ফুটে উঠেছে উচ্চতর বিকাশের কথা, জীবাত্মার ঊর্ধ্বমুখি গতির কথা। অধ্যাত্ম চিন্তার নানা মহৎ আদর্শও এই দর্শনের মধ্যে ফুটে উঠেছে। নিত্য পরিবর্তনশীল জগতে ভগবান বিষ্ণু সংরক্ষণিক অবস্থার প্রকাশক। সর্বোত্তম দেবতা হওয়া সত্ত্বেও ভগবান বিষ্ণু নানা রূপে পৃথিবীতে অবতাররূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

ঋগ্বেদে বিষ্ণু সর্বোত্তম দেবতারূপে আত্মপ্রকাশ করেননি। তবে আকাশে তাঁর তিন পদক্ষেপের যে কথা বলা হয়েছে তা সম্ভবতঃ সূর্য দেবতা হিসেবেই তাঁর পদচারণা। এখানে বিষ্ণুর মধ্যে নরত্ব আরোপের চেষ্টা লক্ষ্য করার মত। ঋগ্বেদে বিষ্ণু ইন্দ্রের সঙ্গে নিকট সম্পর্কে রয়েছেন— তবে কিভাবে পুরুষোত্তম রূপে

কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁকে যুক্ত কর হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। ঐতিহাসিক ভাবে এই দেবতার বিকাশের কথা বর্ণনা করা গেলেও ভক্তজনের উপর তার কোন প্রভাব পড়েনি। বৈষ্ণব ধর্মে হতাশার ভাব কম আছে। কৃচ্ছ্র সাধনাও তেমন নেই। বরং মানবিকতায় ও ঈশ্বরীয় করুণার রসে সিক্ত হয়ে শৈবধর্ম থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। ভারতীয় সাহিত্যেও এই জন্য বৈষ্ণব ধর্ম অনেক বেশি প্রসার লাভ করেছে। এই ধর্মান্দোলন ভারতীয় কাব্যসাহিত্যকেও নতুন প্রেরণা দিয়েছে।

বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে একটা সারগ্রাহী ভাব আছে। অবতারবাদের মধ্য দিয়ে বৈষ্ণব ধর্ম বৈদিক মরমিয়া ভাব এবং প্রাক্-বৈদিক আদি ভারতীয় নরগোষ্ঠীর দেবতাপূজার ধারাকে একত্রে মিলিয়ে দিয়েছে— যে মিলন থেকেই, যাকে বলে হিন্দুসংস্কৃতি বা ধর্ম তার উদ্ভব ঘটেছে। অবতারবাদ যে হিন্দুধর্ম ও বৈষ্ণবধর্মের ক্ষেত্রে বিশেষ একটা কিছু, তা নয়। তবু এই অবতারবাদ এসেছিল এই কারণে যে, নির্যাতিত মানুষ 'ঈশ্বর নিপীড়িতের জন্য অবতাররূপে ধরাধামে অগ্রসর হন' এ ধারণাকে সাগ্রহে বরণ করে নিয়েছিল।

এই অবতার রূপ যে শুধু নররূপেই ঘটেছিল তা নয়--- পশুরূপেও ঘটেছিল। এই পশুরূপে অবতারের ধারণা যে আর্যদের অভিজ্ঞান-তত্ত্ব থেকে এসেছিল তা নয়। যদি সেরকম কিছু ঘটেও থাকে তবে তা বিকৃত ভাবে ঘটেছে। সম্ভবত: বহুদিন ধরেই মানুষের মধ্যে যে পশুতে দেবত্ব আরোপ করে পুজোর ব্যবস্থা ছিল সেই ব্যবস্থা থেকেই পশুরূপে অবতারত্বের ধারণা এসেছে। অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলে এর মধ্যে ক্রমবিকাশ তত্ত্বেরও একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। কারণ, ভগবানের অবতার রূপ শুধুমাত্র পশুতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি— নররূপে চূড়ান্ত সিদ্ধি অর্জন করেছে।

পশুতে দেবত্ব আরোপের ধারা প্রাচীন ব্যাবিলনেও ছিল। ব্যাবিলনের বহু আঞ্চলিক দেবতাই ছিলেন পশুরূপী। যখন তাঁরা নররূপ গ্রহণ করেন তখন প্রাচীন পশুরূপ পরিত্যক্ত হয় এবং সেই পশু দেবতার বাহন হিসেবে দেখা দেয়। কিন্তু এ-সব প্রশ্ন নিয়ে ভক্তজন মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজনই বোধ করেননি। তাঁদের কাছে এটুকুই বড় সান্ত্বনার কথা যে, যুগে যুগে অশুভ শক্তিকে দমন করার জন্য তিনি অবতাররূপ গ্রহণ করেন।

সমালোচকেরা অবশ্য আর্য-ব্রাহ্মণদের অধ্যাত্ম চিন্তার সঙ্গে অনার্যদের ভূত-প্রেত জাতীয় শক্তিপূজার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পান না। কিভাবে যে, দুয়ের মধ্যে একটা মিল হয়ে গেছে সেটাও তাঁরা বুঝতে পারেন না। আর্যরা যে তাঁদের চিন্তাধারা অনার্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে আগ্রহী ছিলেন— সেরকমও তাঁরা মনে করেন না। তাঁদের ধারণা, আর্যদের চিন্তাধারা অনার্যরা গ্রহণ করলে—আর্যরা তেমন আপত্তির কারণ দেখেন নি। এই ভাবেই ধীরে ধীরে দুটি সংস্কৃতির বা ধর্মীয় চিন্তার মধ্যে একটা মিলন ঘটে যায়। তবে এদেশের আদি

অধিবাসী বা দ্রাবিড় জনগণ অসংস্কৃত ছিল,— অধ্যাত্ম জগতে ভূতপ্রেত ইত্যাদিতে বিশ্বাসী ছিল— এরকম মনে হয় না। ঋগ্বেদীয় আর্যদের অধ্যাত্মতার কথা চিন্তা করে আধুনিক হিন্দুধর্মের সাধারণ নিয়ম কানুনের দিকে যদি তাকানো যায়, তাহলে নানাবিধ আচার বিচার বা অনুষ্ঠানের ৯৫ ভাগই অনার্য বলে মনে হয়। একটা অপ-সংস্কৃতি কিভাবে সুস্থ একটা সংস্কৃতিতে এমনভাবে গ্রাস করতে পারে? পৌরাণিক কাহিনীগুলি যদি অনার্য সংস্কৃতি দ্বারাই প্রভাবিত হয়ে থাকে তাহলে আধুনিক কালে বিজ্ঞানীরা তার মধ্যে আশ্চর্যভাবে নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক সত্য খুঁজে পেতেন না। অনার্য সংস্কৃতি বলে যাকে মনে হয়—অর্থাৎ ভারতবর্ষের আদি জনগণের সংস্কৃতি, তা কোন অংশেই নিচুমানের ছিল না। বর্তমানে ভারতবর্ষে নানা উন্নত ধরনের যে আধ্যাত্মিক চিন্তা রয়েছে তার কোনটাই আর্য বা অনার্য জনগণের, এরকম মনে না করে এই উপমহাদেশেরই আন্তর সত্তার অবদান এরকম ভাবতে হবে। মনে করতে হবে, এ-সবই ভারতীয়দের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত।

দক্ষিণ ভারতই দ্রাবিড়দের ভূমি—এরকম দাবি করা যেতে পারে। সেই দক্ষিণ ভারতে তথাকথিত আর্য সংস্কৃতির কথা, বিশেষ করে অধ্যাত্ম জগতে, যদি বিচার করে দেখা যায়, তাহলে লক্ষ্য করা যাবে যে, নাম্বুদ্রি জাতীয় কয়েকটি সম্প্রদায় বাদে আর সর্বত্রই সেখানে হিন্দুধর্ম দ্রাবিড় বিশ্বাসের রঙ গায়ে মেখেই বসে আছে। যে-ভাবেই হোক দুটি সংস্কৃতির মিলন নানা স্থানে নানাভাবে হয়েছে। দাক্ষিণাত্যে ও সুদূর দক্ষিণে বিঠোবা বা বিথল নামে এক দেবতা আছেন। কোন এক ব্রাহ্মণই হয়তো এই নামে দেবত্বে উন্নীত হয়েছিলেন। তিনিই পরে ভগবান বিষ্ণুর অবতার হিসেবে স্বীকৃত হন। বিষ্টু বা বিষ্ণু নাম থেকেই বিথল বা বিঠোবা নাম নেওয়া হয়েছিল। বিঠোবা নামকরণ দ্রাবিড়দের প্রভাবেই হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। বালাজি, যিনি বালকৃষ্ণ সমান, বর্তমানে তিনিই তিরুপতির বেঙ্কটেশ। এই বেঙ্কটেশ কোন আঞ্চলিক সাধু যিনি দেবত্বে উন্নীত হয়েছিলেন। একই ধরন লক্ষ্য করা যায় হিমালয় অঞ্চলে। সেখানে বাসুদেব বা বাসদেও এবং পুরুষোত্তম পরবর্তীকালে বিষ্ণুর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছেন। ত্রিবান্দ্রমে 'পদ্মনাভ' (যার নাভি থেকে পদ্ম নির্গত হয়েছে) নামে এই বিষ্ণুই আঞ্চলিক সর্পপূজার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছেন। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ এই দেবতার কাছ থেকেই রাজ্যপাট লাভ করেছেন বলে ধারণা করে 'পদ্মনাথ' অর্থাৎ ঈশ্বরের ভৃত্য' এই উপাধি গ্রহণ করেন।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঞ্চলিক নাম তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু রাম ও কৃষ্ণের প্রসঙ্গে যখন আসা যায়—তখনই সম্পূর্ণ চিত্রটা যায় পাল্টে। হয়তো আন্তর্জাতিক ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েই চরিত্র দুটি গড়ে উঠেছে। অনেকে এই দুটি চরিত্র ঘিরে যে দর্শন গড়ে উঠেছে তার মধ্যে খ্রীস্টধর্মেরও প্রভাব খুঁজে পান। এ-সব দেখে

শুনে মনে হয় বিষ্ণুকে কেন্দ্র করে যে ধর্ম— তা নানা জাতির নানা বিশ্বাসের সমন্বয়েই গড়ে উঠেছে।

শৈবধর্মের মত বৈষ্ণব ধর্মেরও প্রসারের জন্য একদল প্রচারক বিশেষ ভাবে দায়ী। এ-ক্ষেত্রেও পথ প্রদর্শকের ভূমিকা নিয়েছিল দক্ষিণ ভারত। বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের প্রথম পুরোহিত হলেন রামানুজ। রামানুজের বক্তব্য : বিষ্ণুই ব্রহ্মা। সৃষ্টির পূর্বেও তিনি ছিলেন। তিনিই সৃষ্টির আদি কারণ ও স্রষ্টা। তিনি বা তাঁর সম্প্রদায় মনে করেন যে, বিষ্ণু ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক। তবু বেদান্ত তত্ত্ব অস্বীকার করে তিনি মনে করেছেন যে, এই দেবতা রূপহীন নন, গুণহীন নন। তিনি সকল শুভ গুণসম্পন্ন। তাঁর দু'ধরনের রূপ ঃ— (১) সর্বোচ্চ সত্তা বা পরামাত্মা, সূক্ষ্ম অস্তিত্ব এবং (২) বিশ্ব বা বস্তু হিসেবে স্থূল অস্তিত্ব। পরমাত্মা হিসেবে তিনি কারণ স্বরূপ। বিশ্ব হিসেবে তিনি পরিণতি স্বরূপ। এই জন্যই রামানুজের এই তত্ত্বকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলা হয়। স্রষ্টা ও সৃষ্টির রূপ বাদেও নানা সময়ে তিনি আরও নানা রূপ পরিগ্রহ করেছেন। এই নানা রূপই তাঁর বিভিন্ন ধরনের অবতার রূপ।

রামানুজের এই তত্ত্ব উত্তর ভারতে শ্রীবৈষ্ণব সমাজ গ্রহণ করে। শ্রীবৈষ্ণব সমাজ মনে করেন যে, সর্বোচ্চ দেবতা বিষ্ণু কারণ হিসেবে অদৃশ্য হলেও ফল হিসেবে সৃষ্টির মধ্যে পরিদৃশ্যমান। শ্রীবৈষ্ণব সমাজ কৃষ্ণপ্রেমিকা রাধার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। এই সমাজ আবার দক্ষিণ ভারতীয় তেঙ্গলই ও উত্তর ভারতীয় বদগলই নামে দু'ভাগে বিভক্ত। পার্থক্যের কারণ তিলক কাটার স্থান নিয়ে মতভেদ।

বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নায়ক হলেন মাধব বা আনন্দতীর্থ। তিনি একজন দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্মণ। জন্ম দক্ষিণ কনর-এর উদিপি নামক স্থানে। সময় ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ। তিনি বৈষ্ণব ও শৈবতত্ত্বের মধ্যে একটা সমন্বয় ঘটাবার চেষ্টা করেছিলেন। তবে এই সমন্বয়ের মধ্যেও তিনি বিষ্ণুর প্রাধান্য রাখতে চেয়েছিলেন। তিনি বিষ্ণু বা হরির অস্তিত্বের কথা বলেন। এবং শঙ্করের অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে দ্বৈতবাদ প্রচার করেন। তিনি মনে করেন, দু'টি স্বতন্ত্র শাশ্বত সত্তা আছে। স্বতন্ত্র হিসেবেও তারা পরস্পররের উপর নির্ভরশীল— যেমন প্রভু ও ভৃত্য বা রাজা এবং প্রজা। একটি হল স্বাধীন সত্তা বা ঈশ্বর (বিষ্ণু)। অপরটি নির্ভরশীল সত্তা— জীবাত্মা বা আত্মা।

বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে সর্বাপেক্ষা বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন উত্তর ভারতে রামানন্দ। রামানন্দ সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। তিনি চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পাদের কোন এক সময়ে এসেছিলেন। শ্রীরাম রূপে তিনি বৈষ্ণব তত্ত্বকে তুলে ধরেছিলেন। সেই সঙ্গে তুলে ধরেছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের সহধর্মিনী সীতাকে। তাঁর অনুগামীরা রামানুজ সম্প্রদায়ের সঙ্গে

নিকট সম্পর্কে যুক্ত ছিলেন। উত্তর ভারতের হিন্দু রক্ষণশীল সমাজের বিরুদ্ধে রামানন্দী সম্প্রদায় বিদ্রোহী হিসেবে দেখা দিয়েছিল। রামানন্দ মনে করতেন, জাতি বর্ণ সবই সেই পরমাত্মাতেই মিশে যায় বা পবিত্র সত্তাতেই মিশে যায়। তাই তিনি নিচুবর্ণের লোকদেরও নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছিলেন। এর আগে হিন্দু-সমাজে অধ্যাত্ম অধিকার ছিল শুধু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রীয়দের। ফলে রামানন্দের ধর্মান্দোলন জনপ্রিয়তা লাভ করে। আরও বড় কথা—তিনি তাঁর বক্তব্য প্রচার করতেন সংস্কৃতের পরিবর্তে হিন্দীতে।

ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মের একটা নবজাগরণ ঘটে মুসলমান শাসনকালে। মুসলিম শাসকদের নিপীড়ণ হিন্দুদের স্বধর্মপরায়ণতা আরও বাড়িয়ে দেয়। নানা ধর্মগুরু ও নানা ধর্ম-সম্প্রদায় দেখা দেয়। বৈষ্ণবধর্ম সেই ধর্মান্দোলনের মধ্যেই একটা আন্দোলন— এবং সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী আন্দোলন। এই ধর্মান্দোলন হিন্দু সমাজকে যেমন ধর্মান্তরিত হওয়া থেকে রক্ষা করেছিল তেমনই এর আবেগপ্রবণ ভক্তিবাদের জন্য জনমানসে সম্পূর্ণ এক নতুন ভাবের জোয়ার এনেছিল। জনগণের কথ্য ভাষায় এই ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল বলে বহু আঞ্চলিক সাহিত্যেরও বিকাশ ঘটে। ঠিক এমনটিই ঘটেছিল খ্রীস্টধর্মের আবির্ভাবে খ্রীস্টান জগতে ।

তবে ইসলামের সঙ্গে হিন্দুধর্মের সম্পর্ক মিত্রতার না হলেও উভয়ের সম্পর্ক উভয় ধর্মকেই প্রভাবিত করেছিল। ইসলামের একেশ্বরবাদ হিন্দুধর্মের উপর প্রভাব ফেলে। খ্রীষ্টান ও ইহুদী ধর্মের প্রভাবও হিন্দুধর্মের উপর কিছু কিছু পড়ে। যে দক্ষিণ ভারত থেকে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারকেরা এসেছিলেন সেই দক্ষিণ ভারতে এই ধর্মপ্রচারকদের সময়ে মুসলমান, ইহুদী ও খ্রীস্টধর্মানুসারী সকল সম্প্রদায়ের লোকই ছিল। ফলে এই ধর্মপ্রচারকেরা তাদের ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বলে মনে হয়। আবার এঁদের মধ্যেও অনেকে আঞ্চলিক হিন্দু-ধর্মের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। যেমন দক্ষিণ ভারতীয় মুসলমানরা অনেকটাই স্থানীয় আচার আচরণ ও ধর্মবিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। আঞ্চলিক এই সব বিশ্বাস গ্রহণ করার ফলেই বিদেশী ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও ইসলাম ভারতের জাতীয় ধর্মের মর্যাদা লাভ করে। পারশ্যের প্রভাবে ভারতীয় ইসলামে যে সুফীবাদ[১] দেখা দেয়, ভারতীয় হিন্দুরাও তাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে, কারণ— ভারতীয় মরমিয়াবাদের সঙ্গে তার আত্মিক সম্পর্ক ছিল। সুফীতত্ত্বের প্রভাবে ভারতীয় সর্বেশ্বরবাদ, ভাববাদ, অনুষ্ঠান বিমুখতা, সহনশীলতা কিছুটা প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারে। বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে এসব লক্ষণ অত্যন্ত প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছিল।

---

[১] সুফীবাদকে ইরাণের জরথুস্ত্রবাদী আর্যদের প্রাচীন বিশ্বাস জীইয়ে রাখার একটা কৌশল বলে অনেকে মনে করেন। সেই অর্থে সুফীবাদ আর্যচিন্তাজাত।

ধর্মান্দোলন ও রাজনৈতিক আন্দোলন— উভয় আন্দোলনই বৈষ্ণব ধর্মকে ভারতবর্ষে জনপ্রিয় করে তুলতে সাহায্য করে। ফলে বৈষ্ণব ধর্ম ভারতীয় অধ্যাত্ম আন্দোলনে আজ সর্বাপেক্ষা বড় শক্তি হিসেবে কাজ করছে। এই ধর্মান্দোলনের গণতান্ত্রিক চরিত্র একে সর্বজনগ্রাহ্য হতে আরো বেশি সাহায্য করে। তাছাড়া বিচার আচারহীন ভক্তির যে প্রাধান্য এতে দেখা দেয় তাতে সাধারণ মানুষের কাছেও এই ধর্ম বেশি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। ব্যয়বহুল অনুষ্ঠানবাহুল্যহীনতাও দরিদ্রজনের কাছে এই ধর্মকে বেশি আদরণীয় করে তোলে। কবীর (জোলা) সেনা (নাপিত) ও রামদাস (চামার)-এর মত সমাজের নিচুতলার মানুষও স্বচ্ছন্দে এই ধর্মান্দোলনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। এই ধর্মের মরমিয়া দিক তাঁদেরও অন্তরের অন্তস্তলে এমন সাড়া তোলে যে, ভাবাবেগ নতুন রসে অধ্যাত্ম তত্ত্বকে সিক্ত করে। তবে স্বাধীনভাবে সকলেই এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার জন্য কিছুটা ত্রুটি-বিচ্যুতিও এর মধ্যে দেখা দেয়। একটি সঠিক তত্ত্বের বদলে ধর্মপ্রচারকদের ব্যক্তিগত সুর বেশি করে বেজে ওঠে। শৈব ধর্মে এই ব্যক্তিগত ভাব কখনও তেমন বড় হয়ে ফুটে উঠতে পারে নি। কিন্তু ব্যক্তি ভাব প্রাধান্য পাবার ফলে বৈষ্ণব ধর্মের নানা সম্প্রদায় ধর্মপ্রচারকদের নামানুসারে চিহ্নিত হয়। এই ধর্মপ্রচারকেরা শেষপর্যন্ত দিব্যসত্তা পেয়ে যান। তাঁদেরও পূজা করা আরম্ভ হয়।

রামানন্দের বারজন শিষ্যের মধ্যে কবীর ছিলেন একজন। উত্তর ভারতে কবীর অত্যন্ত জনপ্রিয়। তিনি যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন তার মধ্যে একটা সারগ্রাহী ভাব ফুটে উঠেছে। মুসলমান ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়েও হিন্দুভক্ত হতে তাঁর পথে কোন অন্তরায় সৃষ্টি হয়নি। কবীরের দোহাতে—খ্রীষ্টধর্ম, সুফীবাদ ও বেদান্তবাদের স্পর্শ লক্ষ্য করা যায়। তিনি হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করেছিলেন। সেই জন্য তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কেউ নিজেদের দাবি করেছেন মুসলমান বলে, কেউ হিন্দু বলে। তবে পরবর্তীকালে কবীরের শিষ্যরা গুরুর আদর্শ তেমন করে পালন করেননি। এখন তাদের অবস্থান একেশ্বরবাদ ও পৌত্তলিকতার মাঝামাঝি কোন এক স্থানে। কেউ কেউ বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবেই পড়ে গেছেন। কৃষক সমাজের কাছে কবীর শুধু দোঁহাকার হিসেবেই টিকে আছেন। মধ্যবিত্তদের কাছেও তাঁর সংস্কারমুক্ত মনোভাব দারুণভাবে স্বীকৃত। কবীরের প্রভাব শিখদের আদি গ্রন্থসাহেব-এর উপরেও পড়েছিল বলে অনেকে মনে করেন।

নববৈষ্ণব ধর্মের আর একটি দিক ফুটে উঠেছে মেবারের রাণী মীরা বাঈয়ের সঙ্গীতে (ষোড়শ শতাব্দী)। শ্রীকৃষ্ণের উপর অবিচল আস্থাই মীরা বাঈয়ের বক্তব্যের মূল কথা। মীরা বাঈয়ের যে মরমিয়া সুর তা কিন্তু রাজস্থানে মাটি

খুঁজে পায়নি, পেয়েছে বাংলার কোমল প্রান্তরে। এর কারণ বোধহয় এই যে, বাঙ্গালী তেমনভাবে আর্য-প্রভাবের মধ্যে পড়েনি, তার নোঙর ফেলা ছিল সর্বপ্রাণবাদে।

বাংলার বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শ্রীচৈতন্য (১৪৮৪-১৫২৭ খ্রীঃ)। তিনি রাধাকৃষ্ণের উপর নির্ভর করতে বলেছেন। তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান তারকব্রহ্ম নামসংকীর্তন। এই নামসংকীর্তনের ছন্দে ভক্তদের তিনি বিশ্বছন্দের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। বৌদ্ধধর্মের প্রতি দুর্বল ও সামাজিক বিশৃঙ্খলায় ক্ষতবিক্ষত বাঙ্গালী শক্তিতত্ত্ব ও সর্বপ্রাণবাদের দিকে ঝুঁকে ছিল। শ্রীচৈতন্য এই সময় ঈশ্বরের প্রতি আবেগময় ভক্তির যে কথা বলেছিলেন, সেই কারণে বাঙ্গালী অতি সহজেই তাতে সাড়া দিয়েছিল।

তবে এই ধর্মান্দোলনের পথ ধরে ত্রুটিবিচ্যুতি যে বৈষ্ণব সমাজে কিছু প্রবেশ করেনি তা নয়। বৈরাগী বৈষ্ণবদের নেড়ানেড়ি ভাব ও গোঁসাইগুরুবাদ অনেক অনৈতিক জিনিষকে বৈষ্ণব সমাজে ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

বৈষ্ণব ধর্মে বিরোধী ধর্মমত প্রতিষ্ঠাতা বুঝি ছিলেন দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্মণ বল্লভাচার্য। বৃন্দাবনে তাঁর নাকি কৃষ্ণ দর্শন হয়েছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বালকৃষ্ণ বা বালগোপাল রূপে পূজো করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। শেষ বয়সে বল্লভাচার্য সন্ন্যাসী জীবন ত্যাগ করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং গৃহী-জীবন শুরু করেন। তাঁর শিষ্যরা ভোগবাদী হয়ে ওঠেন। তাঁরা যে পন্থা অনুসরণ করেন তার নাম পুষ্টি-মার্গ। নির্জনতা ও আত্মনিগ্রহের পথ তাঁরা পরিত্যাগ করেন। এঁদের থেকেই গুরু-গোঁসাইবাদের উদ্ভব হয়। ভক্তদের নির্দেশ দেওয়া হয়— তন্ মন্ ধন্ দিয়ে গুরুর সেবা করতে হবে। বিশেষ করে মহিলা ভক্তদের এইভাবে গুরুসেবা করতে বলা হয়। মথুরার গোকুলে এবং পশ্চিম ভারতের বাণিজ্য শহরগুলিতে বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ফলে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক অনাচার প্রবেশ করে। পশ্চিম ভারতের ভ্রাম্যমান একদল ভিক্ষুক সম্প্রদায় 'মান্‌ভাব'(সংস্কৃত মহানুভব)-রাও বল্লভাচারীয়দের মত এই ত্রুটিযুক্ত। এই কারণে এই সম্প্রদায় ব্রাহ্মণদের চোখে হেয় বলে প্রতীয়মান হয়।

ঐতিহাসিকেরা বিষ্ণুকে আর্যপূর্ব ভারত থেকে হিন্দুধর্মে আগত বললেও প্রথম এঁর উল্লেখ পাই আমরা ঋগ্বেদেই। সেই ঋগ্বেদের সময় থেকে বিষ্ণুসাধনা নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। আজ তিনি ভারতবর্ষের প্রধানতম দেবতা হলেও ঋগ্বেদের তাঁর স্থান ছিল দেবতাদের সমাজে কিছুটা নিচেই। তবে ঋগ্বেদে কোন দেবতা সম্পর্কে বলতে গেলেই এমন করে বলা হয়েছে যে, তিনি যে অপর কারো অপেক্ষা ছোট এমন মনে করাই দুঃসাধ্য। সেই অর্থে বিষ্ণুও মহামহিম হয়েই ফুটে উঠেছিলেন। ঋগ্বেদে বিষ্ণুর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য চিত্র

তাঁর তিন পদক্ষেপের চিত্র। এই তিন পদক্ষেপকে সমালোচকরা সূর্যের উদয়কাল মধ্যাহ্নকাল ও অস্তকাল বলে মনে করেছেন। তাঁদের মতে বিষ্ণু ও সূর্যে কোন ভেদ নেই। এই জন্যই পরবর্তীকালে সূর্যকে 'সূরযনারায়ণ' বা 'সূর্যনারায়ণ' বলা হয়েছে। তবে অনেকে আবার এই পদক্ষেপকে ত্রিলোক বলে মনে করতে চান, যেমন দ্যু-লোক, অন্তরীক্ষলোক ও ভূ-লোক।

ঐতিহাসিক ভাণ্ডারকারের মতে বিষ্ণু-সাধনার ধারা বিভিন্ন পর্যায়ে ভারতবর্ষে বিকাশ লাভ করেছে। যেমন, ৫ম শতাব্দীতে ভারতীয় হিন্দুসমাজে এমন এক অবস্থা চলেছিল যা নতুন ধর্ম প্রচারে সহায়ক হয়। ঠিক এমনই অবস্থাতে ভারতবর্ষে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। এবার ঘটে বৈষ্ণব ধর্মের। তবে অল্পদিনের মধ্যেই বৈষ্ণব ধর্মে পঞ্চরাত্র ও ভাগবৎ সমাজ আত্মপ্রকাশ করে। পরে নারায়ণ পূজার ধারার সঙ্গে এই ধর্ম যুক্ত হয়ে যায়। খ্রীস্টাব্দ আরম্ভ হবার পরেই পশুচারক আভির উপজাতি বৈষ্ণব ধর্মে তাদের উপজাতি-নায়ক কৃষ্ণকে ঢুকিয়ে দেয়। অষ্টম শতাব্দীতে এবং একাদশ শতাব্দীতে এই ভক্তিবাদী আন্দোলনের সঙ্গে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ যুক্ত হয়। কিন্তু একাদশ শতাব্দীতেই মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দানা বেঁধে ওঠে। রামানুজ ভক্তি আন্দোলন দ্বারা এই ধর্মে রাখালিয়া দিক ও রাধাতত্ত্ব যোগ করেন। মাধব বা আনন্দতীর্থ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সেই একই ভাবকে টেনে নিয়ে যান। শঙ্করের অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে তিনি দ্বৈতবাদ প্রচার করেন। ভগবান বিষ্ণুকে তিনি সর্বোচ্চ দেবতা হিসেবে ঘোষণা করেন। উত্তর ভারতে রামানন্দ বৈষ্ণব ধর্মে রামচন্দ্রকে টেনে আনেন। অপর পক্ষে রামানুজ নিয়ে আনেন নারায়ণ তত্ত্ব। পঞ্চদশ শতাব্দীতে কবীর একেশ্বরবাদ প্রচার করেন। রাম ও রহিম তাঁর কাছে এক বলে প্রতীয়মান হয়। তিনি পৌত্তলিকতার বিরোধিতা করেন। ষোড়শ শতব্দীতে বল্লভাচার্য বৈষ্ণব ধর্মে রাধাকৃষ্ণ ভজনার মধ্যে যৌনতা টেনে আনেন। তবে বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্যের রাধাকৃষ্ণ ভজনায় ভিন্ন সুর থাকলেও পরিণতিতে তাও বল্লভাচারীদের মত যৌন-অনাচার দোষে দুষ্ট হয়ে ওঠে। দাক্ষিণাত্যে নামদেব ও তুকারাম রাধা-কৃষ্ণ পূজা বাদ দেন এবং ঈশ্বরে নির্ভেজাল ভক্তির কথা বলেন। মোক্ষের জন্য তাঁরা নিজেদের হৃদয় সংস্কারের কথা বলেন, নৈতিক মান উন্নয়নের কথা বলেন। সংস্কৃতের পরিবর্তে তাঁরা মাতৃভাষায় তাঁদের তত্ত্ব প্রচার করতেন।

দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন সময় বিষ্ণু নানাভাবে ভারতীয় অধ্যাত্ম রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছেন। বিভিন্ন অবতার রূপে, যেমন জলচর মৎস্য, উভচর কূর্ম, স্থলচর বরাহ জাতীয় পশু, নরপশু জাতীয় নৃসিংহ থেকে শেষ পর্যন্ত নরাকৃতিতে নানারূপে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন। কখনও এই অবতারের সংখ্যা দেখানো হয়েছে ছয়। কখনও দশ, আবার কখনও কুড়ি। কিন্তু সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ

অবতার হলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাম। রামপূজার কথা খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর আগেই তৈরি হয়েছিল। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর আগে হয়তো পরবর্তী সংস্করণ যুক্ত হয়নি। এখানে রামের যে চিত্র আঁকা হয়েছে তাতে তিনি উদারহৃদয় এক নায়ক। তাঁর ধর্মপত্নী সীতাকে নিয়ে যে কাহিনী তা ভারতীয় জনগণের চিত্ত বিরাটভাবে জয় করে নিয়েছে। তবে খ্রীষ্টীয় যুগের একাদশ শতাব্দীর আগে রামচন্দ্র সম্পর্কিত পূজার ধারা তেমন পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়নি। বিষ্ণুপুরাণে শ্রীরাম সম্পর্কে যে-ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তা সম্ভবতঃ গুপ্ত যুগের (৩২০-৪৫৫ খ্রীঃ)। তবে শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে ভাগবত পুরাণে যে ভাবে বলা হয়েছে অন্য কোন গ্রন্থে তেমন করে বলা হয়নি। হিন্দীতে লাল্লুরাম 'প্রেমসাগর' নামে এর অনুবাদ করেন। এই গ্রন্থটি কৃষ্ণ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় গ্রন্থ। সম্ভবতঃ বাসুদেব কৃষ্ণ সম্পর্কে মেগাস্থিনিসও তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করে গেছেন। সুতরাং কৃষ্ণ সম্পর্কিত কাহিনীর যদি মৌর্যযুগেই উল্লেখ পাওয়া যায়, তবে মনে করতে হবে যে, এর উৎস তারও আগে। সম্ভবত ঔপনিষদিক চিন্তাধারার মধ্যেই কৃষ্ণতত্ত্বের বীজ লুক্কায়িত ছিল। এর চূড়ান্ত উৎকর্ষ ঘটে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মান্দোলনের সময়। কৃষ্ণ সম্ভবতঃ গোকুলের কোন স্থানীয় দেবতা ছিলেন। রাখাল বালক হিসেবে তাঁর ভূমিকা সম্ভবতঃ ইন্দ্র থেকে এসেছে। ইন্দ্রের উপাধি ছিল 'গোবিদ' অর্থাৎ গো-চারক বা রক্ষক। সেই থেকেই কৃষ্ণের নাম হয়েছে গোবিন্দ। কৃষ্ণ ছিলেন আভির উপজাতির গোপবালা দ্বারা পুজিতো। সম্ভবতঃ দক্ষিণ ভারত থেকে তারা উত্তর ভারতে অভিবাসন করেছিল। তাদের গোপবালাপ্রিয় মায়ন দেবতাই উত্তর ভারতে গোকুলের রাখাল কৃষ্ণ বা গোবিন্দ হয়েছেন। উত্তর ভারতে এই আভির জাতির অভিবাসনকেন্দ্র ছিল--- মথুরা অঞ্চল থেকে সৌরাষ্ট্রের দ্বারকা পর্যন্ত। এই রাখাল দেবতা কৃষ্ণের কাহিনী দ্বারকা অঞ্চলে আঞ্চলিক এক সমুদ্র-দেবতার সঙ্গে মিশে যায়। কালে কালে গ্রীক্ অর্ধদেবতা হারকিউলিসের কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের বীরগাথা ও বহুবিবাহ সম্পর্কিত গল্প আত্মপ্রকাশ করে। তাঁকে কেন্দ্র করে যে বৈষ্ণব তত্ত্ব গড়ে উঠেছে অনেকে তার মধ্যে কিছুটা খ্রীস্টীয় আদর্শ খুঁজে পান। অনেকে মনে করেন, মধ্য এশিয়া থেকে যে গুর্জর জাতি সৌরাষ্ট্রে এসে উপস্থিত হয়েছিল এবং যাদেরই নাম থেকে সৌরাষ্ট্রের নাম হয় গুর্জররাজ বা গুজরাট— তারাই অস্পষ্ট একটা খ্রীস্টীয় তত্ত্ব তাদের সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। তবে এ ধরনের বিশ্বাস কতটা সত্য তা নিয়ে সন্দেহ আছে। মথুরা ও দ্বারকার দেবতার মধ্যে যে সমন্বয় গড়ে উঠেছিল তা যে খুব সঙ্গতি রক্ষা করে গড়ে উঠেছিল তা মনে হয় না। পরবর্তীকালে কৃষ্ণ সম্পর্কে যে-সব কাহিনী গড়ে উঠেছে--- সেই জন্যই তার মধ্যেও অনেক অসঙ্গতি চোখে পড়ে। তবে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে যে মহান তত্ত্ব ফুটে উঠেছে তা একদিকে যেমন বিজ্ঞানসিদ্ধ, অপর দিকে তেমনই

ভারতীয় নানা দর্শন ও যোগসাধনার ফলশ্রুতি। যাঁরা যোগী তাঁরা মরমিয়া অভিজ্ঞতাতে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার সত্যতা যাচাই করে নিতে পারেন। মুলত এটা যোগেরই গ্রন্থ। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম সবই এখানে যোগের সঙ্গে যুক্ত।

যোগের মরমিয়া অভিজ্ঞতাতে অতীত ও ভবিষ্যৎ সবই প্রস্ফুটিত অবস্থায় প্রতীয়মান হয়। ভারতবর্ষের বহু পুরাণ কাহিনীর মধ্যে সত্যতা আছে কিনা প্রতত্নতাত্ত্বিক উপাদান খুঁজে সবটা তার পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। তবে ভেট দ্বারকার অস্তিত্ব কৃষ্ণ সম্পর্কিত কাহিনীর মূলে যে অনেকটাই সত্যতা ছিল তা প্রমাণ করে। যোগীরা মনে করেন— পৃথিবীতে এ যাবৎ ঘটিত ঘটনার সবই পরমাত্মাতে চিত্রিত হয়ে আছে। পরমাত্মার সঙ্গে একাত্ম সম্পর্ক স্থাপিত হলে সে-সব চলচ্চিত্রে ধরে রাখা ছবির মত দেখা যায়। যোগসাধনা দ্বারা লেখকের যে সামান্য অভিজ্ঞতা তাতে যোগীদের এ-ধারণাকে তিনি সত্য বলেই মানেন। তবে মরমিয়া অভিজ্ঞতা অমরমিয়াদের কখনই বোঝানো যাবেনা। এটি সরাসরি অভিজ্ঞতার ব্যাপার। সুতরাং বিশ্লেষণমূলক আলোচনাতে তাকে তেমন ভাবে প্রতিষ্ঠা দেওয়া যাবে না। ইদানিং পদার্থবিজ্ঞান এমন কতকগুলি তথ্য আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে যার সাহায্যে মরমিয়া অভিজ্ঞতারও অনেক কিছু ব্যাখ্যা করা যায়। সে-সব বর্তমান লেখকের 'দিব্যজগৎ ও দৈবী ভাষা' নামক গ্রন্থের দুটি খণ্ডে আলোচিত হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থে বিজ্ঞানের আলোতে মরমিয়া অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হচ্ছে না,— শুধু ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবতত্ত্বের অন্তর্নিহিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আলোচিত হচ্ছে। সেটাই বর্তমান নিবন্ধগুলির মূল উল্লেখ্য। তবে তার পূর্বে ঐতিহাসিক মানসিকতায় বৈষ্ণব ধর্ম সম্পর্কে আরও একটু আলোচনা করে নেওয়া যাক।

বৈষ্ণবদের মধ্যে নানা দল বা সম্প্রদায় আছে। বিভিন্ন বৈষ্ণবধর্ম প্রচারকদের নাম অনুসারে এই সম্প্রদায়গুলি প্রতিষ্ঠিত। এ-সম্পর্কে পূর্বেই বলা হয়েছে। প্রথম উল্লেখযোগ্য বৈষ্ণব সম্প্রদায় হল 'শ্রীবৈষ্ণব' সম্প্রদায়। প্রতিষ্ঠাতা রামানুজ। প্রধানত রামানুজের এই সম্প্রদায় দক্ষিণ ভারতেই সীমাবদ্ধ, উত্তর ভারতে তাদের তেমন কোন ভূমি নেই। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বৈষ্ণব সম্প্রদায় হল মাধব বা আনন্দতীর্থের, যিনি শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে দ্বৈতবাদের কথা প্রচার করেছিলেন। বৈষ্ণব আন্দোলনের তৃতীয় প্রবক্তা হলেন রামানন্দ। তিনি বর্ণভেদ মানতেন না। অচ্ছুৎরাও তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থান পেয়েছিল। এবং স্থানীয় মাতৃভাষাতেই তিনি তাঁর বক্তব্য প্রচার করতেন। চতুর্থ উল্লেখযোগ্য সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বল্লভাচার্য—যিনি গুরুপূজার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই গুরুপুজাবাদ নানা দুর্নাম অর্জন করেছিল। গৌরীয় বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে বল্লভাচারীয়দের একটি যোগাযোগ আছে বলে একে অনেকে স্বতন্ত্র বৈষ্ণবধর্ম সম্প্রদায় বলে মনে করতে চান না। তবে গৌরীয় বৈষ্ণবতত্ত্বে যে মহান তত্ত্ব

রয়েছে— কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ পাঠ করলেই তা বোঝা যায়। বাঙ্গালীর স্বতন্ত্র আবেগপ্রবণ মানসিকতা ও তন্ত্রতত্ত্ব যে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেই কারণেই বঙ্গীয় এই বৈষ্ণব আন্দোলন আজ সমগ্র বিশ্বে বিশেষ রকমের সাড়া ফেলেছে।

বৈষ্ণব ধর্ম মূলত একেশ্বরবাদী। কিন্তু শৈবধর্ম সর্বেশ্বরবাদী অর্থাৎ 'সমগ্র জগৎ ঈশ্বরময়' এই তত্ত্বে বিশ্বাসী।

উত্তর প্রদেশে জনগণের মধ্যে একটা দয়ার্দ্রচিত্ততা আছে। সেই কারণে বৈষ্ণব ধর্ম সেখানে স্থান করে নিতে পেরেছিল। বৌদ্ধদের জীবন-ধারার মধ্যে যে ধরনের নৈতিকতা, সর্বজীবে অহিংসার মনোভাব রয়েছে, তা বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাদের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। রাজপুতদের কিছু সংখ্যক এই বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করাতে তাদের জীবনধারার পদ্ধতিই পাল্টে যায়। তবে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় বৈষ্ণবদের প্রতি বরাবরই এক ধরনের ঘৃণা পোষণ করে এসেছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে তাঁরা কলঙ্কিত বলেই মনে করেন। বিষ্ণুর উপাসনা না করার জন্যই যে বৈষ্ণবদের প্রতি এই ধরনের ঘৃণা তা নয়। এর কারণ, তাদের অত্যধিক অহংকার, ঔদ্ধত্য।

হিন্দুদের মধ্যে যারা একটু নীতি-প্রিয় চরিত্রের তাঁরাও বৈষ্ণব সাহিত্যে যৌনতার গন্ধ পেয়ে তার বিরোধী হয়ে উঠেছিলেন। তবে রাম-চন্দ্রের কাহিনী এই ধরনের যৌনতা থেকে মুক্ত। সুতরাং এই অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মে অবতার রূপে রামচন্দ্রের কাহিনী বেশ আকর্ষণ লাভ করেছিল। বঙ্গীয় বৈষ্ণব সমাজে বৈরাগী বৈরাগিনীরা এই যৌনতাকে তাদের জীবনের মধ্যেই নিয়ে এসেছিল, এই কারণে বহু জনেই তাদের সুনজরে দেখেনি। তবে এটাও ঠিক যে, মানবীয় প্রেমই বৈষ্ণব সাহিত্যে ঈশ্বরপ্রেমে রূপান্তরিত হয়েছিল।

উত্তর ভারতে কৃষ্ণসাধনার ধারা মথুরা, গোকুল ও বৃন্দাবনেই বেশি লক্ষ্য করা যায়। পুরীতে (ওড়িশা) বিষ্ণুর সাধনা হয় জগন্নাথের মধ্যে। হিমালয়ের বদ্রীনাথেও বিষ্ণুমন্দির আছে। গুজরাটে দ্বারকাতে কৃষ্ণ-সাধনার ধারা বিরাজমান। দাক্ষিণাত্যের সোলাপুর জেলার পন্ধরপুরে বিথোবারূপে বিষ্ণুর সাধনা করা হয়। সুদূর দক্ষিণে কাঞ্জিভেরাম ও তিরুপতিতেও রয়েছে বৈষ্ণব ধর্ম. বল্লভাচারিয়াদের প্রধান কেন্দ্র হল গোকুল ও রাজস্থানে মেবারের নাথদ্বার-এতে। রামপূজার ধারা প্রবল অযোধ্যা, চিত্রকূট ও নাসিক-এ। তবে সমগ্র হিন্দীবলয়ে শ্রীরামই হলেন প্রধান দেবতা। হিন্দী ভাষাভাষি অঞ্চলে তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস' খ্রীস্টানদের বাইবেল তুল্য। শ্রীরামের মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম ভিন্ন এক মাত্রা পেয়েছে। বৈষ্ণধর্মের মূল কথা— শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্র উভয় ক্ষেত্রেই ভক্তি। তবে শ্রীরামকাহিনী নৈতিকতা, কর্তব্যপরায়ণতা প্রভৃতিতে যেমন জনজীবনের আদর্শ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে,— শ্রীকৃষ্ণ

কাহিনী তেমন নয়। এর আবেদন নিঃশর্ত ভক্তি ও শ্রীমদ্ভগবতগীতার আদর্শে। শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণব তত্ত্বে এত অসংখ্য গ্রন্থে সংযোজনা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তির একটি জীবনে তা পাঠ করে শেষ করা যায় না। কিন্তু সেই সব গভীর তত্ত্ব আলোচনা আমার লক্ষ্য নয়, ভগবান বিষ্ণুর অবতার রূপের লীলাও আমার উদ্দেশ্য নয়, আমার উদ্দেশ্য ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বররূপী একাত্ম সম্পর্কে যুক্ত যে দেবতাত্রয়— সেই দেবতাত্রয়ের অন্তর্নিহিত যে বৈজ্ঞানিক সত্য সেই সত্যকে প্রকটিত করা। সেই জন্য শিব বর্তমান গ্রন্থে গতিতত্ত্ব হিসেবেই আলোচিত হয়েছেন,— যদিও শৈবদর্শনের মধ্যে অত্যুৎকৃষ্ট মরমিয়া দর্শনও ব্যক্ত হয়েছে। ব্রহ্মাও মূলত: পৌরাণিক কাহিনীর পিতামহ্ রূপে আলোচিত হননি— তিনি প্রকাশতত্ত্ব হিসেবে আলোচিত হয়েছেন। সেই কারণে কাব্য ও পুরাণে ভগবান বিষ্ণুর নানা কাহিনী বর্ণিত হলেও— সেই কাহিনীর আলোচনা আমার বিষয় নয়। আমার বিষয় এই দেখানো যে, বিজ্ঞানের কোন্ তত্ত্বকে বিষ্ণুর মধ্য দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা ভগবান বিষ্ণুকে বিজ্ঞানের দেশতত্ত্ব হিসেবে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। কি দৃষ্টিভঙ্গীতে বিষয়টিকে তাঁরা দেখেছেন এবার সে আলোচনাই করা যাক :—

বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, আধুনিক বিজ্ঞানীরা যে-ভাবে বিশ্বরহস্যের জট খোলার জন্য চেষ্টা করছেন প্রাচীন মরমিয়া ঋষিরাও তেমনই ভাবে চিন্তা করেছিলেন। তাঁদের চিন্তাকে তাঁরা পৌরাণিক কাহিনীর রঙ দিয়ে এমন ভাবে জড়িয়ে দিয়েছিলেন যে, বিজ্ঞানের 'কোড ল্যাঙ্গুয়েজ' না ভাঙলে যেমন তার বক্তব্যকে বোঝা যায় না, তেমনই পৌরাণিক কাহিনীর আবরণ উন্মোচন করা না গেলে তার অন্তরালে প্রাচীন মরমিয়া ঋষিরা কি সত্য অনুভব করেছিলেন তা বোঝা যাবে না। বিজ্ঞানীরা আধুনিক কালে কোয়ান্টাম পদার্থ বিজ্ঞানে সূক্ষ্ম তেজক্ষেত্রের যে সন্ধান পেয়েছেন— তাকেই প্রাচীন মরমিয়া ঋষিগণ অনুভূত আত্মন বা মানস-শক্তির সঙ্গে এক করে দেখা যেতে পারে। প্রাচীন ভারতবর্ষে তারই নাম দেওয়া হয়েছিল ব্রহ্মন। এই কোয়ান্টাম ফিল্ড ঘনীভূত হয়েই সৃষ্টি করেছিল নিউট্রন ফিল্ড— যাকেই আমাদের দেশে বলা হয় ব্রহ্মা। ব্রহ্মা হলেন প্রকাশতত্ত্ব। এ-থেকে যে গতি দেখা দিয়েছিল— তাই হল গতিতত্ত্ব হিসেবে শিব। এ-দুই দেবতা সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

কিন্তু এই প্রকাশতত্ত্ব ও গতিতত্ত্বের জন্য একটি ক্ষেত্রের প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রকেই প্রাচীন ঋষিরা ভগবান বিষ্ণু বলে বর্ণনা করেছেন। বিষ্ণুই হলেন— বিজ্ঞানের দেশতত্ত্ব। যদি এই দেশ না থাকতো তা হলে বৃহৎ বিশ্বেই হোক আর ক্ষুদ্র বিশ্বেই হোক— প্রকাশতত্ত্ব ও গতিতত্ত্ব তাদের ভূমিকা পালন করতে পারত না। এই তিনের সমন্বয়েই আমাদরে ত্রিমাত্রিক জগতের বাস্তব সত্য গড়ে উঠেছে।

এই দেশতত্ত্বকেই প্রাচীন ভারতীয় ঋষিরা বিষ্ণু হিসেবে এবং প্রাচীন

মিশরীয়রা 'হুঃ' হিসেবে দেখেছেন। এঁরাও সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংসের সঙ্গে যুক্ত। কারণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব দেশের সংকোচন-বিকোচনশীলতার উপর নির্ভরশীল। বর্তমানে আমরা যে-ভাবে দেশকে দেখছি তা সম্প্রসারণশীল। এর বিকোচনের পালা হয়তো শুরু হবে কয়েক হাজার কোটী বৎসর পরে।

যদি দেশ সম্প্রসারিত না হ'ত, নিজের বুকে কিছুকে ধারণ করতে না পারত, তাহলে বাস্তব সত্য বলে আমরা যাকে ভাবি তা থাকতই না। আদিতে বিশ্বের সকল তেজ বা গতিশক্তি যেমন আদি-ডিম্বের (Primordial egg) মধ্যে ছিল, তেমনই দেশও এর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে ছিল। সেই আদি পর্যায়ে আমাদের বিশ্বের পরিধিও সেই ডিম্বের পরিধির বাইরে যেতে পারেনি। কিন্তু যখন এই ডিম্ব বিস্ফোরিত হয় তখনই বিশ্বের পরিধি বৃদ্ধি পায়। সেই বৃদ্ধি আজও চলেছে। যদি দেশের এই সম্প্রসারণ বন্ধ করে দেওয়া যায় তা হলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে একটা সংরক্ষণের দিক আছে সেটাও থাকত না। যদি সেই আদি ডিম্ব অর্থাৎ নিউট্রন ফিল্ডকে বিস্ফোরিত হতে না দেওয়া যায়— তা হলে তার মধ্যে যতই বিশৃঙ্খলা বা তরঙ্গায়িত গতি থাকনা কেন—এর প্রকাশ ঘটবে না।

ভগবান বিষ্ণুকে নিয়ে ভারতীয় পুরাণে নানা কাহিনী রয়েছে। বিজ্ঞানের চিন্তার সঙ্গে মিল রয়েছে এমন কতকগুলি রূপক কাহিনীরই আবরণ উন্মোচন করা যাক। বিষ্ণুর প্রতিটি কার্যকলাপ লক্ষ্য করলে তাঁকে পালনকর্তা হিসেবেই লক্ষ্য করা যাবে। তাঁর এই পালন কর্তার ভূমিকাই দেশের সংরক্ষণিক দিকের পরিচায়ক। এমন কি সমুদ্রমন্থনের পর অসুরদের অমৃত থেকে বঞ্চিত করার জন্য তিনি রমণীয়া নায়িকা সেজে যে ভূমিকা পালন করেছিলেন তাও তাঁর পালনকর্তার দায়িত্বই স্মরণ করিয়ে দেয়।

দেশ (space) হিসেবে বিষ্ণু ও ব্রহ্মার যে চিত্র পুরাণ কাহিনীতে অঙ্কন করা হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, তাঁর নাভি থেকে উত্থিত পদ্মে ব্রহ্মা আসীন রয়েছেন। এখানে দেশের এক গভীর তাৎপর্য রয়েছে। দেশের একটি হল তার গতিময় দিক। অপরটি নির্বিকার দিক। এই শেযোক্ত দিকটিই মহাশূন্যতারূপী দেশ যেখানে পদ্মরূপী নিউট্রন ফিল্ড একটি মানসশক্তির ঘনীকরণের ফলেই উদ্ভূত হয়েছিল। অসীম মহাশূন্যের সর্বত্রই মধ্যস্থল। সেই জন্য যেখানেই এই মানসশক্তি ঘনীভূত হয়েছিল— তাই বিষ্ণুর (দেশের) নাভিস্থল। নিউট্রন ফিল্ডকেই ভারতীয় পুরাণকাহিনীতে পদ্ম বলা হয়েছে। বলার কারণ, নিউট্রনের আবর্তিক ভঙ্গী অনেকটাই পদ্মের দলের মত। এই ঘনীভূত মানসশক্তিই মহামানসের (আত্মন) বস্তুসাত্ত্বিক সত্তা—প্রকাশতত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মা। ব্রহ্মাকে বিষ্ণুর নাভি থেকে উত্থিত পদ্মে আসীন বলে কল্পনা করার পেছনে রয়েছে এই গভীরতর তত্ত্ব ও সত্য।

বিষ্ণুকে একটি কাহিনীতে দেখা যায় তিন পদ দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের তিন লোককে আচ্ছন্ন করছেন। এটি ঋগ্বেদের একটি বর্ণনা। তবে এই বর্ণনা একটি প্রতীকী

বর্ণনা। এই প্রতীকী বর্ণনার বক্তব্য হল— বিষ্ণুর মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দেশীয় চরিত্র রয়েছে। ঋগ্বেদে বিষ্ণুকেই স্বর্গ ও মর্ত্য তৈরির কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, ত্রিভুবন তিনি তাঁর পদক্ষেপ (সম্প্রসারণ) দ্বারা তৈরি করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি ইন্দ্রের সাহায্য নিয়েছিলেন। বর্তমান ও ভবিষ্যতের দ্বারা তাঁকে সীমাবদ্ধ করা যায়না। এ-সবটাই দেশীয় চরিত্রের কথা। দেশের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্প্রসারিত হচ্ছে—এটা বর্তমান বিজ্ঞানেরও আবিষ্কার।

বিষ্ণু পুরাণবিষ্ণুর নিম্নলিখিত বর্ণনা দিয়েছে, যেমন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিষ্ণু থেকেই এসেছে। বিষ্ণুর মধ্যেই এই ব্রহ্মাণ্ড স্থিত হয়ে আছে। বিষ্ণুই এর বৃদ্ধি ও ধ্বংসের সঙ্গে যুক্ত। যাঁরা বিজ্ঞান জানেন, এবং নিউট্রন ফিল্ড তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা জানেন যে, দেশের মহাশূন্যতার মধ্য থেকেই জগৎ ফুটে বেরিয়েছিল। সম্প্রসারণশীল দেশের সঙ্গে সঙ্গেই এই জগৎ বেড়ে উঠেছে। ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে জগৎ কথাটা এই জন্যই ব্যবহার করা হয়েছে। জগৎ অর্থও সম্প্রসারণশীল বিশ্ব। গতিময় দেশ যখন Big Crunch-এ কেন্দ্রের দিকে ফিরে যাবে তখন গতিশীল দেশও সঙ্কুচিত হবে এবং ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হবে।

পদ্মপুরাণে বিষ্ণু সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাঁর আদিও নেই অন্তও নেই। অর্থাৎ বিষ্ণু অর্থাৎ দেশের রয়েছে অসীম সম্প্রসারণশীলতা। মহাভারতে বলা হয়েছে যে, বিষ্ণুর স্বর্গ রত্নময় স্থান দ্বারা তৈরি। এই রত্নময় স্থানগুলি হল গ্রহ নক্ষত্রাদি শোভিত ছায়াপথসমূহ।

বলা হয়েছে যে, বিষ্ণুর স্বর্গে স্বচ্ছ গঙ্গার প্রবাহ স্বর্গ থেকে সপ্তঋষির জটায় পতিত হচ্ছে। এখানে গঙ্গানদীর যে কথা বলা হচ্ছে তা হল—ছায়াপথ— পশ্চিম জগতে যাকে বলা হয় Milky Way. সপ্তঋষি হল Great Bear নক্ষত্রমণ্ডলী।

বিষ্ণুকে সাধারণত কৃষ্ণবর্ণের বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিজ্ঞানীর চোখ দিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে, আমাদের আবহাওয়া মণ্ডলীর ওপরে যে দেশ (space) তা বর্ণহীন অর্থাৎ অন্ধকার। তাছাড়া আদিতে মহাশূন্যতারূপী যে দেশ— তাও বর্ণহীন। সেই জন্য বিষ্ণুর বাসস্থান বৈকুণ্ঠ নামে চিহ্নিত হয়েছে। বৈকুণ্ঠ অর্থ যেখানে কোন কুণ্ঠা বা আলোড়ন নেই। বিজ্ঞানে এ ধরনের স্থানকেই বলা হয়েছে singularity. বিষ্ণুর আর এক নাম নারায়ণ। নারায়ণের একটি অর্থ হল- আদি নর, Primordial Man. মহাশূন্যই সেই Primordial Being. ভিন্ন অর্থে বলা হয়েছে নারা (জল, সলিল) যাঁর অয়ন অর্থাৎ বাসস্থান তিনিই নারায়ণ। এ-সব কিছুই দেশজ ব্যাপার। সুতরাং বিষ্ণুকে দেশতত্ত্ব হিসেবে ভাবাতে কোন দ্বিধা থাকার কারণ নেই।

বিষ্ণুর যে অবতার রূপ তার অনেকগুলির উৎসই দেশ। তবে কয়েকটি অবতারকে ঐতিহাসিক পুরুষ হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। বিষ্ণুর একটি

অবতার রূপ দেখা যায় কূর্মের মধ্যে। গল্প আছে যে, তিনি দুগ্ধসমুদ্রে ডুব দিয়ে পৃষ্ঠে মন্দার পর্বত ধারণ করেছিলেন— যে পর্বত দ্বারা সমুদ্র মন্থন করা হয়েছিল। এই যে সমুদ্র— এ সমুদ্রই হল ছায়াপথ বা আমাদের Milky Way. এর চির ঘূর্ণায়মান অবস্থাই মন্থন জাতীয়। তা ছাড়া পার্শ্বদেশ থেকে লক্ষ্য করলে আমাদের ছায়াপথের কেন্দ্রস্থলকে কচ্ছপের পিঠের মত দেখায়। এই অভিজ্ঞতাও বিষ্ণুকে কূর্ম অবতার রূপে দেখাতে সাহায্য করেছে। পর্বতকে এই ছায়াপথের ঘনীভূত কেন্দ্রস্থলও বলা যায়। এই পর্বতকে ভগবান বিষ্ণু ব্যতীত আর কে ধারণ করতে পারবেন? কারণ, এই ছায়াপথ তো দেশের উপর নির্ভর করেই আছে। দেশটাকে সরিয়ে নিলে ত্রিমাত্রিক সৃষ্টিও অন্তর্হিত হয়ে যাবে। সুতরাং দেশই হল সৃষ্টির আশ্রয়।

প্রকাশতত্ত্ব ও গতিতত্ত্ব দেশের মধ্যেই ফুটে উঠেছে— তাই প্রাচীন ভারতীয় ভাস্করেরা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের যে ত্রিমূর্তি খোদাই করেছিল— তাতে ব্রহ্মা ও শিবের মাঝখানে এই কারণেই বিষ্ণুকে স্থাপন করা হয়েছিল।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বর্তমানে সম্প্রসারিত হচ্ছে, ভবিষ্যতেও বহুদিন সম্প্রসারিত হবে। Big Crunch বা প্রলয় কবে হবে তা কেউ জানে না। এই জন্যই বিষ্ণুকে জগৎ রক্ষক অর্থাৎ পালন কর্তা হিসেবে ভাবা হয়েছে। তবে তাঁর এই পালনের ভাব দেশীয় অবস্থা ছাড়া হতে পারে না। সেই জন্য শাক্ততন্ত্র সাহিত্যে এই ধরনের একটি কথা আছে—'কালী রমণী। 'তারা জননী।' এ কথার অর্থ— নিউট্রন ফিল্ড থেকে বিস্ফোরিত হয়ে আদ্যাশক্তি কয়েক লক্ষ বছর ব্যাপী ধারণার অতীত শক্তিতে সম্প্রসারিত হয়েছিল। মহাশূন্যতা বা পুরুষের সঙ্গে তাঁর যোগ সরাসরি। শক্তি ভারতীয় শাক্ত সাহিত্যে শক্তি পুরুষের পত্নী তুল্য। সরাসরি যে শক্তি সেই মহাশূন্যতার সঙ্গে যুক্ত তা হল আদি শক্তি, যাকেই কালের জননী হিসেবে 'কালী বলা হয়। Big Bang-এর আগে সময় ও দেশ দুইই অতি ক্ষুদ্র ভ্রূণের মধ্যে বা Black Hole-এর মধ্যে সঙ্কুচিত হয়ে ছিল। বিস্ফোরণ হলে তবে যেমন দেশের উদ্ভব হয়, তেমনই কালেরও উদ্ভব হয়। এই জন্য কাল ও দেশ বিজ্ঞানে অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত। আদি শক্তি মহাশূন্যতার সঙ্গে এমন ভাবে যুক্ত যেন পতি ও পত্নী। পতি (Lord) থেকে পত্ (বিভক্ত) হয়েছিল বলেই শক্তি মহাশূন্যতার পত্নী হিসেবে বর্ণিত। এই দুইয়ের সম্পর্ক এতই নিকট যেন তাঁরা রমণক্রিয়ায় যুক্ত এমন ভাব। এই জন্যই তন্ত্রে আদি শক্তিকে অর্থাৎ 'কালীকে রমণী বলা হয়েছে। সেই আদি শক্তির পরেই নীলবর্ণের আকাশের উদয়। সেই জন্য দ্বিতীয় পর্যায়ের শক্তিকে নীলবর্ণা তারা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এই হল আকাশগঙ্গা মণ্ডলীয় আকাশ যেখানে জগৎ ধৃত হয়ে আছে। যেন প্রকৃতিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে এই আকাশ জননীর মত বুকে ধারণ করে আছেন। সেই জনাই তারাকে জননী বলা হয়েছে। বিধান মত শাক্ত সাহিত্যে তারাও দেশতত্ত্ব। তাঁর অলংকার অনন্ত নাগ দ্বারা তৈরি। এই অলংকার দ্বারা

আকাশের আবর্তিক সম্প্রসারণকে বোঝায়। ভগবান বিষ্ণুকেও এই জন্য কারণ-সলিলে অর্থাৎ শূন্যতায় অনন্ত নাগশয্যায় দেখা যায়। অর্থাৎ তাঁরও বিকাশ ঘটেছে আবর্তিক ভঙ্গীতে।

বরাহপুরাণে বিষ্ণুকে পালক রূপে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে— আদি দেবতা নারায়ণ মনের মধ্যে বিশ্বসৃষ্টির কল্পনা করে ভাবলেন— সৃষ্টির পর এই বিশ্বকে রক্ষা করতে হবে। এইভাবে চিন্তা করে সেই আদি নর নিজের মানস উপাদান থেকে অযোনিসম্ভব এক রূপ তৈরি করলেন। এই রূপই ভগবান বিষ্ণুর রূপ। তাঁকে সৃষ্টি করে তিনি এই আশীর্বাদ করলেন যে, জগতের সবকিছুই আপনি সৃষ্টি করুন। আপনি ত্রিলোকের রক্ষাকর্তা ও সকলের পূজনীয় হোন।

এই যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের কল্পনা—এই কল্পনা দ্বারা প্রাচীন ঋষিরা প্রকাশতত্ত্ব, গতিতত্ত্ব ও দেশতত্ত্বের কথাই বুঝিয়েছেন। বস্তুজাগতিক সত্তার এঁরাই হলেন তিনটি স্তম্ভস্বরূপ। এই তিন তত্ত্ব ছাড়া জাগতিক সত্য আত্মপ্রকাশ করার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। প্রাচীন ঋষিরা এও বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই তিন তত্ত্ব এত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত যে, তাদের পৃথক করে দেখানো সম্ভব নয়। বিজ্ঞানের সঙ্গে যদি আমরা তুলনা করি তাহলে এই ধরনের সাদৃশ্য খুঁজে পাব, যেমন, স্থির বস্তুসত্তা (Rest Mass) সম্পন্ন একটি ইলেকট্রনকে আমরা প্রকাশতত্ত্ব হিসেবে মনে করতে পারি। অথচ অণুর বৃত্তের মধ্যে এটি অনবরত ঘূর্ণায়মান। অনুরূপ ভাবে গতি তার চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রকাশতত্ত্ব হিসেবে লক্ষ্যণীয় (যেমন ফোটন বা নিউট্রাল পাইয়ন)। গতি তত্ত্ব হওয়া সত্ত্বেও দেশ ছাড়া এ কখনও প্রকাশিত হবে না। দেশেরও সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচনের যে গুণ আছে— তাতে তার মধ্যেও গতির লক্ষণ দর্শণীয়। প্রকাশতত্ত্বের শক্তির সঙ্গে দেশ নিবিড়ভাবে যুক্ত, অর্থাৎ গতি বা কালের সঙ্গে। প্রকাশতত্ত্বের এই গতিকে তাই বিজ্ঞানে Time-space continuam বলা হয়েছে।

সুতরাং প্রকাশতত্ত্ব, গতিতত্ত্ব ও দেশতত্ত্বের মধ্যে কোন একটি তত্ত্ব অপর তত্ত্ব থেকে বড় এরকম ভাবার কোন যুক্তি নেই। সমস্তই হল আদি মানস শক্তির বা আত্মনের প্রকাশ। সুতরাং জগতে সব কিছুই মানস উপাদানে তৈরি। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা এরকমই স্বীকার করছেন, যেমন, বিজ্ঞানী এডিংটন। প্রকাশতত্ত্ব, গতিতত্ত্ব ও দেশতত্ত্বের মধ্যে কোন্‌টি আগে এসেছিল এ প্রশ্ন তোলাও অর্থহীন। এই তিনটি তত্ত্বের প্রত্যেকটিই একে অপরের উপর এমন ভাবে নির্ভরশীল যে, কেউই অপরের সহযোগিতা ছাড়া নিজের ভূমিকা পালন করতে পারবেনা। যখন এই তত্ত্ব তিনটিকে ব্যক্তিরূপ দান করে চিন্তা করা হয়— তখনই প্রত্যেককে পৃথক করে দেখার মানসিকতা জাগে।

ভারতীয় পুরাণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব যিনি যাঁর যাঁর নিজের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ

হলেও বস্তুতপক্ষে তাঁরা সবাই যে সমান, নানাভাবে সে-কথা বলা হয়েছে। কোন কোন পুরাণে শিবকে প্রধান দেবতা হিসেবে দেখানো হয়েছে। বলা হয়েছে, তিনি ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর উপরে। আবার অন্যান্য গ্রন্থে কখনও বিষ্ণু, কখনও ব্রহ্মাকে শিব অপেক্ষা বড় করে দেখানো হয়েছে। তবে যথার্থই যে একজনকে অপর অপেক্ষা বড় করে দেখানো হয়েছে তা নয়। এই গল্পগুলির মূল উদ্দেশ্য এই দেখানো যে, ব্রহ্মানের শক্তি হিসেবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিরাট। তবে একত্রে তাঁরা সবাই সমান এবং পরস্পর নিকট সম্পর্কে যুক্ত। পুরাণ কাহিনীর একটি গল্প দ্বারাই এটা প্রমাণিত হবে :—

একবার বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মীর সঙ্গে শিবপত্নী পার্বতীর তর্ক বাধে। লক্ষ্মী বলেন, তাঁর স্বামী বিষ্ণু শিব অপেক্ষা নানা দিক থেকেই বড়। শিব সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ বিষ্ণুও সেখানে এসে দেখা দিলেন। তিনি এসে শিবের দেহে ঢুকে গেলেন। অর্থাৎ এটাই প্রমাণ করতে চাইলেন যে, তিনি এবং শিব সমান।

স্কন্দপুরাণে একটি গল্পে আছে যে, বিষ্ণু এক সুন্দরী রমণীর মূর্তি ধারণ করেন। শিব মোহিত হয়ে তাঁকে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেন। আলিঙ্গন এতই নিবিড় হয় যে, বিষ্ণু শিবের দেহের সঙ্গে মিলিয়ে যান। এই ঐক্যবদ্ধ রূপকেই ভারতে হরিহর আত্মা রূপে বলা হয়েছে।

ব্রহ্মা যে বিষ্ণুর নাভি থেকে উত্থিত পদ্মে স্থিত ছিলেন এ-কথা বলে পুরাণ-কাহিনী এটাই বোঝাবার চেষ্টা করেছে যে, প্রকাশশক্তি দেশের বুকেই নিজেকে প্রকাশিত করেছিল। ব্রহ্মার স্কন্ধে পঞ্চমুণ্ড গজাবার কাহিনী তৈরি করে তাঁকে পঞ্চানন শিবের সমতুল্য করে দেখাবার চেষ্টা হয়েছিল। অর্থাৎ গতিশক্তি ও প্রকাশশক্তিকে এক করে দেখাবার প্রয়াস চলেছিল।

পুরাণ কাহিনীর অন্তরালে এই যে বৈজ্ঞানিক সত্য, দুঃখের বিষয় এই যে, বহুকাল তা গণমানসের ধারণা থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। এর কারণ, ঋষিরা এই সব বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করার বহু পরে তা লিপিবদ্ধ হয়েছিল— এবং লিপিবদ্ধও হয়েছিল এমন সব রূপক গল্পের আবরণ দিয়ে যে, বহুকাল সেই ভাবে চলতে চলতে গল্পগুলি তাদের সারমর্ম হারিয়ে ফেলে; গল্পের বন্ধন থেকে প্রকৃত সত্য উবে যায়। প্রাণহীন দেহের মত সারহীন গল্পগুলিই শুধু পড়ে থাকে। ফলে দিনের পর দিন সেগুলি আরও বিকৃত হয়। তবে এর পেছনে তখন আর একটি সত্য কাজ করে— মানুষের কল্পনার সত্য। এতে প্রাণহীন দেহই নতুন প্রাণ-স্পন্দনে জেগে উঠে। অন্তরের গভীর বিশ্বাস নিয়ে মনেপ্রাণে যাঁরা পুরাণের রূপক গল্পগুলিকে সত্য বলে ভাবতে থাকেন তাঁদের কাছে দেবদেবীরা রূপ ধরেই যেন সত্য হয়ে উঠেন। এটা হতেও পারে। কারণ, মন নামক বস্তুটি অন্তরের যে অন্তস্তলে বাস করে— সেই গভীর অন্তস্তল আর পরমাত্মা একই জিনিস। ধ্যান যেমন মানুষের মনকে ক্রমশ তলিয়ে দিয়ে গভীরতম প্রদেশে

অন্তরাত্মার সঙ্গে যুক্ত করে দেয় তেমনই ভক্তিযোগও মানুষকে অন্তস্তলিত করে। সেই গভীরতম অন্তস্তলীয় চিন্তা মহামানসের চিন্তার মতই সত্য। জগৎ যদি সত্যই মানস উপাদানে গঠিত হয় (এডিংটনের চিন্তামত) তা হলে সেই মানসসৃষ্ট সৃষ্টিও সত্য হবে না কেন? বৈজ্ঞানিক এডিংটনের মত ভারতীয়রাও জগৎকে মানস উপাদানে সৃষ্ট মনে ক'রে ধারণা করেছিলেন যে, এই জগৎ ভগবান বিষ্ণুর স্বপ্ন মাত্র। যথার্থই এর পেছনে বস্তুসাত্তিকতা বলে কিছু নেই। যাকে বস্তুসত্তা বলে মনে হয়— বস্তু বিশ্লেষণ করতে করতে তার ক্ষুদ্রতম পর্যায়ে গিয়ে দেখা গেছে যে, সত্যিই মূলে কোন বস্তুসত্তা নেই। এবং অব-অণু পর্যায়ে সত্যিই একটা মানসলীলা লক্ষ্য করা যায়— অন্তত কোয়ান্টাম ফিজিক্স আজ সে-কথাই বলছে। সুতরাং জগতের মূলেই যদি থাকে মানস সত্তা, তাহলে ভক্তি আপ্লুত মানসচিন্তাও সত্য হবে না কেন? সেই জন্যই একদা যা গড়ে উঠেছিল রূপক কাহিনী রূপে, পরবর্তীকালে বিশ্বাসীদের বিশ্বাসে সেই রূপক কাহিনী ভক্তজনের চিত্তে সত্য হিসাবে প্রতিভাত হয়ে যথার্থ সত্য হয়ে আছে।

যাই-হোক, যে-কথা বলা হচ্ছিল তাই বলা যাক,— রূপক-কাহিনীর অন্তরালের সত্য কথা। ভারতীয় কামদেবের কথাই ধরা যাক। এখন কামদেব হলেন মদনদেব, যিনি প্রেমিকের চিত্ত মদনাতুর করে তোলেন। তাঁর ফুলশরে তিনি প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয় জর্জরিত করেন। কিন্তু ঋগ্বেদে তিনি ছিলেন শুধুমাত্র ইচ্ছাশক্তির প্রতীক। সেই অদ্বিতীয় একের মনের মধ্যে তিনি উদয় হয়েছিলেন। তিনিই ছিলেন গতির আদি আলোড়ন। পরবর্তীকালে কামদেব যৌন কামনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। আরও পরবর্তীকালে শিব এসে তাঁর স্থান অধিকার করেন। এবং জননেন্দ্রিয় হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করেন। শিব কর্তৃক কামদেবকে ভস্ম করার মধ্যে সম্ভবত এই ঘটনারই একটা ইঙ্গিত রয়েছে, যেমন মহাভারতে খাণ্ডব দাহনের গল্প। মূলত খাণ্ডব দহন ছিল প্রাচীনকালে অরণ্য অপসারিত করে কৃষিভূমি তৈরি করার .গল্প। কিন্তু মহাভারতে সেটি একটি রূপক গল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সত্যি সত্যিই তো অরণ্যের অধিকারকে হরণ করেই নগরজীবন আত্মপ্রকাশ করেছিল। সেই অরণ্যের প্রাণশক্তিই হল ময়দানব, যাকে কাজে লাগিয়ে পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থ নগরী তৈরি করেছিলেন।

তবে শিবলিঙ্গের কথাই যদি ধরা যায়, তাকে বাচ্যার্থে গ্রহণ করলে ভুল হবে। সত্যি সত্যিই এটি কোন যৌন প্রজনন অঙ্গ নয়। এ হল এমনই এক সত্তা যা আদি শক্তিক্ষেত্র (field of energy) আলোড়িত করে তাকে ক্লান্তি বা অবসাদ মুক্ত করেছিল—অর্থাৎ অচঞ্চলকে চঞ্চল করেছিল।

Big Bang-তত্ত্ব ও প্রাচীন সৃষ্টিকথা

গতি যে এক ধরনের শক্তি প্রাচীন মরমিয়া ঋষি থেকে আধুনিক বিজ্ঞানী সবাই এ বিষয়ে একমত। এই গতিশক্তি প্রত্যেক কিছুর মধ্যেই রয়েছে, এমন যে জড় পদার্থ তার মধ্যেও ইলেকট্রনের গতি আবিষ্কার একথাকে আরও স্পষ্ট করে দিয়েছে। অণুর নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে ইলেকট্রন প্রচণ্ড গতিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে— সেকেণ্ডে ছ'শ মাইল। নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরেও যে নিউট্রন ও প্রোটন অলস হয়ে বসে আছে তা নয়। শক্তিপিণ্ডরূপে পরমাণুগুলির ঘূর্ণনই শক্তিকে বস্তুরূপ ধরতে সাহায্য করছে। এই ইলেকট্রনের চরিত্র কখনও বা পরমাণুর মত, কখনও বা ঢেউয়ের প্রবাহের মত। শক্তিপরমাণু হিসেবে তার ঘুর্ণন এত প্রবল যে, তার ঘূর্ণনের বৃত্তকে একটি ঘনীভূত বস্তুসত্তা রূপে দেখা যাচ্ছে, যেমন সিলিং ফ্যানের তিনটি বা দুটি ব্লেড থাকলেও ঘূর্ণনের বেগের জন্য তাকে অপরিচ্ছিন্ন একটি চাক্তির মত দেখা যায়। ব্যাপারটা তেমনই। যাকে জড় ঘনসংবদ্ধ বস্তুসত্তা রূপে দেখা যায়— আসলে এ কিন্তু তা নয়। এই অপরিচ্ছিন্ন ঘনত্বের ফাঁকে ফাঁকেও রয়েছে অকল্পনীয় ব্যবধানের দেশ। আমরা দেখতে পাইনা এই যা। বিজ্ঞানীরা যন্ত্রে এর স্বরূপ ধরেছেন। মরমিয়া ঋষিরা অন্তরের অনুভবে এই সত্যকে জেনেছিলেন। সেই জন্য জগৎ তাঁদের কাছে মায়া বলে প্রতিভাত হয়েছিল। আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানীরা বস্তুসত্তার অন্তরালে কোন বাস্তব উপাদানই খুঁজে পাচ্ছেন না।

আইনস্টাইনের চিন্তাতে ধরা পড়েছে যে, বস্তু, গতি ও শক্তি উৎসে অপরিচ্ছিন্ন এক সত্তার মধ্যে ছিল। ভারতীয় প্রাচীন ঋষিরা একেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের ত্রিমূর্তির মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন। অনুরূপ জ্ঞান প্রাচীন মিশরীয় পুরাণকারদেরও হয়েছিল। সেইজন্য তাঁরা আমোন, হুঃ ও নুন-এর কল্পনা করেছিলেন। তবে মরমিয়ারা যত একাত্মভাবে ব্যাপারটিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, বিজ্ঞানীরা বোধহয় এখনও তা পারেননি। 'গ্র্যাণ্ড ইউনিফাইড' অবস্থার কথা অঙ্কের হিসেবে জানা যাবে স্ট্রং-নিউক্লিয়ার ফোর্স, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স, উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স ও গ্র্যাভিটিকে একত্রে যুক্ত করা গেলে। গ্র্যাভিটি বাদে অন্য তিনটিকে একপাত্রে আনা গেছে। গ্র্যাভিটিকে এর মধ্যে আনা গেলেই প্রাচীন মরমিয়াদের অন্তরানুভূতিতে ধরা সত্যকে বিজ্ঞানেও স্পষ্ট ভাবে বোঝা যাবে। অব-আণবিক পর্যায়ে প্রোটন ও ইলেকট্রন হল সূক্ষ্মশক্তির স্থূলরূপে প্রকাশ। এই শক্তি নির্গত হয়েছিল আদি মানসের চিরন্তন গতি থেকে— যে গতি স্থূল বিশ্বজগতেও পরিদৃশ্যমান—যেমন গ্রহনক্ষত্রাদির গতি।

ত্রিমাত্রিক জগৎ সম্পর্কে প্রাচীন ঋষিদের যেমন ধারণা ছিল, তেমনই এ-ধারণাও ছিল যে, এই ত্রিমাত্রিক জগতের বাইরে এমন এক অবস্থা আছে

যেখানে ঋণাত্মক ও ধনাত্মক অবস্থা, সংকোচন ও বিকোচন অবস্থা, ক্রিয়া ও অক্রিয়ার অবস্থা একত্রে যুক্ত হয়ে ছিল। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে এটাই হল বহুমাত্রিক অবস্থা—multidimensional state. বিজ্ঞান এই সবকিছুকে একটি ক্ষেত্রে মরমিয়াদের মত মেলাতে না পারলেও যেভাবে তার অগ্রগতি হচ্ছে তাতে সৃষ্টি-রহস্যের অপরিচ্ছিন্ন অবস্থা অল্পদিনের মধ্যেই তার তত্ত্বের মধ্যে ধরা পড়বে আশা করা যায়। তখন বিজ্ঞান ও মরমিয়াবাদে কোন ভেদ থাকবে না। প্রাচীন মরমিয়া ঋষিরাও নতুন ভাবে আধুনিক মানুষের কাছে প্রতিভাত হবেন।

ত্রিমাত্রিক মরমিয়া ঋষিদের বহুমাত্রিক জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান হয়েছিল সম্ভবতঃ তাদের উচ্চমাত্রায় উত্তরণের ফলে। সাধারণ মানুষ তাদের নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যে থেকে মরমিয়াদের বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতার কথা বুঝতে পারবেন না। একটি কল্পিত গল্প দ্বারা ব্যাপারটিকে পরিষ্কার করা যেতে পারে।

ধরা যাক কোথাও একটি সমতল ভূমি আছে। সেখানে সমচতুষ্কোণ বিশিষ্ট দেহ নিয়ে দ্বিমাত্রিক জীব হিসেবে আমরা বাস করি। আমাদের প্রত্যেকেরই দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ আছে, কিন্তু বেধ নেই। তাহলে আমাদের ধারণায় দক্ষিণ ও বাম জ্ঞান হবে। অগ্রপশ্চাৎ জ্ঞানও হবে। কিন্তু উর্ধ্ব ও অধঃ সম্পর্কে জ্ঞান হবে না। তবে আমাদের মধ্যে যদি কোন গণিতজ্ঞ থাকেন তাহলে তাঁর কিন্তু অঙ্কের হিসেবে, জ্যামিতি জ্ঞানের হিসেবে উর্ধ্ব ও অধঃ সম্পর্কেও জ্ঞান হবে। কিন্তু আমরা তাঁর কথা বুঝতে পারব না,— কারণ, আমাদের বাস্তব সত্য হল দুই মাত্রার জগৎ। আমরা সমচতুষ্কোণ হবার জন্য পরস্পর মুখোমুখি তাকালে সামনা সামনি উভয়কে দেখতে পাব। চেষ্টা করলে দু'পাশের কিছু অংশও দেখতে পাব, কিন্তু পশ্চাৎভাগ ও আভ্যন্তরিণ ভাগ দেখতে পাব না।

ধরা যাক আমাদের কাছে ত্রিমাত্রিক আপেল জাতীয় কোন জীব এল। আমাদের সমতল দ্বিমাত্রিক গৃহে ঢুকে জিজ্ঞেস করল, 'কি ভাই কেমন আছ? আমি ত্রিমাত্রিক জগৎ থেকে এসেছি।' শুনে আমরা অবাক হব। কারণ, আমাদের ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। তাহলে যিনি কথা বলছেন তিনি সেই ঘরের মধ্যে ঢুকলেন কি করে? উপর সম্পর্কে আমাদের ধারণা না থাকার জন্য বন্ধ ঘরে দরজা বন্ধ থাকার পরেও কেউ কি ভাবে ঢুকল তাই ভাবতে থাকব। সেই ত্রিমাত্রিক জীবের শব্দ, তার ঘরে ঢোকা, সবটাই আমার ভেতর থেকেই ঘটছে এমন মনে হবে। মনে হবে, কিছুটা ভুল শুনছি। মাথাটা বোধহয় একটু খারাপ হয়ে গেছে। জীবটি যদি আপেলের মত গোলগাল হয়, ঘরের মধ্যে হড়কে যায়—তাহলে আমরা তাকে দেখব একটি বিন্দুর মত। ধীরে ধীরে বড় আকারে দেখব। অস্পষ্টভাবে বৃত্তাকার কোন কিছুর টুক্‌রো বলে মনে হবে। মনে হবে শূন্য থেকে সে হঠাৎ এসে পড়েছে।

ত্রিমাত্রিক আপেল জাতীয় জীবটি আমাদের বোকামি দেখে অবাক হবে। সে

হয়তো উড়ে যাবার মত আমাদের নিয়ে উবে যাবে। প্রথম আমরা বুঝতেই পারব না যে কি হচ্ছে। পরে আমরা উপর থেকে আমাদের সমতল ভূমি দেখতে পাব। দেখতে পাব বন্ধ ঘরের মাঝখানটা, মাঝখানে আমাদের আত্মীয় স্বজনকে। এরকম দেখার কারণ, আমরা তখন ত্রিমাত্রিক অবস্থা থেকে দ্বিমাত্রিক অবস্থা দেখতে পাব। দেখতে পাব দ্বিমাত্রিক সমচতুষ্কোণ জীবের অভ্যন্তর ভাগকে, যেমন করে X-Ray দেখতে পায়। যখন আমাদের নামিয়ে দেওয়া হবে,— ঝরা পাতার মত আমরা নিচে পড়ে যাব। যে-সব দ্বিমাত্রিক জীব অর্থাৎ আমাদের আত্মীয় স্বজন নিচে থাকবে— তাঁদের মনে হবেযে, হঠাৎ আমরা শূন্য থেকে পড়ছি। যেমন রহস্যময় ভাবে আমরা জানালা দরজা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও ঘর থেকে উধাও হয়েছিলাম,— তেমনই রহস্যময় ভাবেই ফিরে আসব। যারা দেখবে, তাদের কাছে ব্যাপারটা অলৌকিক বলে বোধ হবে। সম-চতুষ্কোণ জীবের কাছে তারা ঘটনাটি বললে— তারা তাদের মাথা খারাপ হয়েছে বলে মনে করবে। এ-রকম ভাবার কারণ, বহুমাত্রিক অবস্থা সম্পর্কে তাদের ধারণার অভাব। আধুনিক বিজ্ঞান ত্রিমাত্রিক অবস্থার উর্ধ্বমাত্রাও কল্পনা করতে পেরেছে। তাদের অভিজ্ঞতায় বহুমাত্রিক অবস্থা সম্পর্কে যে ধারণা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, মরমিয়া ঋষিদের বক্তব্য বহুমাত্রিক অবস্থা থেকে বলা বক্তব্য। নইলে আধুনিক কোয়ান্টাম পদার্থ বিজ্ঞান বিশ্বের আদি অবস্থা সম্পর্কে যে ধরনের অভিজ্ঞতার কথা বলছে, দেখা যাচ্ছে, মরমিয়াদেরও বিশ্বের আদি অবস্থা সম্পর্কে ঠিক অনুরূপ ধারণা।

এ-ব্যাপারটিকে আরও ভাল ভাবে বুঝতে গেলে সৃষ্টি সম্পর্কে বিজ্ঞান যেভাবে চিন্তা করছে তাই আগে দেখে নেওয়া যাক। বিজ্ঞান সৃষ্টি আরম্ভ করেছে Big Bang থেকে।

কোন কিছু হবার আগে, যখন সময়েরও সৃষ্টি হয়নি, আদ্যাশক্তির কিছুটা অংশের মধ্যে নিজেকে বস্তুরূপে প্রকাশ করার একটা আবেগ জন্মে। আবেগ জাগে বস্তুসত্তর স্বরূপ বোঝার জন্য। সুতরাং সেই আদ্যাশক্তি অবতরিত হয়ে শক্তির সেই অংশকেই ঘনীভূত করে, যা থেকে বস্তুরূপ সত্তা সৃষ্টি হতে পারে। মরমিয়ারা হাজার হাজার বৎসর আগে এমন ভাবেই চিন্তা করেছিলেন। বর্তমানে কোয়ান্টাম ফিজিক্স সেই একই কথা বলছে যখন বিজ্ঞানীরা মনে করছেন যে, দেশ এক ধরনের সূক্ষ্মশক্তি দ্বারা সিক্ত। সেই শক্তিই ঘনীভূত হয়ে বস্তুসাত্তিক জগতের উপাদান সৃষ্টি করেছে। তাঁদের হিসেব হল $M(mass) = E/c^2$ অর্থাৎ বস্তু হল ঘনীভূত শক্তি। তবে এই সত্য, বিজ্ঞানীরা যা যন্ত্র দ্বারা আবিষ্কার করেছেন, মরমিয়া ঋষিরা তা অনুভবের দ্বারাই বুঝতে পেরেছিলেন। বিজ্ঞানের যান্ত্রিক হিসেবে ধরা না পড়লে আধুনিক মানুষ মরমিয়া ধরনের কোন বক্তব্যে বিশ্বাসও করত না। সেই জন্য বিশ্বমানস মাঝে মাঝেই এমন সব ব্যক্তি তৈরি করেন যাঁরা মরমিয়াদের অভিজ্ঞতাকে বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে হাতেনাতে ধরে দেন।

সৃষ্টি যখন আরম্ভ হয়েছিল তখন বিশ্বমানসে এই সত্য গভীর ভাবে প্রোথিত হয়ে ছিল। মানুষের আবির্ভাবের পর মানব মন থেকে এই সত্য বেরিয়ে আসে। মানব মন থেকে এই ধরনের সত্য প্রকাশিত হওয়াকেই বলে মরমিয়াবাদ। তবে কালে কালে এই মরমিয়া সত্য বোঝার ক্ষমতা হারিয়ে যায়। পদার্থবিজ্ঞান পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা সে-কথা আবার প্রমাণ না করলে তা আর উদ্ধার হয় না। এই জন্যই মানুষ মরমিয়া সত্য আবিষ্কারের জন্য নতুন করে আবার চেষ্টা আরম্ভ করেছে। যা আছে, একদা মানুষ আবিষ্কার করেছিল, তাকেই আবার ধাপে ধাপে নতুন করে আবিষ্কার করা হচ্ছে। দেখে অবাক হচ্ছে যে, যা আছে বৃহৎ বিশ্বে, তাই রয়েছে ক্ষুদ্র বিশ্বেও। আধুনিক বিশ্বের একটা ফ্যাশন হল এই যে, বিশ্বমানসকে ব্যক্তিরূপ দিয়ে ঈশ্বর সম্পর্কে যে চিন্তা করা হয়েছিল তাকে অস্বীকার করা। কিন্তু যতই ঈশ্বরকে অস্বীকার করতে চাই না কেন আমাদের অন্তরের গভীর অন্তঃপুরে এই ধরনের একটা বিশ্বাস রয়েই চলেছে যে, আমরা এই বিশ্বে অকস্মাৎ কোন আবির্ভাব নই, আমাদের সৃষ্টির পেছনে সচেতন একটি মানসসত্তা বিদ্যমান।

আধুনিক কালে যে-সব মারণাস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতে যে-কোনদিন আমরা ধ্বংসের মুখোমুখি হতে পারি। সামান্য পাগলামিতে আমাদের অস্তিত্ব মুহূর্তে বিলুপ্ত হতে পারে। রক্ত মাংসের জীবের মানসিকতার মধ্যে একটা সীমাবদ্ধতা আছেই। সেই জন্যই ধ্বংসাত্মক একটা পাগলামিও আমাদের মাথায় চাড়া দিয়ে উঠতে পারেই।

এই যে আবিষ্কার, 'বস্তুসত্তা শক্তি দ্বারাই তৈরি', এই আবিষ্কার মানুষকে সত্যের অনেকটাই কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। আবার ধ্বংসের কিনারে এনেও দাঁড় করিয়েছে। প্রাচীন মরমিয়া ঋষিরা সত্যকে জানার এই বিপজ্জনক দিকটির কথা জানতেন। সেই জন্য সেই সত্যকে তাঁরা গোপন করে রাখতেন। সবাইকে জানাতেন না। সেই জন্য ঐতরেয় আরণ্যকে এই ধরনের একটা বক্তব্য পাওয়া যায় :— 'ব্রহ্মজ্ঞান গুরু একমাত্র সরাসরি শিষ্য ছাড়া আর কাউকেই দিতেন না। তাও পরীক্ষা করে তবে দিতেন। ছান্দোগ্য উপনিষদেও একই ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মজ্ঞান গুরু নিজের জ্যেষ্ঠপুত্র বা উপযুক্ত শিষ্য ছাড়া দিতেন না। সবাইকে এ জ্ঞান দেওয়া যেতনা। এই যে গভীর রহস্যময় গুপ্ত জ্ঞান, যাদের চিত্ত প্রশান্ত হয় নি— তাদের তা দেওয়া যেত না।

এই জন্যই চূড়ান্ত জ্ঞান সম্পর্কিত ব্যক্তব্য, পুরাণের রূপক-গল্পের আবরণে ঢেকে তবে পরিবেশন করা হয়েছে। এই জন্য যিশুখ্রীষ্টের মত আধুনিক ধর্ম প্রচারককেও দেখা যায় যে, তাঁর সত্য অভিজ্ঞতার কথা সরাসরি তিনি কয়েকজন বিশ্বস্ত শিষ্যের কাছে নির্জনে ব্যক্ত করেছিলেন। সাধারণের জন্য তিনি সেই কথাই গল্পচ্ছলে বলতেন— যাকে বলে প্যারাবল্। ভারতবর্ষেও এতদিন

পর্যন্ত এই জন্য এই জ্ঞান গুরুমুখি হয়ে ছিল। ধ্বংস আসন্ন দেখে এখন তা প্রকাশ করার সময় হয়েছে।

তবে এই বিদ্যার পথে সামান্য কিছু অগ্রসর হলেই মানুষের কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা জন্মে। মানুষ তখন সেই ক্ষমতা দেখাতে চেষ্টা করে। এতে তাদেরও পতন হয়, সমাজেরও ক্ষতি হয়। কেউ এ বিদ্যাকে প্রয়োগ করেন তুক্‌তাকের জন্য। অপরের ক্ষতিই করেন বেশি, ভাল করেন কম। কেউ বা প্রতারণার পথে যান—জ্যোতিষীর বা ভবিষ্যৎ বক্তার আসন নেন। কেউবা গুরু সেজে রাজনীতি করেন। এটা জানতেন বলেই প্রাচীন গুরুরা সবাইকে এবিদ্যা দিতেন না। দ্রোণাচার্য এই শক্তিবিদ্যা জানতেন। কিন্তু নিজের পুত্রকে পর্যন্ত তিনি এ বিদ্যা সবটা শেখান নি যা শিখিয়েছিলেন অর্জুনকে। মনকে নিয়ন্ত্রণ যাঁরা করতে পারেন না তাঁদের এ বিদ্যা শেখালে ক্ষতিই হয়। সেই জন্য অধ্যাত্ম বিদ্যা গুরুমুখি বিদ্যা হয়ে ছিল এতদিন। এই শক্তি যোগের মাধ্যমেই সর্বাপেক্ষা বেশি অর্জিত হয়। যোগের পীঠস্থান ভারতবর্ষ,— সেই জন্য যিশুখ্রীষ্ট ১২ বছর থেকে ত্রিশ বছর পর্যন্ত ভারতে যোগ শিক্ষালাভের জন্য ছিলেন বলে অনেকে মনে করেন।

প্রাচীন মানুষের অনেকেই যোগ দ্বারা মানসশক্তির বিরাট বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। সেই জন্য তাঁরা বিশ্বসৃষ্টিরহস্যের অনেক কথাই জানতে পেরেছিলেন—, যে-অভিজ্ঞতার কথা তাঁরা রূপক গল্পের আবরণে রেখে গেছেন। বর্তমানে বিজ্ঞান সেই সত্য আবিষ্কার করে রূপক গল্পগুলির যথার্থ অর্থ বুঝতে পারছে।

বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান প্রচুর প্রমাণ পেয়েছে যে, বর্তমান বিশ্ব ক্রমবর্ধমান। ভারতীয় মরমিয়ারা বহু আগেই এই সত্য জানতে পেরেছিলেন— যে জন্য এই বিশ্বকে তাঁরা বলেছেন— 'জগৎ'- অর্থাৎ যা সম্প্রসারণশীল।

এই যে সম্প্রসারণ—এই সম্প্রসারণ কেন? কোন বিশেষ কেন্দ্র থেকে এ-ভাবে ঠেলে দেওয়া না হলে বিশ্বতো চতুর্দিকে এই ভাবে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারেনা। ছড়িয়ে পড়ার গতিটাও তো কম নয়! সেকেণ্ডে হাজার হাজার মাইল। কারো কারো মতে এই গতি আলোর গতির চারপঞ্চমাংশ। কখনও হয়তো এমন সময় আসবে যে, এই গতি আরো বেড়ে গিয়ে আলোর গতি পেয়ে যাবে। এবং প্রান্তভাগ থেকে বিশ্ব হারিয়ে যেতে আরম্ভ করবে।

বিশ্বের যে-কেন্দ্র থেকে এই গতি সঞ্চারিত হয়েছিল সেই কেন্দ্রের স্বরূপ কি? বিজ্ঞানীরা চিন্তা করেছেন যে, আদি বিশ্বের সকল বস্তুসত্তা বিশেষ এক কেন্দ্রে অপরিচ্ছিন্ন ভাবে ঘনীভূত হয়ে ছিল। তাকেই এঁরা বলেছেন আদি অণু। আদি অণুর ঘনীকরণের চাপ এত প্রবল ছিল যে, এই চাপ সহ্য করতে না পেরে এটা ফেটে যায়। অর্থাৎ Big Bang হয়। ভেতরে যে শক্তি ঘনীভূত হয়ে ছিল তা বেরিয়ে পড়ে। এই শক্তি পিণ্ডাকারে পরমাণু হয়ে দেশে ছড়িয়ে

পড়ে। তারা আবার পরস্পর যুক্ত হয়ে ছায়াপথ, নক্ষত্র, গ্রহ ইত্যাদি সৃষ্টি করে।

এই তত্ত্বের উদ্ভাবক ছিলেন লেমাইতর (A. G. E. Lemaitre)। প্রথম দিকে তাঁর এই তত্ত্ব তেমন স্বীকৃতি পায়নি। একটি অণুর মধ্যে এই বিরাট বিশ্বের সকল পদার্থ ঘনীভূত হয়ে থাকতে পারে একথা বিশ্বাস্য বলে মনে হয়নি। না হবার কারণ, তখনও বস্তুর যথার্থ সত্তা (ঘন, তরল ও গ্যাসীয়) আবিষ্কৃত হয়নি। কিন্তু পরে দেশে Black Hole আবিষ্কৃত হবার পর এবং অণুর গঠন প্রণালী সম্পর্কে জ্ঞান হবার পর Big Bang তত্ত্ব সম্পর্কে লোকের অবিশ্বাস দূর হতে থাকে। বর্তমানে জগতের উৎপত্তি সম্পর্কে Big Bang তত্ত্ব স্বীকৃত।

একটি অণুর মধ্যে রয়েছে কেন্দ্রস্থ শক্তিকণা (particle) প্রোটন ও নিউট্রন। এবং চতুর্দিকে প্রবল বেগে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রন। প্রত্যেকটি পদার্থেরই অন্তস্তলে রয়েছে এই শক্তি বা তেজকণা। তারাই তাদের গতি দ্বারা পদার্থরূপ ধরে আছে। আসলে ঘন পদার্থ বলে যাকে মনে হচ্ছে তা মোটেই ঘন নয়। ঘন অবস্থায় দেখাটা এক ধরনের ভ্রান্তি দর্শন। দ্রুত ঘূর্ণায়মান পাখার ডানাকে যেমন কঠিন একটি চাক্তির মত দেখায় (যা আসলে পরস্পর যুক্ত একটি কঠিন সত্তা নয়) ঠিক তেমনই দেখার মত এই দেখা। বর্তমানে জানা গেছে যে, আমাদের সূর্যও তেজ-কণা দিয়ে তৈরি। তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ফলেই তাপ নির্গত হয়।

আদি-অণুও তেজ-কণা দিয়েই তৈরি ছিল। প্রচণ্ড চাপযুক্ত হয়ে ঘন হয়ে ছিল। এই ঘনসংবদ্ধ অণুর মধ্যে চলছিল আণবিক প্রতিক্রিয়া।

তবে অণুর গঠনশৈলী জানা গেলেই যে, দেশস্থ অকল্পনীয় পদার্থিক সত্তাগুলির একটি আদি অণুর মধ্যে বিধৃত হয়ে থাকার রহস্য জানা যাবে তা নয়। এই রহস্য জানতে গেলে পদার্থ বিজ্ঞানে যে 'Black Hole' তত্ত্ব দাঁড় করানো হয়েছে তার কথা বুঝতে হবে।

বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে, দেশস্থ নক্ষত্রগুলির নানা ভাবে মৃত্যু হয়। কোনগুলো অস্তিত্ব হারায় বিস্ফোরিত হয়ে, কোনটা মরে যায় ঠাণ্ডা হয়ে, কোনটা ভেতরের দিকে ডুবে গিয়ে। নিজের ভেতরের দিকে ডুবে গিয়ে যে-সব নক্ষত্র মরে যায়— সেগুলোই Black Hole-এ পরিণত হয়। নক্ষত্রটি ভেতরের দিকে ডুবে যাবার সময় তার অণুপরমাণুগুলিও ভেতরের দিকে ডুবতে থাকে। প্রথম ভেতরের দিকে ডুবতে থাকে ধীরে ধীরে, তারপর দ্রুত তালে। যতই এ-সব ভেতরের দিকে ডুবতে থাকে ততই অণুপরমাণুগুলি পরস্পর নিবিড়তর আলিঙ্গনে একদেহভূত হতে থাকে। যতই এর ঘনত্ব বাড়তে থাকে ততই বাড়তে থাকে কেন্দ্রস্থ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। যতই নক্ষত্রের অণুপরমাণুগুলি ভেতরে ঢুকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বাহুর মধ্যে গিয়ে পড়তে থাকে ততই তার ফোটনরূপী আলো-কণিকাগুলিরও বেরিয়ে আসার ক্ষমতা কমে যায়। এরকম ঘটলেই নক্ষত্রগুলি বাইরে থেকে দৃষ্ট হবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং শেষ পর্যন্ত

অন্ধকার গহ্বর বা Black Hole-এ পরিণত হয়। বাইরে থেকে তাদের আর দেখা যায় না।

বিরাট নক্ষত্রগুলির অস্তিত্ব যদি এই ভাবে একটি মাত্র কৃষ্ণ গহ্বরের মধ্যে হারিয়ে যেতে পারে, তাহলে সমগ্র বিশ্বই বা এক সময় আদি পরমাণুভূত হয়ে থাকতে পারবে না কেন?

কিছু কিছু জ্যোতির্বিদ এই ধরনের সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, দেশে অনিঃশেষ ভাবে এই প্রকার বিস্ফোরণ ও অন্তস্তলিত হওয়া চলছে। এই তত্ত্ব অনুসারে আদি বিস্ফোরণ থেকে বর্তমান বিশ্বের উদয় হয়েছিল। সেই বিস্ফোরণজাত বেগের ঠেলাতে আজও এই জগৎ সম্প্রসারণশীল। কিন্তু এমন এক সময় আসবে যখন এই গতি দুর্বল হয়ে পড়ে বিশ্বের সম্প্রসারণশীলতা থেমে যাবে। সম্প্রসারিত বিশ্ব তখন গতি হারিয়ে উল্টো টানে কেন্দ্রের দিকে ফিরতে আরম্ভ করবে। ছায়াপথ, নক্ষত্র, গ্রহাদি সব বিপুল বেগে সেই বিস্ফোরণ-কেন্দ্রের মাধ্যাকর্ষীয় টানে ফিরে যেতে শুরু করবে। ফিরতে ফিরতে পরস্পর যুক্ত হতে হতে শেষ পর্যন্ত সেই আদি বিন্দুতে গিয়ে অপরিচ্ছিন্ন আদি অণুতে পরিণত হবে। ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে এরা এত ঘন হবে যে, আর চাপ সহ্য করতে না পেরে পুনরায় বিস্ফোরিত হবে। একেই বর্তমান বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় Big Bang ও Big Crunch.

এই Big Bang ও Big Crunch-এর বাইরেও একটি তত্ত্ব আছে—একে বলে 'Steady State'. এই Steady State তত্ত্ব অনুসারে বিশ্ব সম্প্রসারিতও হয়না সংকুচিতও হয়না। চিরকালই একই থাকে। সম্প্রসারিত হয় নিশ্চয়ই— তবে কোথাও কোন ছায়াপথ ডুবে গেলে তার জায়গায় আর একটা ছায়াপথ ফুটে উঠে। কাজেই বিশ্বকে একই রকম দেখায়। একেবারে কখনও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না। তবে এই Steady State Theory-এর নানা সীমাবদ্ধতা থাকার জন্য তেমন বিজ্ঞানীপ্রিয় হতে পারেনি। কারণ, নতুন ছায়াপথ তৈরি হবার উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়নি। যেখান থেকে এই নতুন পদার্থিক সত্তা আসতে পারে তারও তেমন সন্ধান পাওয়া যায়নি। আবার একটি ছায়াপথ অপর একটি ছায়াপথ থেকে কেন দূরে সরে যাচ্ছে তারও তেমন কারণ তাঁরা দেখাতে পারেননি। নক্ষত্র জাতীয় কোয়াসার-এর আবিষ্কার ও অন্যান্য দেশীয় ঘটনাবলি বরং Big Bang তত্ত্বের পক্ষেই বেশি কথা বলছে। আমেরিকান পদার্থবিদ জর্জ গ্যামো ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে তাঁর থিসিসে দেখান যে, Big Bang-এর পরে যে জ্যোতি বিকিরিত হয়েছিল— এখন ধীরে ধীরে তা কমে এসে বিশ্বের চতুর্দিকে সমভাবে রেডিও তরঙ্গরূপে বিরাজ করছে। ১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকার নিউজার্সির বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরিতে বিশ্বের চতুর্দিকে এই রেডিও তরঙ্গের অস্তিত্ব যে সমভাবে ছড়িয়ে আছে তা ধরে পড়ে। ফলে Big Bang তত্ত্ব প্রমাণিত হয়।

বিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে এই Big Bang তত্ত্বের ভিত্তিতে এবার প্রাচীন মরমিয়া ঋষিদের বিশ্বসৃষ্টিজ্ঞান সম্পর্কে জানা যাক।

মিশরের পুরাণ কাহিনীতে বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে চারটি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের গল্প থাকলেও—তাদের মূল বক্তব্য একই। অর্থাৎ বিশ্ব তৈরি হয়েছিল আদি এক বিশ্বডিম্ব থেকে। বিশ্বের সকল দেশেই প্রাচীন কালে এমন ধরনের তত্ত্ব ছিল। তাঁদের সবারই বক্তব্য বিশ্বডিম্ব ভেঙে মহাশূন্যতার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হয়েছিল। মিশরীয়রা এই ডিম্বের জন্য স্বর্গীয় একটি হংসের কল্পনা করেছিলেন—যার নাম আমোন। এই আমোনই ডিম্বটাকে ভেঙে মহাশূন্যতার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করেছিলেন। আর একটি বক্তব্যে মহাশূন্যতার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করেছিল ইবিস বা পদ্ম। এই পদ্মকে এখন আদি-অণু বা নিউট্রন ফিল্ড-এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। পদ্মের দলের মত নিউট্রনের আবর্তিক ভঙ্গী দেখেই এরকম কল্পনা করা হয়েছে। ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীতে এই জন্যই নানা দেবদেবীকে পদ্মে আসীন দেখতে পাওয়া যায়।

হিন্দু পুরাণকাহিনীতে দেখা যায় Big Bang-তত্ত্বকে রূপক কাহিনীর আকারে ব্যক্ত করা হয়েছে। আদি সলিলে এটা ভাসমান ছিল। বিস্ফোরিত হবার পূর্বে শতবর্ষব্যাপী এটা এই অবস্থাতেই ছিল। এই ডিম্ব বিস্ফোরিত হয়েই পুরুষ আত্মপ্রকাশ করেন।

হিন্দু শাস্ত্রে যাকে আদি-সলিল বলা হয়েছে তাকে আদি মানস শক্তি হিসেবে ধরে নিতে হবে। পরবর্তীকালে এই আদি মানস স্থূলরূপে আত্মপ্রকাশ করে। সেই আদি ডিম্ব ছিল তেজপূর্ণ। এই ডিম্ব ভাঙতে যে শতবৎসর সময় লেগেছিল—সেই শতবর্ষকে আমাদের পৃথিবীর শতবর্ষ বলে ধরলে ভুল করা হবে। এ হল স্বর্গীয় শতবৎসর। হিন্দু ধারণা মত— ব্রহ্মার এক দিন ও এক রাত্রি হল ৮৬৪০ মিলিয়ন মানব বৎসর। আমাদের ৩৬৫ দিনের বৎসরে সেখানে দিনের সংখ্যা হয়— ৩,১১০,৪০০ মিলিয়ন পার্থিব দিন। সুতরাং ব্রহ্মার বছরের ১০০ বছর হল পার্থিব বৎসরের ৩১১,০৪০,০০০ মিলিয়ন বৎসর।

ঋগ্বেদে এই ধরনের একটি সূক্ত আছে ঃ 'আদিতে শুধুমাত্র সেই 'এক' ছিল। অন্ধকার তরঙ্গের মধ্যে ডিমের বন্ধনে সে আটকে ছিল। তা থেকে তপস্যা বলে কামরূপে বা মন রূপে সেই 'এক' দেখা দিলেন।' এখানে অন্ধকার তরঙ্গরূপে যে-কথা বলা হয়েছে তা Black Hole-এর অন্তস্থ বিশৃঙ্খলার মত।

শতপথ ব্রাহ্মণে এই ধরনের একটি বক্তব্য আছে ঃ— পুরুষ প্রজাপতি সলিল তৈরি ক'রে তাতে ডিম্ব-আকারে প্রবেশ করলেন তা থেকে জন্ম নেবার জন্য এবং সেই ডিম্ব থেকে ব্রহ্মান রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে ঃ— আদিতে কিছুই ছিল না। সেই অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব হল, বৃদ্ধি পেল। একটি ডিম্ব জন্ম নিল। এক বছর এই ডিম্ব ডিম্বাকারে থাকল। এরপর ডিম্ব ভেঙে গেল।

এই যে উপরি উক্ত বক্তব্য, একে একটু বিশ্লেষণ করে দেখলেই সব স্পষ্ট

হবে। এই বক্তব্যের আবরণের মধ্যে কি সত্য নিহিত রয়েছে তা জানা যাবে। মরমিয়ারা যা জেনেছিলেন— সহজ সরল ভাবে তা কখনই ব্যক্ত করেন নি। কারণ, উপযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া সবার কাছেই তাঁরা এই বক্তব্য প্রকাশ করতে চাননি,— যেমন আণবিক অস্ত্রতত্ত্ব বহু দেশ আজও সবার কাছে প্রকাশ করতে চাননা, কারণ, মানসিক ভাবে যাঁরা প্রস্তুত নন— তাঁরা এই ভয়ানক শক্তিকে যথেচ্ছ ব্যবহার করে যে-কোন সময় পৃথিবীর বিপদ ডেকে আনতে পারেন।

আণবিক জগতের এই শক্তিকে প্রকাশ করতে হলে আধুনিক জগতে টেক্‌নোলজি প্রয়োজন। কিন্তু প্রাচীন কালে শুধু আত্মশক্তিবলেই এই শক্তিকে ব্যবহার করা যেত, যে-কারণে এই জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান সবাইকে দেওয়া হত না। মনের শক্তি কতদূর আধুনিক কালেও তার কিছু প্রমাণ বৈজ্ঞানিক ভাবে যাঁরা আত্মশক্তিচর্চায় নিযুক্ত রয়েছেন তাঁরা জানতে পেরেছেন। প্রাক্তন সোভিয়েৎ ইউনিয়নের বিজ্ঞানীরা মিসাইল জাতীয় অস্ত্রকে নির্ভুল লক্ষ্যে পাঠানোর জন্য এই চর্চা শুরু করেছিলেন। তা জানতে পেরে আমেরিকাও এই চর্চা শুরু করে। এ থেকেই পশ্চিম জগতে প্যারাসাইকোলজি বা অধিমনোবিজ্ঞান চর্চায় এত উন্নতি হয়েছে। সুতরাং মানসশক্তির উদ্বোধনও যে শক্তি অর্জনের একটি পথ, আধুনিক বিজ্ঞানজগৎও তা জানতে পেরেছে। এই জন্য আত্মশক্তি উদ্বোধনের বহু গোপন কথা তারাও আড়ালে রাখতে চায়। সবাইকে এই জ্ঞান দিতে চায় না। সুতরাং প্রাচীন কালে ঋষিরা ব্রহ্মবিদ্যালাভ করে যে-শক্তি অর্জন করতেন— সেই ব্রহ্মজ্ঞানকে সর্বদাই আড়াল করে রাখার চেষ্টা করতেন। ব্রহ্মবিদ্যার সেই জ্ঞানের কথা তাঁরা রূপক গল্পের আকারে রেখে যেতেন। আধুনিক কালে 'কোড ল্যাঙ্গুয়েজে' যেমন বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতাগুলিকে ধরে রাখা হয় ব্যাপারটা তেমনই। বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও এই বিজ্ঞানের কথা সবার কাছে জ্ঞাত নয়—একমাত্র এ-ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ ছাড়া। কারণ, বিজ্ঞানের বক্তব্য যেমন বিশেষ 'কোড-ল্যাঙ্গুয়েজে' বেঁধে রাখা হয়েছে, প্রাচীনদের পৌরাণিক কাহিনীগুলোও ছিল ঠিক তেমনই। সেই পুরাণকাহিনীরূপ বিশেষ ভাষা জানা না থাকলে যেমন গল্পগুলি অর্থহীন মনে হয়, আধুনিক বিজ্ঞানের 'কোড-ল্যাঙ্গুয়েজ'ও তেমনই সাধারণ মানুষের কাছে অর্থহীন। ভারতীয় ভাস্কর্য যেমন এক ধরনের বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম, পুরাণ-কাহিনীও তেমনই প্রাচীন জগতের মরমিয়া ঋষিদের বক্তব্যের মাধ্যম। যথার্থ জ্ঞান হলে তবেই এই হেঁয়ালীগুলির জট খোলে।

বিজ্ঞান আজ স্পষ্টই স্বীকার করেছে যে, বস্তুসত্তার উৎসে কোন বস্তুসাত্তিক উপাদানই ছিল না। মহাশূন্যতা থেকে অজ্ঞাত কারণে বস্তুসাত্তিক জগৎ ফুটে উঠেছে। কিন্তু সে-কথা ক'জন জানেন? যা কিছু আমরা কঠিন পদার্থ রূপে দেখি তা আসলে মুলে কঠিন নয়, এক ধরনের ভ্রান্তি বশতঃ এই দর্শন, এমন কথা আজও সাধারণ বিজ্ঞানচেতন মানুষও বিশ্বাস করবেনা— এবং শঙ্করের

মত এ ধরনের বক্তব্যে একটা মায়াবাদের গন্ধ পেয়ে একে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। অথচ কোয়ান্টাম পদার্থ বিজ্ঞান এ ধরনের চিন্তা যে সত্য অব-আণবিক পর্যায়ে বিশ্লেষণ করে তা দেখিয়ে দিয়েছে। এবং অব-অণু পর্যায়ে পরমাণুগুলির ব্যবহার লক্ষ্য করে এই বিশ্বাসে এসেছে যে, একটা মানসসত্তা সৃষ্টির অন্তরালে কাজ করেছে। ঠিক এই ধরনের বিশ্বাসই প্রাচীন রূপক বক্তব্যের আড়ালে রয়ে গেছে। না বুঝে তাকে অস্বীকার করা জ্ঞানের নামে আর এক ধরনের বড় অজ্ঞানতা। $E=mc^2$ ইকুয়েশন দিয়ে আইনস্টাইন যে বক্তব্য রেখে গেছেন— আজও পৃথিবীর ৯৯% মানুষ তা বোঝেনা। অথচ বস্তুর অন্তর্নিহিত শক্তিকে ব্যবহার করে পৃথিবীতে আজ আণবিক শক্তি অপরিসীম কল্যাণ ও অপরিসীম বিপর্যয়ের দুয়ার খুলে দিয়েছে। কঠিন বস্তুসত্তা যে ঘনীভূত শক্তিমাত্র এ বিশ্বাস সাধারণ মানুষের বিচারবুদ্ধিতে কিছুতেই ধরা দিতে চায়না।

সুতরাং সাধারণ বিশ্বাসকে তোয়াক্কা না করে আধুনিক বিজ্ঞানের আলোতে প্রাচীন মরমিয়া বক্তব্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ধরার চেষ্টা করা যাক। ঋগ্বেদে 'সেই এক ' বলে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে— তার অর্থ, বর্তমানে যে বহু বিচিত্র বিশ্ব দেখা যায় আদিতে তার উৎস ছিল 'অপরিচ্ছিন্ন এক'। সেই 'এক' কোন ব্যক্তিরূপ 'এক' নন। এ হল এক ধরনের শক্তি। তরঙ্গায়িত অন্ধকার বলতে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা এক ধরনের শক্তিবিকিরণ মাত্র। ছান্দোগ্য উপনিষদে যে ডিম্বের কথা বলা হয়েছে তা আধুনিক বিজ্ঞানের ধারণার 'আদি অণু' মাত্র। বলা হয়েছে, সেই ডিম্ব ভেঙে গেল। আধুনিক বিজ্ঞানে আদি অণুতে অন্তস্তলিত হবার ফলে যে চাপ সৃষ্টি হয় তাতে তা বিস্ফোরিত হয়েছিল বলে বলা হয়েছে। ডিম ভাঙা কথাটা দ্বারা ঠিক সেই জিনিষটিই বোঝায়। ডিম ভেঙে যা বেরিয়েছিল তাই অণুর অন্তস্থশক্তি—যাকে ব্রহ্মন বলা যেতে পারে। এই শক্তিই সকল পদার্থিক সত্তার অন্তস্থ সত্য ।

ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে যে, এই ব্রহ্মাণ্ড আদিতে অনস্তিত্ব ছিল। সেই অনস্তিত্ব থেকেই অস্তিত্ব প্রকাশিত হয়েছে। হিন্দু মরমিয়া ঋষিরা আদি ডিম্ব বলতে যা বুঝিয়েছিলেন তা হল ঘনীভূত শক্তিপিণ্ড মাত্র। সেই শক্তিপিণ্ড বিস্ফোরিত হয়েই জগৎ সৃষ্টি হয়েছিল। এই ডিম্ব আমরা ওমলেট করে যে ডিমকে খাই সে ধরনের কেনা ডিম্ব নয়।

ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে আর এক ধাপ অগ্রসর হয়ে ভারতীয়েরা পাশ্চাত্যের Pulsating Universe Theory-র কাছা কাছি এসেছিলেন। এই তত্ত্বের জনক ইংল্যাণ্ডের W. B. Bonnor মনে করেন যে, এই বিশ্ব অনিঃশেষ ভাবে সংকোচন ও বিকোচনের মধ্য দিয়ে চলেছে। আদি অণুতে বিস্ফোরণের ফলে বিশ্ব সম্প্রসারিত হয়, যেমন বর্তমানে হচ্ছে। আবার একটি সময় আসবে যখন বিস্ফোরণের বেগ বন্ধ হয়ে যাবে। যে কেন্দ্র থেকে এই বিশ্ব বিস্ফোরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল, বেগ কমে গেলে কেন্দ্রের অভিকর্ষে আবার সেই দিকেই

ফিরতে আরম্ভ করবে। ছায়াপথ, নক্ষত্র, গ্রহাদি কেন্দ্রের দিকে ফিরতে আরম্ভ করবে। আবার কেন্দ্রস্থ হয়ে আদি-অণু গঠন করবে। আবার হাজার হাজার কোটি বৎসর পরে সেই অণু বিস্ফোরিত হবে। এই ঘটনাটিকেই হিন্দু পুরাণ-কারেরা ব্রহ্মার সাময়িক নিদ্রা ও জাগরণের সঙ্গে তুলনা করছেন। পুরাণ মতে সৃষ্টির পর ব্রহ্মার দিনের হিসেবে একশ বছর এই সৃষ্টি টিকে ছিল। তারপর প্রলয়ে তা ধ্বংস হয়ে যায়। ব্রহ্মার একশ বছর পার্থিব বছরের হিসেবে কতদিন হয় পূর্বেই তার হিসেব দিয়েছি।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এই জন্যই বলা হয়েছে 'ঈশ্বর বহুবার দেশে জগৎ সৃষ্টি করে আবার তাকে নিজের মধ্যে টেনে নিয়েছেন। টেনে নিয়েছেন নতুন করে সৃষ্টি করবেন বলে।' শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে যে-কথা বলা হয়েছে তা আধুনিক বিজ্ঞানের Big Bandg ও Big Crunch-এর কথা। এই হল ব্রহ্মার সাময়িক সৃষ্টি ও সাময়িক লয়। প্রাচীন গ্রীসে হেরাক্লিটাসও অনুরূপ কল্পনা করেছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, 'অগ্নি থেকেই সব কিছুর আবির্ভাব ঘটেছিল, আবার অগ্নিতেই সব কিছু ফিরে যাবে।'

মৈত্রায়ণ উপনিষদে এই সুরেরই প্রতিধ্বনি করে বলা হয়েছে যে, 'বিশ্ব লয় পেলে একমাত্র তিনিই জাগ্রত থাকেন। আবার তিনিই দেশের গভীর থেকে জীবনস্পন্দনে আত্মাকে জাগরিত করেন।'

বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে এই যে চিন্তা, তা যে শুধু প্রাচীন মিশর ও প্রাচীন ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। প্রাচীন পৃথিবীর প্রায় সকল লোকের মধ্যেই এ ধরনের চিন্তা ছিল। প্রত্যেকটি প্রাচীন সংস্কৃতিতেই দেখা যায়— বিশ্বসৃষ্টির মূলে দেবদেবীর যৌন সঙ্গম বা বিশ্বডিম্ব বিস্ফোরণের কথা বলা হয়েছে। আদি উৎসে হয় কোন নররূপ কল্পনা করা হয়েছে, নয়তো কোন পশুরূপ।

প্রশান্ত মহাসাগরিয় অঞ্চলের মধ্য অস্ট্রেলিয়ার অরণ্ড উপজাতি তাদের পুরাণ কাহিনীতে বিশ্বের আদি অবস্থা সম্পর্কে এই ভাবে চিন্তা করেছিল ঃ— 'আদিতে সব কিছুই চিরন্তন অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। অন্ধকার রাত্রি যেন দুর্ভেদ্য ঘন ঝোপের মত সব কিছুকে চেপে বসে ছিল।' এই যে অন্ধকাব, এই অন্ধকারকেই হয়তো বেদে তরঙ্গায়িত অন্ধকার বলা হয়েছে। হয় তো দেশে (space) তেজ-তরঙ্গ স্রোতের যে পর্যায় কল্পনা করা হয়েছে এই অন্ধকার বলতে সেই তেজ-তরঙ্গ পর্যায়ের কথাই বলা হয়েছে', কিম্বা ব্ল্যাক হোলের অভ্যন্তরস্থ অন্ধকার-এর কথা। দেশের নির্ভেজাল তেজ পর্যায়ও দৃশ্য নয়। আমরা কোন কিছু দেখি, কারণ, সেই কোন-কিছুর উপর আলো পড়ে তা বিচ্ছুরিত হয়ে আমাদের চোখের মণিকে স্পর্শ করে এবং মস্তিষ্কস্নায়ুতে তার ছবি ফেলে। কিন্তু কোন কিছু যদি আলোর গতি অপেক্ষা বেশি গতিতে চলে কিংবা আলোর গতিতে চলে, তাহলে আলো তার উপর পড়ে ঠিকরে আমাদের চোখের মণিতে আঘাত করে মস্তিষ্ক-স্নায়ুতে ছবি তৈরি করতে পারবেনা। সুতরাং এমন কিছুকে আমরা দেখতে পাব না। দেশস্থ এই যে তেজতরঙ্গ একেই অনেকে মানস শক্তি

বলে মনে করেছেন। মনের বাহক-তরঙ্গও কিছুটা দানাজাতীয় হতে পারে, যদিও তা অব-অণু পরমাণুর ফিল্ডের মত নয়। যদি তা হয় তাহলে আধুনিক বিজ্ঞানের False Vacuum জাতীয় জিনিষ হতে পারে— যাকেই বলা হয়েছে তরঙ্গিত শক্তি।

অরভদের উপরোক্ত 'অন্ধকার' চিন্তার সঙ্গে ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তের অন্ধকার চিন্তার দারুণ মিল রয়েছে। নাসদীয় সূক্তে বলা হয়েছে— 'তখন অন্ধকার ছিল ঘন তমিস্রায় আচ্ছন্ন।'

প্রাচীন মিশরীয় চিন্তাতেও চমৎকার ভাবে এই অন্ধকারের চিন্তা ছিল। আদি শক্তি, যাকে মিশরীয়রা বলত 'নুন্' দেশে (হুঃ) তার উপস্থিতি সত্ত্বেও এই সময় সমগ্র বিশ্ব ছিল এক ধরনের অস্থিরতার মধ্যে। সেই জন্য সেখানে কোন আলো ছিল না। এই অস্থিরতাকেই বলে অন্ধকার তরঙ্গ—যা অদৃশ্য। যখন গতি বা আমোন-দেবতা এই স্তব্ধ অন্ধকারকে আলোড়িত করেন, অর্থাৎ নুন্‌কে, (ভারতের কারণ সলিল তুল্য) তখন আলো ফুটে বেরয়।

আমেরিকার আদি অধিবাসী কুইচি মায়ারা তাদের পুরাণকাহিনী— 'পোপোল বুহ্'-তে সৃষ্টির আদি অবস্থা সম্পর্কে এই ভাবে চিন্তা করেছিল :— 'সব কিছুই স্তব্ধ হয়ে ছিল। সব কিছুই ছিল শান্ত, নীরব, গতিহীন। স্থির আকাশের কোন বিস্তার ছিল না।'

এই যে আদি অবস্থা, এই আদি অবস্থা ভারতীয় দর্শনের পরব্রহ্মান জাতীয় অবস্থা, আধুনিক বিজ্ঞানে যাকে বলা হচ্ছে Super-Void. এই Super-Void-এর মধ্যেই হয়তো কোন Psychic Mind Field স্তব্ধ হয়ে ছিল। আদি অণু বিস্ফোরণের পূর্বে মহাশূন্যতায় 'দেশ' বলতে যা বোঝায় তা ছিলনা। সময়ও ছিল না। গতিই ছিল রুদ্ধ হয়ে। সুতরাং সব কিছুই ছিল স্তব্ধ, শান্ত, স্থির। এই উচ্চাঙ্গ কল্পনা প্রাচীন আমেরিকানদের মধ্যে আসা অসম্ভব ছিলনা— কারণ, ইদানিং প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, বিজ্ঞান-চিন্তাতেও ছিল তারা অত্যান্ত উন্নত। যখন ইউরোপ পৃথিবীর আকৃতি নিয়ে স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি, তখনই মায়া-জাতি জানত যে, পৃথিবী গোলাকার এবং ৩৬৫.২৪২ দিনে সূর্যকে পরিক্রমা করে।

আরবরা যখন ভারত থেকে শূন্য-এর চিন্তা ইউরোপে নিয়ে পৌঁছে দেয়, তার আগেই মায়া-সভ্যতায় এই শূন্য চিন্তা দেখা দিয়েছিল। মায়া-পুরোহিতেরা জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত ও ধর্মতত্ত্বে প্রাচীন কালেই যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার জন্য তাঁরা বড় বড় অব্‌জারবেটরি তৈরি করেছিলেন। মায়া সভ্যতায় যে পিরামিডের সন্ধান পাওয়া যায়, মিশরের মত সেগুলি সমাধি-সৌধ হিসেবে নির্মিত হয়নি। বিশ্বমানস সত্তার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করাই ছিল এর লক্ষ্য। মিশরের পিরামিডগুলি পরীক্ষা করে ইদানিং দেখা গেছে যে, সেগুলি মহাবিশ্ব তরঙ্গ (Cosmic Ray) ধরতে পারে। সৃষ্টির

আদিতে এখন যাকে বলা হয় Psychic Mind Field-, মায়া সভ্যতায় সেই Psychic Mind Field-এর ধারণা ছিল।

এ-ধরনের চিন্তা এখনও বহু আধুনিক মানুষের ক্ষেত্রে কুসংস্কার বলে মনে হতে পারে—কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান তা মনে করেনা। প্রাচীন পৃথিবীর যে জ্যোতিষবিদ্যা—অনেকে তার প্রতি নাক ছিট্‌কায়। গ্রহনক্ষত্রের প্রভাব মানুষের উপর পড়ে,এতে তারা বিশ্বাস করেন না। বিশ ত্রিশ বছর আগে আধুনিক বিজ্ঞানও এ ব্যাপারে ওয়াকিবহাল ছিলনা। মনে করা হোত, গ্রহাদি হল ঠাণ্ডা ও মৃত। তাদের শুধু মাত্র মাধ্যাকর্ষ জাতীয় ক্ষমতা আছে, আর কিছু নয়। কিন্তু এখন সে ধারণা দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। এখন জানা গেছে যে, গ্রহগুলি থেকে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গ বিকিরিত হয়। এর ফলে গ্রহের চর্তুদিকস্থ দেশই যে শুধু প্রভাবিত হয় তাই নয়, মানুষের দেহের উপরও তার বিরাট প্রভাব পড়ে। তবে গ্রহ নক্ষত্র বিচার করে তাদের যে জ্যোতিষ গণনা তা মিথ্যে হয় এই কারণে যে, এই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গ যে শুধু আমাদের সৌরজাগতিক গ্রহগুলি থেকেই আমাদের উপরে পড়ে তা নয়, সমগ্র মহাবিশ্ব জগৎ থেকেই এসে পড়ে। মহাবিশ্বে কোথাও কোন ছায়াপথ ডুবে গেলে, নতুন ছায়াপথের আবির্ভাব হলে, তারও প্রভাব আমাদের বিশ্বে এসে পড়ে, তাও আমাদের মানসিক ও স্নায়বিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে। জ্যোতিষীরা সেই প্রভাব বিচার করতে পারেন না বলেই সর্বাংশে নির্ভুল ভবিষ্যৎবাণী করতে পারেন না। তাছাড়া আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ যেসব ব্যক্তি ও পরিবেশ রয়েছে, তারও প্রভাব আমাদের উপর পড়ে। অরণ্য নির্মুল করা হলে তার প্রভাব মানুষের ভাগ্যের উপর পড়বেই। নদী শুকিয়ে গেলে তার প্রভাবও পড়বে। চাষের জন্য কেমিক্যাল সার ব্যবহার করা, পেস্টিসাইট ব্যবহার করা—এ-সব স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। যে-সব লোকের পাশাপাশি আমরা চলি তাদের দেহ থেকেও এক ধরনের তরঙ্গ নির্গত হয়। সেই তরঙ্গের প্রভাবও আমাদের উপর পড়ে। ইদানিং পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, মানসিক অবসাদগ্রস্ত ব্যক্তি, রুগ্ন ব্যক্তি, এদের দেহের চতুর্দিকস্থ বায়োপ্লাজমা রীতিমত দুর্বল ও বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। এদের পাশাপাশি থাকলে তার প্রভাব ভালমানুষের দেহ ও মনের উপরও পড়ে। ফলে ভাল মানুষও অসুস্থ বোধ করে। এ ক্ষেত্রে কয়েকটি মাত্র গ্রহের অশুভ ফলের প্রতিবিধান করলেও কোন ফল হবে না। এবং দেখা যাচ্ছে, হয়ও না। এই কারণেই জ্যোতিষীর কাছে পরামর্শ চাওয়া অপেক্ষা নিজের আত্মশক্তিকে প্রবল করে তোলাই বড় ব্যাপার। এই আত্মশক্তিকে বড় করে তোলার জন্য বিশ্বমানসের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন প্রয়োজন। বিশ্বমানস ও শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করা গেলে আমাদের যে-শক্তির অভাব ঘটে তা পুরণ করা যায়। একেই আধুনিক বিজ্ঞান বলে biofeedback. সাধারণতঃ প্রত্যেক ধর্মে এই বিশ্বমানসের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য সশব্দ প্রার্থনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কীর্তন, গান, উচ্চসুর প্রার্থনা (আজান) সবই সেই বিশ্বমানসের সঙ্গে

যোগাযোগ স্থাপনের জন্য। তবে এই বিশ্ব-মানসের সঙ্গে, বিশ্বতরঙ্গশক্তির সঙ্গে যোগের মাধ্যমেই বেশি যোগাযোগ করা যায় বলে ইদানিং যোগের প্রচারই বেশি হচ্ছে। বর্তমান লেখককে কোন এক হিমালয়ের যোগী বিশ্বের আসন্ন বিপদের কথা চিন্তা করে এই বিশ্বমানসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছিলেন। সেই জন্য তিনি সহজ যোগের পদ্ধতি লেখককে জানিয়েছিলেন— যে-যোগের কথা 'দিব্য জগৎ ও দৈবী ভাষা' নামক গ্রন্থের দুটি খণ্ডে প্রকাশ করা গেছে। গ্রন্থের পরিশিষ্টে এই সহজ যোগের নির্দেশও দেওয়া আছে। সেই নির্দেশ অনুসারে যোগ করে বহু জনে অভূতপূর্ব দিব্য জগতের সংস্পর্শে এসেছেন বলে লেখককে জানিয়েছেন। বর্তমান অশুভশক্তির প্রভাবে যে দুষিত পরিবেশ, তা থেকে তাঁরা হয়তো রক্ষা পাবেন। জ্যোতিষ শাস্ত্র বোধহয় এই যোগেই তার পূর্ণতা লাভ করে।

সে যাই হোক প্রাচীন আমেরিকানদের উন্নত সভ্যতা সম্পর্কে যে কথা বলা যাচ্ছিল তাই আর একটু বলা যাক। প্রাচীন সব পুরাণ কাহিনীতেই গতিতত্ত্বের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। মধ্য আমেরিকার পুরাণ-কাহিনীতে আমাদের যুগকে শাশ্বত গতির যুগ বলে বর্ণনা করা হয়েছে— যেখানে কোন কিছুই স্থির নেই। মধ্য আমেরিকার ঋষিরা মনে করতেন যে, সৃষ্টি ও প্রলয় অনিঃশেষ ভাবে আবর্তিক গতিতে চলেছে। এ অনেকটা 'Pulsating Universe Theory'-র মতন। আধুনিক বিজ্ঞানীরাও এ ধরনের চিন্তা সমর্থন করেন।

মধ্য আমেরিকার ধর্মতত্ত্ববিদেরা মনে করতেন যে, আধুনিক যে বিশ্বে মানুষ বাস করছে সেই বিশ্ব হল পঞ্চম সূর্যের বিশ্ব। এ হল গতির যুগ। তাদের দেবতা কোয়েৎজলকোয়াটল এই যুগেরই দেবতা— যিনি বস্তুসত্তার অন্তর্নিহিত শক্তির নিয়ন্ত্রক। জড়বস্তুর মধ্যে যে এক ধরনের শক্তি বিরাজমান বর্তমান পদার্থ বিজ্ঞান তা নির্দ্বিধায় স্বীকার করে। সুতরাং এই ধরনের গতিশক্তি বা Kinetic Energy ভারতীয়রা শিবের মধ্য দিয়ে যে তত্ত্ব ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন তাই। এই গতিশক্তি যে সোজা সরল পথে চলে তা নয়, চলে আবর্তিক ভঙ্গ তে। সেই জন্য ভারতীয়রা শুধু শিব নয়, শিবের কণ্ঠের সর্প নয়, বিশেষ রকমের প্রতীক তৈরি করেও এই শক্তিকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন— যেমন, স্বস্তিকা চিহ্ন। উত্তর আমেরিকা, মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকাতেও এই ধরনের স্বস্তিকা চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছিল। চিহ্নের ক্ষেত্রে সামান্য একটু হেরফের ছিল এই যা।

সময় সম্পর্কিত প্রাচীন সব সংস্কৃতিতেই উন্নতধরনের চিন্তা ছিল। বিশেষ করে প্রাচীন মধ্য আমেরিকার লোকেরা এ বিষয়ে অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন। আমেরিকানরা জানতেন যে— সময় হল গতি থেকে উদ্ভুত। এই সময়ই ভ্রান্তি বা মায়া সৃষ্টি করে রেখেছে।

শুধু প্রাচীন আমেরিকান বা মিশরীয় বা ভারতীয়রাই নন, জিলবার্ট দ্বীপের মত দ্বীপের মানুষেরাও সেকালে অতি উচ্চ কল্পনা করতে পেরেছিল। তাদের মইয়ান পুরাণ-কাহিনীতে সৃষ্টি সম্পর্কে যে গল্প বলা হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ—

দেশের (space) বুকে বসে 'ন এরিয়ান' মহাশূন্যে নিঃসঙ্গ একখণ্ড মেঘের মত ভেসে বেড়াচ্ছিলেন। তিনি ঘুমোননি, কারণ, তখন ঘুম বলে কিছু ছিল না। তিনি ক্ষুধার্ত বোধ করেন নি, কারণ, তখন ক্ষুধা বলতে কিছু ছিলনা। এই ভাবে বেশ কিছুদিন থাকার পর তাঁর মনে একটি চিন্তার উদয় হল। তিনি নিজের মনেই বললেন—'আমি কিছু একটা তৈরি করব।' ব্যাপারটা বৈদিক সেই বহুবিখ্যাত উক্তির মত— যিনি একাকিত্বে ক্লান্ত হয়ে ভাবলেন—' আমি বহু হব।'

খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে চৈনিক পুরাণ-কাহিনীতেও অনুরূপ ধরনের চিন্তা দেখা যায়। চৈনিক কাহিনীতে আছে :— 'সর্বপ্রথম ছিল মহাশূন্যতায় একটি ডিম্ব। সেই ডিমের ভেতর ছিল বিশৃঙ্খলা। সেই বিশৃঙ্খলার মধ্যে পান-কু অপ্রকাশিত রূপে ঐশ্বরিক ভ্রূণের মত ভেসে বেড়াচ্ছিলেন। অবশেষে সেই ডিম ভেঙে পান-কু বর্তমান মনুষ্যাকৃতির চতুর্গুণ বৃহৎ আকৃতি নিয়ে ফুটে বেরুলেন, ফুটে বেরুলেন হাতে হাতুড়িবাটালি নিয়ে— যা দিয়ে তিনি বিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন।'

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী নাগাদ চীনে সৃষ্টি সম্পর্কিত আরও কাহিনী ছিল নিম্নরূপ ঃ— 'আকাশ ও পৃথিবী রূপ গ্রহণ করার আগে সবই ছিল অস্পষ্ট ও আকৃতিহীন... স্বচ্ছ ও হাল্কা উপাদান থেকে আকাশ তৈরি হল। যা ছিল ভারি ও ঘোলাটে তা থেকে হল পৃথিবী। নির্ভেজাল সূক্ষ্ম উপাদানগুলির পরস্পর যুক্ত হওয়া সহজ ছিল—, কিন্তু ভারি ও ঘোলাটে উপাদানগুলির ঘনীভূত হওয়া কঠিন ছিল। সেই জন্য আগে তৈরি হল স্বর্গ, পরে তৈরি হল মর্ত্য। যখন সেই মহাশূন্যতায় স্বর্গ ও মর্ত্য একত্র যুক্ত হল এবং সবকিছু একটা অস্পষ্ট সহজতায় ফুটে উঠল তখন সৃষ্টি না করা সত্ত্বেও সবই তৈরি হল। সর্বব্যাপী 'এক' আত্মপ্রকাশ করল। সেই অপরিচ্ছিন্ন 'এক' থেকেই সব কিছু বেরিয়ে এল— এল বিভিন্ন রূপে।'

যদি উপরোক্ত পুরাণ-কাহিনীগুলি বিচার করা যায় তাহলে মানুষের চিন্তার দুস্পর্ধা দেখে অবাক হতে হয়। সেই উদ্দাম চিন্তা ও আধুনিক বিজ্ঞানের Big Bang চিন্তার মধ্যে পার্থক্য এই যে, বিজ্ঞান নিজের চিন্তার যথার্থতা সম্পর্কে বার বার নিজেকেই প্রশ্ন করতে পারে, এবং এ ধরনের চিন্তার কোন ভিত্তি আছে কি না তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যাচাই করে নিতে পারে। কিন্তু প্রাচীন মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কে যে-সব গল্প তৈরি করেছিলেন তা শুধু আমাদের শ্রদ্ধাই অর্জন করতে পারে। কিন্তু কিভাবে, কেন তাঁরা অমন চিন্তা করেছিলেন তা বিশ্লেষণ করে দেখার উপায় নেই।

প্রত্যেকটি মানব সংস্কৃতিতেই দেখা যায় যে, এই সংস্কৃতি-স্রষ্টারা প্রকৃতির আবর্তিক গতিকে অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা মনে করতেন, কোন দেবদেবী যদি এর পেছনে না থাকেন তাহলে এমন সুশৃঙ্খলভাবে সব কিছু ঘটা সম্ভব নয়। মানুষের প্রকৃতিতে যদি এ রকম আবর্তিক ঘটনা ঘটতে পারে তাহলে দেবদেবীদের জগতেও কি তা নেই? একমাত্র হিন্দুদের

চিন্তার মধ্যেই দেখা যায় যে, হিন্দু ঋষিরা মহাবিশ্বেও ওই ধরনের জন্মমৃত্যুর লীলা লক্ষ্য করেছিলেন। এখানে সময় সম্পর্কে যে চিন্তা করা হয়েছিল অদ্ভুত ভাবে তা আধুনিক বিজ্ঞানের সময়-চিন্তার সঙ্গে মিলে যায়। এই সময়-জ্ঞানের জন্যই তাঁরা ব্রহ্মার দিবারাত্রির কল্পনা করতে পেরেছিলেন।

হিন্দু শাস্ত্রে সৃষ্টির উদয় ও অস্ত সম্পর্কে সেই জন্যই গল্প আছে যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরের স্বপ্ন (কল্পনা) মাত্র। শত ব্রাহ্ম-বৎসর স্বপ্ন দেখার পর তিনি আবার স্বপ্নহীন নিদ্রায় ঢলে পড়েন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁর স্বপ্নহীনতার মধ্যে অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। আবার শত ব্রাহ্ম-বৎসরান্তে তিনি জেগে ওঠেন ও নতুন করে স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেন।

দেশে অসংখ্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আছে। সে সবই এই ভাবে তাদের নিজস্ব ঈশ্বরের স্বপ্নে ভেসে ওঠে এবং তাঁর নিবিড় নিদ্রায় নিস্তরঙ্গ প্রশান্তির মধ্যে হারিয়ে যায়। নিন্দুক যাঁরা তাঁর মনে করেন যে, সব কিছু ঈশ্বরের স্বপ্নে ভেসে উঠলেও মানুষ তাঁর স্বপ্নের জগতে বিচরণশীল কোন জীব নয়। এবং ঈশ্বরই হলেন মানুষের স্বপ্ন মাত্র।

তবে যিনি যাঁরই স্বপ্ন হোন না কেন— ভারতবর্ষে দেখা যায়, সেখানে অনেক দেবতার অস্তিত্ব। এবং এক একটি দেবতারই রয়েছে নানা ধরনের অভিব্যক্তি। চোলরা দক্ষিণ ভারতে ব্রোঞ্জের যেসব মূর্তি তৈরী করেছিলেন তার মধ্যে আছে শিবের নানা ধরনের মূর্তি। এতে স্রষ্টা হিসেবে শিবের যে নর্তক মূর্তি দেখা যায়— যাকে বলে নটরাজ, তাই হল সর্বাপেক্ষা বেশি উল্লেখযোগ্য। এই নটরাজের চার হাত। দক্ষিণ ঊর্ধ্ববাহুর মুষ্টিতে রয়েছে ডম্বরু। বাম ঊর্ধ্ববাহুর মুষ্টিতে অগ্নিশিখা। ডম্বরুর শব্দই হল সৃষ্টির নাদ। অগ্নিশিখা হল নবসৃষ্টির প্রতীক,— যে সৃষ্টি কোটি কোটি বৎসর টিকে থাকার পর আবার লয় পাবে।

এই নটরাজের মূর্তিকে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীয় ভাবনার একটি পূর্বাভাস হিসেবেও নেওয়া যেতে পারে। এই মূর্তির বক্তব্যের মতই Big Bang-এর পর জগৎ সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। এবং এ কথাও সত্য যে— চিরকাল এই সম্প্রসারণ চলবে না। এই সম্প্রসারণের গতি ধীরে ধীরে শ্লথ হয়ে আসবে, একদিন থেমে যাবে এবং উল্টো টানে আবার ফিরতে থাকবে। যদি বিশ্বে পদার্থিক উপাদান একটি নির্দিষ্ট মাত্রার কম হত, তবে এই সম্প্রসারণ থামত না। বিশ্ব চিরকাল সম্প্রসারিত হত। যদি এই পদার্থিক উপাদান আমরা যা প্রত্যক্ষ করছি তা অপেক্ষা বেশি হয় (অর্থাৎ যা আজও অদৃশ্য রয়েছে) তাহলে মাধ্যাকর্ষীয় একটি টানে বিশ্ব শৃঙ্খলিত ভঙ্গীতে এগিয়ে যাবে এবং এই সম্প্রসারণের পরই আসবে তার সংকোচন— অর্থাৎ Big Bang-এর পরে আসবে Big Crunch;আবার বিশ্ব জাগবে, আবার ডুববে, এইভাবে চিরকাল চলবে। যদি ঘটনাটি এরকমই হয় তাহলে Big Bang দ্বারা যে শুধু সৃষ্টিই বোঝাচ্ছে তা নয়— এর দ্বারা প্রাক্তন এক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের লয়ও বোঝাচ্ছে।

যদি সৃষ্টির এই লীলা উপরোক্ত ভাবে চলে— তাহলে প্রলয় কালে অদ্ভুত ঘটনা ঘটবে। যে ভাবে সৃষ্টি ধাপে ধাপে প্রকাশিত হয়েছিল, লয়ের সময়— অর্থাৎ উৎসে প্রত্যাবর্তনের সময় ধাপে ধাপে সেই দৃশ্যগুলিই আবার ফুটে উঠবে—, সিনেমায় রীল গুটিয়ে নেবার মত আগে ফল পরে কারণগুলি দেখা যাবে। আগে দেখা যাবে মানুষ পরে তার জন্ম। আগে দেখা যাবে পুত্র, পরে পিতা। যোগের অতীত দর্শনের সূত্রের সঙ্গে এর একটা যোগ রয়েছে, যা গতির দ্বারা নির্ধারিত হয়। কিন্তু বর্তমানে সে প্রসঙ্গ আলোচ্য নয়। সুতরাং প্রাক্তন মরমিয়া ঋষিদের দর্শনের মধ্যে যে অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক সত্যের কথা আলোচনা করছিলাম— তাই করা যাক।

বিশ্ব-ডিম্বের কল্পনা যেমন প্রাচীন মরমিয়া ঋষিরা করেছিলেন— তেমনই আধুনিক বিজ্ঞানীরাও করছেন। তবে উভয়ের কল্পনার মধ্যে বিরাট একটা ফারাকও আছে। আমরা যারা বস্তুবাদে আচ্ছন্ন তারা এই ডিম্বকে মনে করি এক ধরনের শক্তি-পরমাণুপুঞ্জ। অতি সূক্ষ্ম পদার্থিক সত্তা দিয়ে এগুলো তৈরি। তবে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি আছেন যাঁরা মনে করেন যে, এই পরমাণুগুলি অতি সূক্ষ্ম আকাশীয় উপাদানে তৈরি— অর্থাৎ আত্মিক উপাদানে তৈরি।

ইদানিং বিজ্ঞানে দেখা গেছে যে, দেশ (space) এক ধরনের সূক্ষ্ম শক্তি দ্বারা সিক্ত। এই শক্তি এত সূক্ষ্ম যে, একে অনুমানের মধ্যেই প্রায় আনা যায় না। এই জন্য দেশকে শূন্য বলে মনে হয়। জাপানী বিজ্ঞানী 'হিদেকি ওকাওয়া'ই প্রথম মনে করেন যে, এই ধনের পরমাণু শূন্য থেকে জাত হতে পারে। পুনরায় নতুন মাত্রায় (এক ধরনের শূন্যতা) ডুবে যাবার আগে তাদের ধরাও যেতে পারে। এই ধরনের পরমাণুর নামই Virtual Particles. ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে সত্যি সত্যি তাদের অস্তিত্ব ধরা পরে। এর ফলে পদার্থবিদ্যায় 'শক্তি সংরক্ষণ বিধি' বা Law of Conservation of Energy' বলে যে তত্ত্ব আছে তা ন্যস্যাৎ হয়ে যায়। 'শক্তি সংরক্ষণ বিধি'র বক্তব্য ছিল এই যে, শক্তির, কখনও ধ্বংস নেই। একে সৃষ্টি করাও যায় না। এক অবস্থা থেকে তাকে আরেক অবস্থায় রূপান্তরিত করা যায় এই যা। কিন্তু এ তত্ত্ব সত্য হলে কোন কিছু নেই এমন অবস্থা থেকে শক্তি-পরমাণু সৃষ্টি হতে পারত না। আবার 'কোন কিছু নেই' এমন অবস্থায় মিলিয়ে যেতেও পারত না। কিন্তু Virtual Particlesএর ব্যবহার ঠিক তেনই।

কিন্তু হিদেকি ওকাওয়া বা তাঁর মতের সমর্থকরা এটা ধরতে পারেন নি যে, যথার্থই শূন্য থেকে এই সূক্ষ্ম পরমাণুগুলি জন্ম নেয় না। আরও সূক্ষ্ম পিণ্ড থেকে আসে, যাকে বলে কোয়ান্টাম ফিল্ড। এই কোয়ান্টাম ফিল্ড সমগ্র দেশকে সিক্ত করে রয়েছে। এই ফিল্ড যন্ত্রে আবিষ্কৃত পরমাণু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। আসলে শক্তিপিণ্ডগুলি আদি মানসশক্তির ঘনীভূত সংস্করণ— মানসশক্তিরই প্রকাশ মাত্র। একেই এখন অনেকে মিনডোন (Mindon) বলতে আরম্ভ করেছেন— যা

নাকি মানসশক্তির বাহক। সুতরাং শূন্যতাকে নির্ভেজাল শূন্যতা না বলে স্বতব্যাপ্ত শক্তিক্ষেত্ররূপে বর্ণনা করা যেতে পারে।

তবে আত্মিক শক্তি যদি মিনডোন জাতীয় পরমাণুরূপে থাকতে পারে, তাহলেই প্রশ্ন আসবে— এই মিনডোন আসে কোথা থেকে? এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গেলেই মরমিয়াদের জগতে ঢুকতে হয়। মরমিয়াদের মতে, সমগ্র সৃষ্টি মানস-শক্তি দ্বারা সিক্ত। সুতরাং আমাদের যে বাস্তব সত্তা, তা বিশেষ একটি বিন্দু থেকে উৎসারিত হয়ে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে আছে। বিশ্বডিম্বের বিস্ফোরণ বা Big Bang- হল আমাদের বাস্তব জগতে মানসশক্তির আকস্মিক প্রকাশ,— যে মানস শক্তি এসেছে ভিন্নতর একটা মাত্রা থেকে। একেই প্রাচীনেরা বলেছেন অগ্নি-ডিম্ব। প্রাচীনেরা মহাবৈশ্বিক ডিম্ব বলতে বুঝতেন— বিশ্ব মানসের তরঙ্গ — গতিময় মন। বিজ্ঞানীরা একে বলেন, 'শক্তিপরমাণুর পিণ্ড' আদি অণুতে আবদ্ধ বিকিরণ।

ছান্দোগ্য উপনিষদে সৃষ্টি সম্পর্কে তাই এইভাবে বলা হয়েছে ঃ— 'আদিতে দ্বিতীয়বিহীন' 'এক' ছিলেন। তিনি ভাবলেন— 'আমি বহু হব, নিজেকে বিকশিত করব। সুতরাং তাপ সৃষ্টি হল।'

ঐতরেয় উপনিষদে বলা হয়েছে ঃ— ' আদিতে বিশ্ব ছিল আত্মন মাত্র। দেখার মত দ্বিতীয় কোন সত্তা ছিলনা। তিনি চিন্তা করলেন,' 'আমি বিশ্ব সৃষ্টি করব। সুতরাং তিনি বিশ্ব সৃষ্টি করলেন, সৃষ্টি করলেন সমুদ্র, আবহাওয়া, মৃত্যু, সলিল ইত্যাদি।'

একটা জিনিষ স্পষ্ট— আদি মানস, যাকে পুরাণে মনুষ্যাকারে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে— এখানে সে-ধরনের কোন প্রয়াস নেই। সেই জন্য 'এক ও অদ্বিতীয়' এবং 'আত্মন' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সেই যে মানস সত্তা, তাঁরই ইচ্ছায় বস্তুসত্যরূপ বিশ্ব আত্মপ্রকাশ করেছে।

সেন্ট জন নিউ টেস্টামেন্টে বলেছেন, 'আদিতে ছিল শব্দ। শব্দ ছিল ঈশ্বরের সঙ্গে। শব্দই হল ঈশ্বর।' এতে ভারতীয় শব্দব্রহ্মনের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। এই যে শব্দ এই শব্দই আদি মানসের ঘনীভূত ইচ্ছার বিস্ফোরণের শব্দ। এই বিস্ফোরণের শব্দই হিন্দুদের মতে 'ওঁ'। যিশুখ্রীষ্ট বলেছেন— 'word made flesh'. শব্দ থেকেই স্থূল বিশ্বের জন্ম।

ভারতীয় তন্ত্র এই শব্দের তরঙ্গকেই (শব্দজাত শক্তি-পরমাণু) সৃষ্টির আদি উপাদান হিসেবে কল্পনা করেছে। এই শব্দ তরঙ্গই অদি সূক্ষ্ম অবস্থা থেকে স্থূল রূপে বস্তুবিশ্ব সৃষ্ট করেছে। স্থূল রূপে ফুটে ওঠার জন্য শক্তির একান্নটি ধাপ প্রয়োজন ছিল। এই তত্ত্বকেই ভারতীয় শক্তি-উপাসক বা শাক্তরা মা কালীর রূপের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন।

বিজ্ঞানের False Vacuum অবস্থাকেই Old Testament-এ নিম্নোক্তভাবে বলা হয়েছে—, 'ঈশ্বর মানস শূন্যতায় ভেসে বেড়াচ্ছিলেন।'

নিউ টেস্টামেন্ট ও ওল্ড টেস্টামেন্টের বক্তব্যে আমাদের এই বাস্তব সত্যের মধ্যে যে একটা আত্মিক শক্তি রয়েছে সেকথাই বলা হয়েছে। শব্দ হল চিন্তার প্রকাশ। চিন্তা হল মনের সৃষ্টি। 'আদি ঈশ্বর-মানস আদি সলিলের উপর ভেসে বেড়াচ্ছিল' বলে ওল্ড টেস্টামেন্টে যে মন্তব্য করা হয়েছে, তার অর্থ ঈশ্বর-মানসে সৃষ্টির ভাবনা।

যদি সৃষ্টি মানস-ক্ষেত্র থেকে হয়ে থাকে— যে-মানস ক্ষেত্র পরবর্তীকালে শক্তিরূপে ও বস্তুরূপে ঘনীভূত হয়েছিল, তাহলে সব কিছুই একটা চিন্তারই রূপ মাত্র নয় কি? তাহলে ব্যাপার যা দাঁড়ায়,— তা এই যে, বস্তুসত্য হিসেবে আমরা যা দেখি তা হল ভ্রান্তিমাত্র।

আসলে আমাদের এই বাস্তব সত্তা ভিন্ন কোন মাত্রা থেকে দেখলে, ভ্রান্তি বলে প্রতীয়মান হলেও, আমাদের কাছে তা বাস্তব সত্যই। এই ভিন্ন মাত্রা মরমিয়া ঋষিরা অর্জন করেছিলেন বলেই তাঁরা বলতে পেরেছিলেন যে, এ জগৎ ভ্রান্তি মাত্র। এই ভিন্ন মাত্রার দর্শন শুধুমাত্র যে আমাদের দেশের ঋষিদেরই হয়েছিল তা নয়— মধ্য আমেরিকার পুরাণ কাহিনীতেও এই মরমিয়া দর্শন ছিল। সেই জন্যই সেখানে সৃষ্টি সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, 'যেখানে আকাশ ও পৃথিবী কিছুই ছিল না, সেখানেই ঈশ্বরের বাক্য প্রথম স্ফুরিত হয়েছিল। তাঁর বাক্য ছিল এক ধরনের করুণার প্রকাশ।' ঠিক একই ভাবের প্রতিধ্বনি করে বাইবেলের সুসমাচারে সেন্ট জন বলেছিলেন— 'আদিতে ছিল শুধু মাত্র শব্দ।'

হিন্দুশাস্ত্রে সরাসরিই এই মানস শক্তির কথা বলা হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে তাই বলা হয়েছে ঃ— 'মনই আত্মন, মনই বিশ্ব, মনই ব্রহ্মন।' ঐ উপনিষদেই বলা হয়েছে যে, 'ইচ্ছা বা সংকল্প মন অপেক্ষাও বড়। মানুষ ইচ্ছা করলেই মনের মধ্যে চিন্তা করে, চিন্তা হলেই বাক্যরূপে তা প্রকাশ করে— প্রকাশ করে নামরূপে।

সবই ইচ্ছাকে কেন্দ্র করে রয়েছে, ইচ্ছা দ্বারাই গঠিত, ইচ্ছার মধ্যেই স্থিত।'

আত্মন বা মহামানস বস্তুসত্তারূপে আত্মপ্রকাশ করেছে ইচ্ছার পাখায় ভর করেই। এই ইচ্ছাই আসলে গতি।

সৃষ্টি সম্পর্কিত যে-সব পুরাণ-কাহিনী দেখা যায়, তাতে জলকেই সৃষ্টির প্রথম উপাদান হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। মিশরীয় পুরাণ-কাহিনীতে এই জলই হল নুনের বিশৃঙ্খল জল, যাকে আলোড়িত করে আমোন সৃষ্টির সূচনা করেছিলেন। বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বে বলা হয়েছে 'ঈশ্বর-মানস জলের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছিল'। এর পরই বলা হয়েছে 'ঈশ্বর বললেন, জলের মধ্যে আকাশ হোক, এই আকাশ জল থেকে জলকে বিভক্ত করুক। এবং ঈশ্বর আকাশ তৈরি করলেন এবং জলকে বিভক্ত করলেন আকাশের নিচে ও উপরে।' হিন্দুরা প্রায় একই ভাবে এই জলের কথা বলেছেন। সেই জন্যই ঐতরেয় উপনিষদে বলা হয়েছে, তিনি ভাবলেন, আমি বিশ্বজগৎ, সাগর (জল), আলোর রাজ্য, মৃত্যু ও জল তৈরি করব।... আকাশের ওপারে এই সমুদ্র, এর মেঝে হল আকাশ।

আবহাওয়ামণ্ডল হল আলোর রাজ্য। মৃত্যু হল পৃথিবী (এর স্থূলতার জন্য)। এর নিচে যা তাও জল।' মধ্য আমেরিকার পুরাণ-কাহিনীতে আত্মিক শক্তির বস্তুরূপে এই রূপান্তরের কাহিনী 'পাঁচটি সূর্যের কাহিনী'-তে বর্ণনা করা হয়েছে। বর্তমান জগৎকে এই কাহিনীতে বলা হয়েছে— পঞ্চম সূর্যের স্তর। এর ঠিক উপরেই আছে জলের স্তর। পাঁচটি সূর্যের যে স্তরের কথা বলা হয়েছে, তা ঠিক ভারতীয়দের পঞ্চতত্ত্বের মত। এই পঞ্চতত্ত্বকে উল্টো করে সাজালে যেমন হয় তেমনই ঃ— ব্যোম, মরুৎ, তেজ, অপ ও ক্ষিতি। এর দ্বারা অতি সূক্ষ্ম স্তর থেকে অবতরণের কথা বলা হয়েছে।

এই যে সকল পুরাণ কাহিনীতেই জলের কথা বলা হচ্ছে, মহাবিশ্বে ও পৃথিবীতে জল থেকে জলের বিভাজনের কথা বলা হচ্ছে, এ জল নিশ্চয়ই আমাদের নিত্যদিন ব্যবহার্য্য জল নয়। আমেরিকান ও হিন্দু পুরাণ-কাহিনীতে দেখা যায় যে, জল আসছে আগুনের পরে। তবে হিন্দু পুরাণ-কাহিনীতে কারণ-সমুদ্র বলে যার উল্লেখ আছে— তা সর্বোপরি। এই কারণ-সমুদ্র সম্ভবতঃ মহাশূন্যতা —যাতে সৃষ্টির বীজ সুপ্ত ছিল। এই মহাশূন্যতার বুকে সুপ্ত বীজের মধ্যে ছিল গতির আবেগ, যে গতি গতিমান হয়ে আবর্তিক ভঙ্গীতে গোলাকার জগৎ সৃষ্টি করেছিল। সেই গতিকে বীজের আশ্রয় হিসেবে দেখানো হয়েছে, যেখানে ভগবান বিষ্ণু অনন্ত নাগশয্যায় নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিলেন। নাগকে অনন্ত বলার কারণ, তার আবর্তিক স্ফীতমানতার সম্ভাবনা প্রায় অসীম।

বাইবেলের সৃষ্টি তত্ত্বে অবশ্য আলোর পূর্বেও সলিলের কল্পনা করা হয়েছে। আবার এও বলা হয়েছে যে, 'এই আলো আদি সলিলের মধ্যে ছিল,— যতক্ষণ পর্যন্ত না জলকে বিভক্ত করে আকাশ তৈরি করা হয়েছিল।'

প্রাচীন ঋষিরা নিশ্চয়ই জানতেন যে, জল ও আলো দুটি স্বতন্ত্র উপাদান। এ দুটোকে মেশানো যায় না। তবু তাঁরা এরকম ভেবেছিলেন কেন? ব্যাপারটিকে বুঝতে গেলে আধুনিক বিজ্ঞানের কাছেই একটু যেতে হবে। বস্তু বিশ্লেষণ করে আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, বস্তুর উৎসেই রয়েছে শক্তি। শক্তিকে দেখা যাচ্ছে ত্রিমাত্রিক শক্তিক্ষেত্ররূপে প্রবাহিত হচ্ছে। এই ত্রিমাত্রিক শক্তিক্ষেত্র দেশকে ব্যাপ্ত করে রয়েছে। এ জন্যই আইনস্টাইন বলেছেন যে, বস্তুসত্তা দেশ দ্বারাই সৃষ্ট— যেখানে ফিল্ড বা ক্ষেত্র অত্যন্ত প্রবল। ছায়াপথ বা গ্রহনক্ষত্রাদি যেখানে রয়েছে, সেখানে এই শক্তিই ঘনীভূত হয়ে সব কিছু সৃষ্টি করেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের এই যে ধারণা,— এই ধারণাও প্রাচীন মরমিয়া ঋষিদের ধারণার মতই। এই গ্রহনক্ষত্রগুলি উর্ধ থেকে দেখলে কেমন দেখা যাবে? যতি পাহাড়ের চূড়া থেকে নিচে অধিত্যকার উপর ভাসমান কুয়াশাকে দেখা যায়, দেখা যাবে, কুয়াশা ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়তে পড়তে সমগ্র অধিত্যকাটিকে ঢেকে দিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত শুধু কুয়াশা ছাড়া আর কিছুই দেখা যাবে না। গাছ গাছালীকে তখন যদি কল্পনার চোখ মেলে দেখবার চেষ্টা করি, তখন ঘনীভূত কিছু কুয়াশা বলে মনে হবে।

এই কুয়াশার মতই দেশব্যাপী তেজক্ষেত্র প্রবাহিত হয়ে চলেছে। উপর থেকে দেখলে দেখতে পাব, এই তেজক্ষেত্রই ঘনীভূত হয়ে বস্তুসত্তার সৃষ্টি করছে। একেই বলে জল থেকে জলকে বিভক্ত করা। ঠিক একই ভাবে জল থেকে বরফখণ্ড সৃষ্টি হয়ে জলকে জল থেকে বিচ্ছিন্ন করে। জল বিভিন্ন রূপ নিচ্ছে এমন দেখার ক্ষমতা থাকা চাই। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ঋষিরা ১২১ নং সূক্তের ৭নং পংক্তিতে এই ধরনেরই একটি মানসিকতা ব্যক্ত ক'রে বলেছেন :— ''সকল কিছুর ভ্রূণ গর্ভে ধারণ করে যখন ঊর্ধ সলিল সঙ্গে অগ্নিকে নিয়ে নেমে এল— তা থেকে দেবতাদের শ্বাস স্বরূপ তিনি আবির্ভূত হলেন।'

এই যে অগ্নি-ভ্রূণ, জল থেকে যা নির্গত হয়েছিল, যা দেবতাদের শ্বাস স্বরূপ— উপরোক্ত বক্তব্যের এই অংশটুকু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্যণীয়।

ঋগ্বেদেরই দশম মণ্ডলের ৭২নং সূক্তের ৬-৭ নং পংক্তিতে বলা হয়েছে ঃ— 'হে দেবগণ তোমরা যখন সেই সলিলে পরস্পর হস্তযুক্ত করে স্থান নিলে, তোমাদের মধ্য থেকে নর্তকের চরণসম্পাতে যেমন ধূলি উৎকীর্ণ হয়, তেমনই ঘন কুয়াশার মেঘ উঠে এল।'

'হে দেবগণ জাদুকরের মত তোমরা বিশ্বকে স্ফীত হতে সাহায্য করলে। সেই সমুদ্রে যে সূর্য লুকিয়ে ছিল, তাকে তোমরা বের করে আনলে।'

উপরোক্ত বক্তব্যে দেশের বুকে ছায়াপথ গঠনের কথাই বলা হয়েছে। বিজ্ঞানের দিকে যদি তাকাই, দেখতে পাব যে, অব-আণবিক পরমাণুগুলির ঘনীকরণের ফলেই গ্যাসীয় পদার্থ থেকে নক্ষত্রাদি নির্গত হয়ে বিশ্বকে স্ফীত করেছিল। এই যে সূর্যের প্রকাশ, তাই হল জল থেকে সূর্যের প্রকাশ।

উপরোক্ত সূক্তগুলি সবই দেশীয় ঘটনার বিবরণ মাত্র। দেশের ছায়াপথ ও নক্ষত্রাদির উদয়ের সঙ্গে এর সম্পর্ক রয়েছে। এই জন্যই ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৯ নং সূক্তে সৃষ্টির আদি অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে :—

''তখন কোন সত্ত্ব বা না-সত্ত্ব কিছুই ছিল না।
মৃত্যুও ছিল না— অমরত্বও ছিল না।।
আদিতে ছিল শুধুই অন্ধকার —অন্ধকার অন্ধকারে আবরিত।
সবই ছিল অপরিচ্ছিন্ন সলিল মাত্র।''

এখানে প্রকৃত পক্ষে দু'ধরনের তেজক্ষেত্রের কথা বলা হয়েছে। একটি হল নির্ভেজাল তেজ-ক্ষেত্র, যাকে মানসক্ষেত্র বলা যেতে পারে,—Psychic Mind Field–, অপরটি সেই তেজক্ষেত্রের ঘনীকরণ থেকে তার স্থূল রূপ। প্রথমটিকেই ভারতীয় ঋষিরা আত্মন বলেছেন। দ্বিতীয়টিকে বলেছেন সলিল। বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বে জলের উপর ঈশ্বরের ভেসে বেড়ানোর কথা বলে বাইবেলকার মূলতঃ এই আত্মিক ক্ষেত্র বা Psychic Mind Force-এর কথাই বলেছেন। এই আত্মিক ক্ষেত্র থেকেই গতি বা Kinetic Energy অর্থাৎ আলো নির্গত হয়েছিল।'

অপর পক্ষে বাইবেলে জল থেকে জলকে বিচ্ছিন্ন করার যে কথা বলা

হয়েছে, তা হল দেশস্থ গ্যাসীয় অবস্থার ত্রিমাত্রিক শক্তিক্ষেত্র রূপে প্রকাশের কথা,---অর্থাৎ- ছায়াপথ, নক্ষত্রাদি ও গ্রহাদির প্রকাশের কথা।

ভারতীয়দের তৈত্তিরিয় উপনিষদে আত্মনকে বলা হয়েছে সৃষ্টির প্রথম উপাদান। যা থেকেই ব্যোম, মরুৎ (গতি) তেজ (আলো) অপ (ঘনীভূত শক্তি) ও ক্ষিতি (বস্তুসত্তা)র উদয় হয়েছে। এদের একটা তদুপরোক্ত আর একটা থেকে এসেছে।

মিশরীয় পুরাণ-কাহিনীতে যে নুনের বিশৃঙ্খল জলের কথা বলা হয়েছে, তা আসলে আত্মিক শক্তির দিকেই ইঙ্গিত করে--- অর্থাৎ ভারতের আত্মন অবস্থা। এই নুন থেকেই পুরুষ ও মহিলা একত্রে যুক্তরূপ দেবতা 'আতুম' আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই আতুমই আমাদের দেশের ব্রহ্মা। বিজ্ঞানের ভাষায় নিউট্রন ফিল্ড.--- ভারতীয় পদ্ম--- যা থেকে আপনা আপনি ১২ থেকে ১৫ মিনিটে একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রন অর্থাৎ স্বতন্ত্র পুরুষ ও স্বতন্ত্র নারীসত্তা আবির্ভূত হয়। এদের পারস্পরিক যোগাযোগই জাগতিক উপাদান সৃষ্টি করে।

মধ্য আমেরিকার প্রাচীন যে পৌরাণিক উপাখ্যান,— যেখানে পাঁচটি সূর্য-স্তরের কথা বলা হয়েছে, তা হল— আত্মন (ব্যোম) গতি (মরুৎ) অগ্নি (তেজ) ঘনীভূত শক্তি (অপ্) ও বস্তুসত্তা-(ক্ষিতি)র কথা। এ ক্ষেত্রে ভারতীয় চিন্তা ও প্রাচীন আমেরিকান চিন্তার মধ্যে কোন ফারাক নেই।

চিন্তার এই সমতা দেখে মনে হয়, প্রাচীনকালে সব মানুষই একই স্থান থেকে এসেছিল। নইলে একই ভাবে সবাই চিন্তা করতে পারত না। কিংবা অন্তরের অন্তস্তলে সবাই যেমন একই স্তরে ডুবে যায়, পশ্চিমী মনস্তত্ত্ববিদেরা যাকে বলেছেন অচেতন-স্তর-(collective unconscious of Yung), সত্য এক বলে সবাই সেখানে একই ধরনের সত্যের সন্ধান পায়। সেই কারণে সবাই একই ধরনের কথা বলে। অন্তরের অন্তস্তল ও Psychic Mind Field বা force একই জিনিস।

প্রাচীন প্রত্যেক পুরাণ-কাহিনীতেই নানা দেবদেবীর কাহিনী লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বহু দেবদেবীর উল্লেখ থাকলেও প্রাচীন ঋষিরা এক সর্বোত্তম দেবতার কথা জানতেন। এই সর্বোচ্চ দেবতা থেকেই অন্যান্য দেবতারা এসেছিলেন। ভারতীয় চিন্তা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সব কিছুর মধ্যেই সেই 'একমাত্র' সত্তার উপস্থিতির কথা তাঁরা বলেছেন। সেই 'এক'-কেই তাঁরা বলেছেন আত্মন বা পরমাত্মন।

প্রাচীন মরমিয়া ঋষিরা তাঁদের এক একটি দিব্য অভিজ্ঞতাকে দেবতার নাম দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের চিন্তার মধ্যে রূপ বিধৃত দেবতা ত্রয়ীতে এই তত্ত্বেরই আমরা সন্ধান পাই যেমন, প্রকাশতত্ত্ব, দেশতত্ত্ব, ও গতিতত্ত্ব। এই তিন তত্ত্ব স্বতন্ত্র রূপে অনুভূত হলেও তারা যে একে অপরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত সে-কথা বোঝাবার জন্যই একত্রে ত্রিমূর্তি গঠন করা হয়েছে।

সৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত প্রাচীন এই দেবতাদের অনেকেই আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের চিন্তার সঙ্গে মিলে যান। অব-আণবিক পরমাণুগুলি বিশ্লেষণ করতে গেলে বার বার তাঁদের কথাই মনে পড়ে।

পুরাণ কাহিনীতে দেখা যায়, গৌণ দেবতারা অন্যকোন উপাদান থেকেই তৈরি হয়েছেন। তাঁরাই এই বস্তুবিশ্ব তৈরি করছেন,— যেমন, নক্ষত্র, গ্রহ, পৃথিবী ইত্যাদি। বিজ্ঞান লক্ষ্য করলেও দেখা যায়, সৃষ্টির আদি-অণু একটি মানস-ক্ষেত্রের ঘনীকরণ থেকেই সৃষ্ট হয়েছিল। সেই অণু যদি নিউট্রন অণু হয়— তা থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে প্রোটন ও ইলেকট্রন সমূহ বেরিয়ে এসেছিল।' তাদেরই পারস্পরিক যোগাযোগে স্থূলবিশ্বের উদয় হয়। প্রোটন ও ইলেকট্রনকে যদি গৌণ দেবতা ধরা যায় তাহলে তারাই স্থূলবিশ্ব সৃষ্টিতে অংশ নিয়েছিল তাতে সন্দেহ কি? ভারতীয় ছান্দোগ্য উপনিষদে এই জন্য সৃষ্টি সম্পর্কে এই ধরনের বিশেষ একটি উক্তি স্মরণীয় ঃ 'এই পৃথিবী, এই বায়ু, এই আকাশ, পর্বত সমূহ, দেববৃন্দ, মানুষ, ...এঁরা সবাই এই ঘনীভূত জল (তেজক্ষেত্র থেকে এসেছেন)।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে ঃ— 'অগ্নি থেকে যেমন স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তেমনই সব কিছুই আত্মন থেকে এসেছে। সমগ্র জগৎ, দেবতাবৃন্দ, সকল প্রাণী, সবই সেই আত্মনজাত।'

মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকার পুরাণ-কাহিনীতে বলা হয়েছে ঃ— 'সকল চন্দ্র, সকল বৎসর, সকল দিন, সকল বায়ু তাদের নির্দিষ্ট কর্ম শেষ করে চলে যায়। নির্দিষ্ট সময়ে সবাই ত্রিলোকের গুণ কীর্তন করে। সূর্যের করুণা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই পাওয়া যায়। আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলী নির্দিষ্ট সময় পর্যন্তই আকাশের ঝাঁজরি দিয়ে তাকিয়ে থাকবে। একটি নির্দিষ্ট সময়েই নক্ষত্রগুলির মধ্যে আবদ্ধ দেবতারা তাঁদের চিন্তা করবেন।'

আমেরিকানদের যে চিন্তা 'নক্ষত্রের মধ্যে আবদ্ধ দেবতাবৃন্দ'— এ দ্বারা তাঁরা কি বোঝাতে চেয়েছেন? কোন নরাকৃতি দেবতা কিংবা নক্ষত্র সমূহের মধ্যে আবদ্ধ শক্তি? তবে এ-কথা সত্য যে, এই দেবতারা সময়দ্বারা শাসিত ছিলেন। স্বর্গীয় জ্যোতিষ্কমণ্ডলীয় আবর্তিক গতির কথাও বলা হয়েছে। বলা হয়েছে তাদের সৃষ্টি ও ধ্বংসের কথা। তারা কেউই চিরন্তন নয়। একথা বিজ্ঞানও এখন স্বীকার করে। স্বীকার করে যে, এই গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ কিছুই চিরকাল থাকবে না। একদিন যেমন Big Bang-এ তাদের সৃষ্টি হয়েছিল, তেমনই একদিন Big Crunch-এ সব লয় পাবে। তবে কেউ যদি সময়ের শাসন থেকে মুক্ত থাকেন তবে তিনি হলেন সর্বোচ্চ দেবতা বা ঈশ্বর।

প্রাচীনদের পুরাণ-কাহিনীর সৃষ্টিতত্ত্ব যদি আলোচনা করা যায়—তাহলে দেখা যাবে যে, আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কারের সঙ্গে তা মিলে যাচ্ছে। বিজ্ঞানে তেজক্ষেত্রকে যেভাবে বস্তুরূপে অবতরিত হতে দেখা যায়—প্রাচীনদের চিন্তার সঙ্গে তার খুব একটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। এই মিল লক্ষ্য করলে সত্যিই অবাক হতে হয়। মৌল পরমাণুগুলিকে ব্যবহারের মধ্যে প্রাচীন দেবতাদের চরিত্র লক্ষ্য করা যায়।

এই পরমাণুগুলির প্রধান চরিত্র হল— এদের মধ্যে কোনটি ধনাত্মক চার্জ সম্পন্ন কোনটি ঋণাত্মক চার্জ সম্পন্ন। কোনটির মধ্যে আবার কোন ধরনের চার্জই নেই।

যে-সব পরমাণুর একই ধরনের বৈদ্যুতিক চার্জ আছে তারা একাত্ম হয়ে থাকতে পারেনা, একে অপরকে ঠেলে দেয়। যেমন, ধনাত্মক চার্জ সম্পন্ন প্রোটন আর একটি প্রোটনকে কাছে থাকতে দেবেনা। ঠেলে দেবে। আবার ঋণাত্মক চার্জ সম্পন্ন ইলেকট্রন একে অপরকে থাকতে দেবেনা, দূরে ঠেলে রাখবে। তবে বিপরীত চার্জ সম্পন্ন পরমাণুগুলি একে অপরকে আকর্ষণ করবে, যেমন পুরুষ মহিলাকে আকর্ষণ করে, আবার মহিলা পুরুষকে আকর্ষণ করে। এই কারণে ধনাত্মক চার্জ সম্পন্ন প্রোটন ঋণাত্মক চার্জ সম্পন্ন ইলেকট্রনকে আকর্ষণ করবে। ইলেকট্রন প্রোটনের প্রতি আকর্ষণ বোধ করবে, কিন্তু কখনও প্রোটনের মধ্যে নিজের সত্তা হারিয়ে ফেলবে না। যত আকর্ষণ বাড়বে ততই প্রোটনের চারদিকে দ্রুত ঘুরতে থাকবে।

ইলেকট্রনের এই গতিই সমগ্র বস্তুসাত্ত্বিক জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করছে। যদি ইলেকট্রন ও প্রোটন একে অপরকে আকর্ষণ না করত, যদি ইলেকট্রন প্রোটনের কাছে নিজেকে সমর্পণ করত, তাহলে অণু-গঠিত হতে পারত না।

ইলেকট্রনের আকৃতি কি? কেউ বলেছেন অণুর আকৃতি—যার মধ্যে বস্তুসত্তা আছে, কেউ বলেছেন— টেউয়ের মত। এর আকৃতি যাই হোক না কেন, আসল গুরুত্ব হল এর বস্তুসাত্ত্বিকতার মধ্যে। এই যে গুণ, প্রাচীন মরমিয়ারা এই গুণের প্রতিই আকৃষ্ট ছিলেন। প্রাচীন মরমিয়া ঋষিদের মতে, বস্তুসত্তা তৈরি হয়েছিল এই বিপরীত দুটি গুণের যোগাযোগেই, যে গুণ দুটিকে তাঁরা বলতেন পুরুষ ও মহিলা। মানসশক্তি এই দুইয়ের মধ্যে যে বিপরীতধর্মিতা সৃষ্টি করেছিল তারই মধ্যে নিহিত রয়েছে বস্তুজগতের ভিত্তিভূমি। এই দুই বিপরীত ধর্মী গুণের আধারকেই প্রাচীনেরা নরাকৃতি দিয়ে দেবদেবী হিসেবে কল্পনা করেছিলেন। এঁরা ছিলেন অসুরশক্তি থেকে পৃথক। বিজ্ঞানে এই দুইয়ের প্রতিপক্ষ হিসেবে প্রতি-পরমাণুর (anti particles) চিন্তা করা হয়েছে।

নিরপেক্ষ পরমাণু হল ভিন্ন প্রকৃতির জিনিস। অন্য কোন নিরপেক্ষ পরমাণু দ্বারা তারা আকর্ষণও বোধ করে না, তাদের আকর্ষণও করে না। অন্যান্য যে সকল পরমাণু গুণ দ্বারা আচ্ছন্ন (ধনাত্মক বা ঋণাত্মক) তাদের প্রতিও তারা উদাসীন। অথচ মজার ব্যাপার হল এই যে, এই ধরনের পরমাণুই ধনাত্মক ও ঋণাত্মক গুণ সম্পন্ন পরমাণু তৈরি করে। নিউট্রন হল এই ধরনের নিরপেক্ষ পরমাণু— যা থেকে প্রতি ১২-১৫ মিনিট সময়ের মধ্যে একটি ধনাত্মক চার্জ সম্পন্ন প্রোটন ও একটি ঋণাত্মক চার্জ সম্পন্ন ইলেকট্রন নির্গত হয়। এই ধরনের পরমাণুকেই প্রাচীন মরমিয়া ঋষিরা অর্ধনারীশ্বর বা HE-SHE GOD হিসেবে কল্পনা করেছিলেন।

এই পরমাণুগুলির আর একটি গুণ হল তাদের spin, নিজের অক্ষরেখাতে ভর করে ঘুর্ণন। তবে ইলেকট্রন যদি ঢেউয়ের মত হয়, আঠালো কোন জিনিষ হয়, এর ঘুর্ণন থাকবে কি করে?

কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলছেন এরও আপন অক্ষরেখায় ঘুর্ণন বা spin আছে। তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় কি? এ-কোথাও নেই অথচ সর্বত্রই আছে। আসলে ইলেকট্রন হল ঢেউরূপ মেঘ— নিউক্লিয়সের চতুর্দিকে এর ঘুর্ণন দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। সেই জন্য এ ধরনের চিন্তা মনগড়া চিন্তার মত। ইলেকট্রন যদি কখনও ঢেউ, কখনও অণুর মত কাজ করতে পারে, তাহলে তারা আকাশে ভাসমান মেঘের মত মানুষের আকারই বা কেন ধারণ করতে পারবে না?

শক্তিকে হিন্দুধর্মে মহিলারূপে কল্পনা করা হয়েছে। সৃষ্টির জন্য এটাই হল ঋণাত্মক তত্ত্ব— সৃষ্টি, পালন ও লয় সব কিছুর জন্য। এই শক্তিকে অণুরূপে, ঢেউরূপে বা নানা দেবীরূপে যে ভাবেই কল্পনা করা হোক না কেন,— তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি কিছু নেই। এই কারণেই অধুনাতম পদার্থবিদ্যা পড়লে মনে হয়। বিজ্ঞানও বুঝি মরমিয়া দর্শনের পথে চলেছে।

প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুর তৃতীয় গুণ হল তাদের প্রতিপরমাণু (anti particles)। আবার কিছু কিছু পরমাণু আছে—যারা নিজেরাই তাদের প্রতি পরমাণু— যেমন ফোটন, নিরপেক্ষ পাইয়ন (pion) প্রভৃতি।

অণু-পরমাণু ও প্রতি-অণুপরমাণু পরস্পর যেন পরস্পরের অভিশাপ স্বরূপ। কাছাকাছি এলেই একে অপরকে ধ্বংস করে দেবে। প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু ও প্রতি-অণুপরমাণু পরস্পর পরস্পরের বিপরীত বৈদ্যুৎ চার্জ সম্পন্ন হওয়ার জন্য একে অপরকে আকর্ষণ করে। তাদের মধ্যে সংঘর্ষ হলে উভয়েই মিলিয়ে গিয়ে শূন্যের মধ্যে, যাকে বলে কোয়ান্টাম ফিল্ড, তার মধ্যে হারিয়ে যায়। এর ফলে কোন পরমাণু প্রতিপরমাণুই থাকে না— থাকে শুধু শক্তি।

অণু-পরমাণু ও প্রতি-অণুপরমাণু সবারই একই পরিমাণ বস্তুসত্তা (mass) আছে। কিন্ত ইলেকট্রন ও প্রোটনের অসম বস্তুসত্তা (mass) রয়েছে। সেই কারণেই অণু-পরমাণু ও প্রতি-অণুপরমাণু একে অপরকে ধ্বংস করে— কিন্তু ইলেকট্রন ও প্রোটন একে অপরকে ধ্বংস করেনা। এর অর্থ দাঁড়ায় বিপরীত গুণসম্পন্ন অসম পরমাণু সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক,— কিন্তু বিপরীত গুণসম্পন্ন সমবস্তুসত্তাসপূর্ণ অণু-পরমাণু একে অপরকে ধ্বংস করে।

প্রশ্ন হল, এই তত্ত্ব কি প্রাচীন মরমিয়া ঋষিরা জানতেন? বোধহয় জানতেন। এই কারণেই পুরুষ ও মহিলার মিলনে সৃষ্টির কল্পনা করেছিলেন;— অপর পক্ষে দেবতা ও অসুরের মুখোমুখি হওয়ার মধ্যে ধ্বংসের চিত্র দেখেছিলেন। দেবতাকে যদি বলা যায় পরমাণু অসুরকে তবে বলা যায় প্রতিপরমাণু। তবে একটা জিনিষ লক্ষ্য করার ব্যাপার এই যে, পরমাণুর বস্তুসত্তার (mass) উপর

তাদের শক্তি নির্ভর করে না। যেমন ইলেকট্রন-এর বস্তুসত্তা প্রোটন অপেক্ষা কম হলেও তার শক্তি প্রোটন অপেক্ষা কম নয়। এ যেন ১৮৩৬ কিলোগ্রাম ওজনের কুস্তিগীর এক কেজি ওজনের কুস্তিগীরের সমান শক্তি ধরছে এমনতর কিছু।

এই তত্ত্ব আরো রহস্যময় হয়ে ওঠে যখন আমরা দেখি যে, বস্তু ও শক্তি মূলত: একই জিনিষ $-E=mc^2$

এই যে ইলেকট্রন প্রোটন অপেক্ষা কম বস্তুসত্তা সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও প্রোটনের সমান শক্তি ধরে, এটা কেন? ঘটনাটি ঘটে গতির জন্য। কোন একটি পরমাণু যখনই দ্রুত গতিতে ঘুরতে থাকে তখনই তার বস্তুসত্তা বেড়ে যায়।

পরমাণুগুলি বিশ্লেষণ করলে আর একটি অদ্ভুত ছবি পাওয়া যায় এই যে, পরমাণুর গঠনের মধ্যে এমন কিছু শক্তিপিণ্ডের সন্ধান পাওয়া যায়, যাদের বলা যেতে পারে বার্তাবহ। একটি অণুর মধ্যে কোন দুটি পরমাণু যদি অত্যন্ত কাছে এসে বিপদ সৃষ্টি করে তখন তারা ছুটে গিয়ে হুশিয়ারী দেয়, সাবধান আর এগিও না। খুব দূরে সরে গিয়ে যদি ভাঙনের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে তবে বলে, আর দূরে যেওনা। ফোটন, পাইয়ন এরা হল এই ধরনের শক্তিপিণ্ড। ফোটন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক শক্তির বার্তাবহ এবং পাইয়ন স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্সের বার্তাবহ। প্রশ্ন হল,— কারা এই শক্তিপিণ্ডগুলিকে এই বার্তাবহের ভূমিকা পালনের দায়িত্ব দিয়েছিল? পদার্থ বিজ্ঞানীরা এর কোন জবাব দেবেন না। যা ঘটছে তারা শুধু তাই বলবেন। কিন্তু মরমিয়া ঋষিরা বলবেন, এ-সবই মহাবৈশ্বিক একটি যে মানসসত্তা আছে, তাঁরই কাজ।

এই যে বিশ্ব-মানস, এই বিশ্ব-মানসের সঙ্গে যদি কোন ব্যক্তিমানস যোগাযোগ করতে পারে, তাহলে নানা অধ্যাত্ম সত্যের স্বরূপ তাঁদের কাছে প্রকাশিত হয়ে যায়।

ফোটন যে-শক্তিকে প্রকাশ করে তা হল গতিময় শক্তি বা kinetic energy. এর চলাফেরা আলোর গতিতে। এই গতি আর কমেও না, বাড়েও না। ফোটন যে ভূমিকা পালন করে, তা না করলে বস্তুবিশ্বই দেখা দিতনা। আমরাও পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে দেখা দিতে পারতুম না। ফোটনের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক আকর্ষণ ইলেকট্রনকে প্রোটনের দিকে আকর্ষণ করে, অণু গঠন করে। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে ফোটন হল গতিতত্ত্বের সংরক্ষণিক দিক।

ফোটনের কোন বস্তুসত্তা নেই। আলোর গতি পেলেই এর জন্ম হয়। সুতরাং গতিত্ত্বের এ হল গৌরবময় প্রকাশ। যে শক্তি সম বৈদ্যুৎ-চার্জ সম্পন্ন পরমাণুকে দূরে রাখে, বিপরীত বৈদ্যুৎ চার্জ সম্পন্ন পরমাণুকে আকর্ষণ করে, সেই শক্তিই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক শক্তি। এই শক্তি দুটি প্রোটন এবং একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রনের মধ্যে কাজ করে।

ফোটন যা গতিমাত্র, তা বুদ্ধির বাহক। প্রাচীন মরমিয়ারাও এই কারণে মনে করতেন যে, গতির নিজস্ব একটা বৌদ্ধিক গঠন আছে, সেই বুদ্ধি দ্বারা কখনও

সে গতি বাড়াতে পারে, কখনও গতি কমাতে পারে। কখনও দিক পরিবর্তন করতে পারে কখনও আবার অস্তিত্বও হারিয়ে ফেলতে পারে। সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংসের জন্য যখন যে ভূমিকা প্রয়োজন, তখন সে সেই ভূমিকাই পালন করতে পারে।

এই যে গতি— এই গতিই আদি সলিলকে আলোড়িত ক'রে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই প্রশান্ত সলিলের মধ্যে ঘূর্ণীপাক তৈরি করেছিল। সুতরাং গতিই সব কিছু। সৃষ্টি থেকে গতি হারিয়ে গেলে সৃষ্টিই হারিয়ে যাবে।

পরমাণু জগতের অদ্ভুত ব্যবহার। এই ব্যবহারগুলো আমাদের মহান দার্শনিক তত্ত্বের সত্যতা সম্পর্কে বিশ্বাসী করে তোলে। দেখা যায়, ধনাত্মক চার্জ সম্পন্ন মেসন অবক্ষিত হয়ে প্রতিমেসনে পরিণত হচ্ছে। আবার প্রতিমেসন অবক্ষিত বা অবক্ষয়িত হয়ে মেসনে পরিণত হচ্ছে। ঘটনাটা এমন ঘটছে যে, যা সত্তা তাই যেন অসত্তা, যা সৃষ্টি, তাই ধ্বংস। অদৃশ্য একটা সত্যেরই এরা দুটি দিক। ভাল মন্দ থেকে জাত হতে পারে (দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ) আবার মন্দ ভাল থেকে জন্ম নিতে পারে। তবে ভাল বা মন্দ আপেক্ষিক শব্দ। দেবতার জগতে অসুর খারাপ। আবার অসুরের জগতে দেবতা খারাপ। এর কোন সর্বাত্মক সত্যতা নেই। তবে এ-সবই একই সত্যের মধ্যে নিহিত ছিল, যেমন, পরমাণু প্রতিপরমাণু সবই সেই একই সত্য থেকে অর্থাৎ একই মানসক্ষেত্র বা কোয়ান্টাম ফিল্ড থেকে জাত— যার মধ্যে পরমাণু, প্রতিপরমাণু, ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চার্জ সবই একত্রে মিশে ছিল।

ধনাত্মক চার্জ ও ঋণাত্মক চার্জ সম্পন্ন মেসনের মত নিরপেক্ষ মেসনও প্রকাশতত্ত্ব ও গতিতত্ত্বের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। স্থির বস্তুসত্তা (Rest Mass) থাকা সত্ত্বেও এই পরমাণু— ফোটনে পরিণত হতে পারে (অর্থাৎ গতির চূড়ান্ত পর্যায়ে) আবার বস্তুসত্তাবিহীন অনস্তিত্বেও বিলীন হতে পারে। এই যে দ্বৈতের মধ্যে ঐক্য, প্রাচীন মরমিয়া ঋষিরা এটা জানতেন। সেই জন্যই তাঁর ব্রহ্মা (প্রকাশতত্ত্ব) বিষ্ণু (দেশতত্ত্ব) ও শিব (গতিতত্ত্ব)-কে এক বৃত্তে ত্রিমূর্তির মধ্যে ধরে দেখিয়েছিলেন।

পাইয়ন নামক পরমাণু হল স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্সের বার্তাবহ। এই বার্তাবহ না থাকলে— অণু সংগঠিত হয়ে থাকতে পারত না। সেই জন্য এই পরমাণুর মধ্যে রয়েছে সৃষ্টির সংরক্ষণের দিক। অর্থাৎ প্রকাশতত্ত্বের মধ্যে সংরক্ষণিক দিক।

স্টং-ফোর্স ধনাত্মক চার্জ সম্পন্ন প্রোটনকে অণুর কেন্দ্রে (নিউক্লিয়াস) আটকে রাখে। স্ট্রং-ফোর্সের বার্তা পি-মেসন নামে এক ধরনের পরমাণু বহন করে। এই অতি ক্ষুদ্র শক্তিপিণ্ডটি প্রোটন থেকে প্রোটনের মধ্যে চলা ফেরা ক'রে তাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তাদের কর্তব্য কি। অর্থাৎ অণুর নিউক্লিয়াসে তাদের আটকে থাকতে হবে। এরা নিউট্রনগুলিকেও অনুরূপভাবে অণুর কেন্দ্রে আটকে রাখে। প্রোটনের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ না হয়— এটাও

তারা দেখে। তাদের ব্যবহার একথাই বলতে চায়, যেন নিউট্রন ও প্রোটনের অন্তরেই তাদের বাস— এবং তাদের সঙ্গেই তারা থাকে। আসলে প্রোটন ও নিউট্রনের শাঁস এই পি-মেসন বা পাইয়ন।

কোয়ান্টাম ফিল্ড তত্ত্ব এটাই প্রমাণ করেছে যে, দেশে একটা অনিঃশেষ প্রবাহ শক্তি আছে। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স ও স্ট্রং ফোর্স নিজেদের প্রকাশ করে ত্রিমাত্রিক শক্তিক্ষেত্ররূপে। বস্তু ও শূন্যতার মধ্যে যে পার্থক্য, এই তত্ত্ব তাও অসার প্রমাণ করেছে। আলোর আণবিক সংগঠন আবিষ্কার হবার আগে মনে করা হত যে, ইথার নামক কোন কিছু আছে, যার মধ্য দিয়ে আলো চলাফেরা করে। পরে ধরা পড়ে, আলো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তেজপিণ্ড হিসেবে চলে— যে পিণ্ডকে বলে ফোটন। এই আবিষ্কারের ফলে এবং ইথারের পরিমাপ করার চেষ্টা ব্যর্থ হলে, ইথারের চিন্তা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। এখন এটাই প্রমাণিত হয়েছ যে, দেশে অনিঃশেষপ্রবাহ একটা শক্তিস্রোত আছে। সুতরাং শূন্যতা বলে কিছু নেই। আছে মিথ্যা শূন্যতা (False Vacuum)।

আইনস্টাইন বলেছেন, বস্তু তার চতুর্দিকস্থ দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। দেশে এই যে তেজক্ষেত্র আছে বস্তু হল তারই ঘনীভূত রূপ। সুতরাং নতুন পদার্থবিজ্ঞানের হিসেবে শূন্য বলে কোন জিনিয নেই,— আছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রই এক ধরনের অতি সূক্ষ্ম তেজপ্রবাহ। প্রত্যেকটি জিনিযের মধ্যেও এই তেজপ্রবাহ রয়েছে। প্রাচীন মরমিয়া ঋষিরা এই সূক্ষ্ম তেজপ্রবাহকেই বলতেন আত্মন। বলতেন, বস্তু নানারূপে এই আত্মনেরই প্রকাশ মাত্র। এই আত্মনের মধ্যে একটা মানস সত্তা আছে— বৈজ্ঞানিকেরা এখনও যা স্বীকার করতে রাজি নন। কিন্তু বহু পরমাণুর অস্তিত্ব হচ্ছে শূন্য থেকে। আবার পরস্পর সংঘর্ষের পর শূন্যেই হারিয়ে যাচ্ছে। সব সময়ই মহাদেশে (space) শূন্যতার বুকে একরকম ঘটে চলেছে।

তাহলে এই শূন্যতা কি?

শূন্যতা বলে কিছু নেই। যাকে শূন্যতা বলে মনে হয় তা আসলে গতিময় স্পন্দনযুক্ত এক ধরনের দেশীয় বা ব্যোমিয় শক্তি— যাকে আজও বিজ্ঞানের যন্ত্রে ধরা যায়নি। অণুপরমাণুর মধ্যে তিনটি শক্তিকে ধরা গেছে— ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ফোর্স, স্ট্রং ফোর্স ও উইক ফোর্স (অবক্ষয়ের কারণ)। কিন্তু মাধ্যকর্ষীয় শক্তির বার্তাবহ কোন পরমাণুকে ধরা যায়নি। গ্র্যাভিটন নামক এব ধরনের একটি বার্তাবহ পরমাণুর কল্পনা করা হয়েছে মাত্র, ধরা যায়নি। মানস-শক্তির বাহক এক ধরনের পরমাণুরও কল্পনা করা হয়েছে, কিন্তু পাওয়া যায়নি। অনেকে এ ধরনের পরমাণুর নাম দেবার চেষ্টা করেছেন মিনডোন (Mindon)।

প্রাচীন ঋষিরা তাঁদের সৃষ্টিতত্ত্বে একটা কথাই বার বার বলবার চেষ্টা করেছেন যে, শক্তিক্ষেত্রের মত মানসক্ষেত্র বলেও একটি ক্ষেত্র আছে; যা থেকেই শক্তি নানারূপে বেরিয়ে এসেছে।

প্রাচীন মিশরীয় পুরাণকাহিনীতে এই তেজক্ষেত্রের নাম দেওয়া হয়েছে নুন। কোন কোন কাহিনীতে তাকে বলা হয়েছে টাহ্। নুনের বিস্তার ছিল অসীম। তার না ছিল ঊর্ধ না অধঃ। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আদি সলিলরূপে আচ্ছন্ন করে ছিলেন। অন্যান্য দেবতারা যেমন দৈহিক কার্যকলাপ দ্বারা নানা জিনিষ সৃষ্টি করেছেন—, নুন তা করেন নি। তিনি সৃষ্টি করেছেন ইচ্ছাশক্তির দ্বারা। তাঁর এই আত্মিক শক্তির দ্বারাই তিনি অন্যান্য দেবতাদের সৃষ্টি করেছিলেন। নুনের মধ্যে পুরুষ ও মহিলাত্মিকা শক্তিও এক হয়ে ছিল— যার মধ্যেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু, এমন কি অন্যান্য দেবতারাও ছিলেন। প্রথম তিনি তৈরি করেন HE-SHE-GOD বা নিউট্রন ফিল্ডরূপী আতুম। আতুম হলেন নুনের বস্তুসত্তা রূপে প্রকাশ। ভারতীয় ব্রহ্মা বা প্রকাশতত্ত্বের মত ছিলেন তিনি। নুনকে সেদিক থেকে 'আত্মিক কোয়ান্টাম ফিল্ড' বলা যেতে পারে। অর্থাৎ ভারতীয়দের তিনি ব্রহ্মন-স্বরূপ। ব্রহ্মন শব্দ এসেছে 'বৃহ' অর্থাৎ বৃদ্ধি পাওয়া এই শব্দ থেকে। বহু ভারতীয় শাস্ত্রে ব্রহ্মনকে প্রকাশিতব্য, অপ্রকাশিতব্য, ভিত্তিহীন, সভিত্তিক, সময়, না-সময় ইত্যাদি নানা অভিধাতে সিক্ত করা হয়েছে। তিনিই হলেন সৃষ্টির আদি উপাদান, চিৎসত্তা, আলোর আলো, অদ্বিতীয় ইত্যাদি। তিনি সর্বত্র বিরাজিত, সর্বদ্রষ্টা, সর্বশক্তিমান। তিনি সর্বব্যপ্ত অসীম, সময়হীন, ক্ষুদ্র অপেক্ষা ক্ষুদ্র, বৃহৎ অপেক্ষা বৃহৎ। তিনিই ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সিক্ত করে আছেন। তিনি অমর— বস্তুসত্তা দ্বারা আবরিত হয়ে আছেন। সকল দেবতা তাঁর মধ্যেই স্থিত, তাঁরই উপর নির্ভরশীল। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত অগ্নি একটুকরো খড়ও পুড়াতে পারে না, বায়ু এক গুচ্ছ তৃণও উড়াতে পারেনা। এই যে ব্রহ্মন— তিনি কিন্তু চার্জের দিক থেকে নিরপেক্ষ, পরমাণু প্রতিপরমাণু যখন অবক্ষয়িত হয় তাদের পরিত্যক্ত শক্তি তিনিই গ্রহণ করেন। আবার তাঁর থেকেই অন্যান্য শক্তি নির্গত হয়। এই যে ব্রহ্মন ঃ— বৃহত (বৃহৎ) + মন (মানস) = ব্রহ্মন তাই সৃষ্টির আদি সত্তা। তিনিই আদি মানস শক্তি— যাকে প্রাচীন মরমিয়া ঋষিরা চার্জের দিক থেকে নিরপেক্ষ বলে মনে করেছেন। তাঁর থেকেই আর একটি নিরপেক্ষ বস্তুসত্তা আত্মপ্রকাশ করেছিল— যাকে বিজ্ঞানে বলা হয় নিউট্রন ফিল্ড। ভারতীয় শাস্ত্রে ব্রহ্মনজাত ব্রহ্মা, মিশরে আতুম। সেই নিউট্রন ফিল্ড, ব্রহ্মা বা আতুম এঁরাও হলেন চার্জের দিক থেকে নিরপেক্ষ। নারী ও পুরুষ একত্রে তাঁদের মধ্যে ছিল। সেই জন্য মিশরে আতুমকে বলা হয়েছে HE-SHE-GOD, ভারতে এমন এক দেবতা হলেন অর্ধনারীশ্বর। প্রাচীন আমেরিকার পুরাণ-কাহিনীতে তিনি ওমটিওটল বা সৃষ্টির আদি উপাদান, সর্বোত্তম দেবতা— যাঁর মধ্যে পুরুষ ও মহিলাত্মিকা শক্তি একত্রে যুক্ত হয়ে ছিল। এই কারণেই তিনি ছিলেন বিশ্বডিম্বের মাঝখানে। নিজেকে নিজেই প্রকাশ করেছিলেন। সেই জন্য তাঁর রূপ না দেখিয়ে তাঁর ক্রিয়াশক্তিক্ষমতারূপে শুধুমাত্র হাত আর পা এঁকেই তাঁকে বোঝানো হ'ত। এই ওমটিওটল-এর মধ্যেও এমন সব গুণের প্রকাশ

পেয়েছিল যাকে বলা যায় পরিবর্তনশীলতার মধ্যে চিরন্তনতা, ধ্বংসের মধ্যে অমরত্ব। মৌল পরমাণুগুলি, বিশেষ করে নিউট্রন যেমন ব্যবহার করে ঠিক তেমনই যেন তাঁর ব্যবহার। সুতরাং যিনি যে-নামেই এই শক্তিকে ডাকুন না কেন— মূলতঃ অধ্যাত্মে ও বিজ্ঞানে তিনি একই জিনিষ।

আদি মানস সত্তা ব্রহ্মন (Psychic Mind Field) থেকে এসেছেন ব্রহ্মা (নিউট্রন ফিল্ড)। মিশরে আদি মানস সত্তা বা নুন থেকে এসেছেন আতুম। একটি নিউট্রন ফিল্ড থেকে বেরয় স্বতন্ত্র নিউট্রন সমূহ। সেই নিউট্রন থেকে বেরয় প্রোটন ও ইলেকট্রন। দেশের বুকে এরাই তৈরি করে আণবিক বুনট। ব্রহ্মা থেকে বেরয় স্বতন্ত্র দেবদেবী। তাঁরাই সৃষ্টি করেন অন্যান্য সব কিছু। আতুম থেকে বেরয় শু (proton) ও তেফ্‌নুৎ (ইলেকট্রন)। তাঁরা পরস্পর যুক্ত হয়ে করেন অন্যান্য সৃষ্টি— যেমন প্রোটন ও ইলেকট্রন যুক্ত হয়ে তৈরি করে নানা সৃষ্টির উপাদান। তাহলে নিউট্রন, প্রোটন ও ইলেকট্রনের সঙ্গে ভেদ কোথায়? বিজ্ঞান যে-ভাবে সৃষ্টি সম্পর্কিত ইতিহাস তৈরি হয়েছে, অধ্যাত্ম চিন্তাতেও ভিন্ন নামে সেই একই কথা বলা হয়েছে। বৈজ্ঞানিকের চিন্তা যে-ভাবে বিশ্বরহস্যের গোপন কাহিনী খুঁজে পেয়েছে, ঋষিদের মননও পেয়েছে ঠিক তেমনই। বিজ্ঞানের ভাষা এক রকম, আর ঋষিদের ভাষা আর এক রকম। বিজ্ঞানের হল কোড ল্যাঙ্গুয়েজ, ঋষিদের পুরাণ-কাহিনী। বিজ্ঞানীদের অঙ্ক, ঋষিদের চিন্তার আকৃতি প্রাচীন ভাস্কর্য। $E=mc^2$ যেমন বিরাট বিজ্ঞানের তত্ত্ব প্রকাশ করে, প্রাচীন ভাস্কর্যও তেমনই বিরাট তত্ত্বের কথা সংক্ষেপে বলে। যেমন ত্রিমূর্তির মধ্যে রয়েছে— প্রকাশতত্ত্ব, দেশতত্ত্ব ও গতিতত্ত্ব। আবার একই মূর্তির মধ্যে রয়েছে— এলিফ্যান্টা গুহায় ভিন্ন ভাব। সেখানে একটি অণুর ইতিহাস রয়েছে ত্রিমূর্তির মধ্যে। এই ত্রিমূর্তির মধ্যভাগের মুখ প্রশান্ত, নিরপেক্ষ চার্জ নিউট্রনের মত। ডান দিকের মুখ পুরুষাত্মক— ধনাত্মক চার্জ প্রোটনের মত। বাঁ দিকের মুখ মহিলাত্মক— ঋণাত্মক চার্জ ইলেকট্রনের মত। এই তিনের সমন্বয়েই সৃষ্টি। কেউ কেউ অবশ্য এই তিনমুখের মধ্যে একটিকে দেখেছেন অতীত হিসেবে। যেমন ব্রহ্মা, অতীতে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন। আর একটিকে দেখেছেন বর্তমান হিসেবে যেমন বিষ্ণু (দেশ) যিনি ধারণ করে আছেন। অপরটিকে দেখেছেন ভবিষ্যৎ হিসেবে (শিব) যিনি ভবিষ্যতে সংহার করবেন। কিন্তু এই ভাস্কর্যের যথার্থ বক্তব্য যাই থাক, এতে যে বিজ্ঞানের ইকুয়েশনের মত সংক্ষিপ্ত আকারে বিরাট বক্তব্য রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। যেমন, ভারতীয় কালীমূর্তির মধ্যে রয়েছে— সমগ্র সৃষ্টির ইতিহাস, তার উৎপত্তি, পালন, ভারসাম্য, ধ্বংস, সব কিছুর। সুতরাং ধর্ম যে কুসংস্কারজাত কোন জিনিষ তা নয়। কেউ যদি অধ্যাত্মতার যথার্থ স্বরূপ বুঝতে না পেরে তাকে বিকৃত বলে মনে করেন সেটা তাঁর অজ্ঞতা। কুসংস্কার আসে না বোঝার ফলে। তারই ফলে অকল্যাণ হয়। ধর্মান্ধতা জাগে। বিজ্ঞানের মধ্যে অফুরন্ত কল্যাণের ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু কেউ

যদি সে ইঙ্গিত না ধরে বিজ্ঞানের সাহায্যে মারণাস্ত্র তৈরি করেন তবে তা ধর্মান্ধতারই সামিল হয়। মানুষের মানসিকতার উপরই নির্ভর করে ধর্ম ও বিজ্ঞান উভয়েরই যথার্থ স্থান। জ্ঞানদীপ্ত দৃষ্টিভঙ্গীর উপর উভয়েরই ভূমিকা নির্ভর করে। অসুর আত্মিক শক্তি অর্জন করে ধ্বংসের জন্য। সাধক আত্মিক শক্তি অর্জন করেন কল্যাণের জন্য। উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাষ্ট্রনেতারা বিজ্ঞানকে ব্যবহার করেন বল প্রয়োগের জন্য। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী বলে কোন কথা নেই। কল্যাণের দৃষ্টিভঙ্গীই বড় কথা। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে কেউ করেছেন ব্রহ্মাস্ত্র নির্মাণ, কেউ অর্জন করেছেন মোক্ষ। আণবিক জ্ঞান লাভ করে কেউ তাকে প্রয়োগ করতে চেয়েছেন আণবিক শক্তি হিসেবে— জ্বালানীর অভাবে অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর যা অপরিহার্য প্রয়োজন। কেউ তৈরি করেছেন আণবিক বোমা— যা ডেকে নিয়ে আসবে ধ্বংস। আসলে আত্মিক উন্নতি না হলে কোন জ্ঞানেরই কোন মূল্য নেই। সেই আত্মিক দিকটি ধর্ম স্বীকার করলেও বিজ্ঞান করেনা— এইখানেই বিজ্ঞান অপেক্ষা ধর্ম এক ধাপ উপরে রয়েছে আজও।

বিজ্ঞান ও মরমিয়া ঋষিদের দৃষ্টির মধ্যে কি ধরনের নৈকট্য রয়েছে, Big Bang এবং Big Bang জাত ব্রহ্মাণ্ড বিকাশের ইতিহাস পাঠ করলে ও তার সঙ্গে ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তের বক্তব্য বিচার করে দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যাবে। সেই জন্যই Big Bang ও Big Bang-এর গতিপ্রকৃতির ইতিহাসই আগে আলোচনা করা যাক। শেষ করা যাবে ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তের বঙ্গানুবাদ দিয়ে। পাঠকই তখন বুঝতে পারবেন Big Bang তত্ত্ব ও নাসদীয় সূক্তের সম্পর্ক কি?

Big Bang তত্ত্বের মূল কথা আদিতে মহাশূন্যতার বুকে কোথাও জগতের সকল বস্তুসত্তা ঘনীভূত হয়ে ছিল। আন্তর আকর্ষণে সে ক্রমশঃ নিজের অন্তস্তলে ডুবে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত তা এতই ঘনীভূত হয় যে, সেই চাপ আর সহ্য করতে না পেরে বিস্ফোরিত হয়। তার ফলেই দেশকাল সহ বস্তুজগৎ ফুটে উঠে। ফুটে উঠে ছড়িয়ে পড়ে। সেই বিস্ফোরণের বেগ আজও রয়েছে। আর সেই কারণেই বিশ্ব জগৎ আজও চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। এই জন্যই ভারতীয় শাস্ত্রে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে 'জগৎ' বলা হয়। জগৎ অর্থ যা সম্প্রসারণশীল। যেহেতু এটা সম্প্রসারণশীল, এই জন্য এই জগৎ একদিন সংকুচিতও হবে। যে-কেন্দ্র থেকে এই বিস্ফোরণ ঘটেছিল--- সেই কেন্দ্রেই আবার সে ফিরে যাবে। যে আদিবিন্দু থেকে এই বিস্ফোরণ ঘটেছিল— সেই আদি বিন্দুতে পরিণত হবে। সেই আদি বিন্দুকেই প্রাচীনকালে সবদেশের পুরাণ-কাহিনীতে বিশ্ব-ডিম্ব বলা হ'ত— Primordial Cosmic Egg. কতদিন পর্যন্ত এই বিশ্বডিম্ব আকারে এটা থাকবে? কতদিন আন্তর আকর্ষণে ভেতরের দিকে ডুবতে থাকবে? এবং শেষ পর্যন্ত এমন এক অবস্থায় আসবে যখন আর ভেতরে দিকে অন্তস্থলিত হতে পারবে না? এমন অবস্থা হলেই সে আবার উল্টো দিকে ফিরতে শুরু

করবে? অর্থাৎ বিস্ফোরিত হবে? এ প্রশ্ন আজও হেঁয়ালী হয়ে আছে বিজ্ঞানের কাছে। তা ছাড়া সেই আদি বিন্দুর আকারই বা ছিল কতটুকু তাও কেউ বলতে পারেনা।

সে যাই হোক, বিশ্বের প্রারম্ভের মুখে এই ছিল অবস্থা, এই অবস্থাকে বিজ্ঞানে এখন বলবার চেষ্টা হচ্ছে singularity–অর্থাৎ দ্বিতীয়বিহীন এক অপরিচ্ছিন্ন অবস্থা। এই অবস্থাতে দেশ, কাল, বস্তুসত্তা, শূন্যতা (false vacuum) সবই একত্রে অপরিচ্ছিন্নভাবে গ্রথিত ছিল। পার্থিব কোন শব্দ দ্বারা এই অবস্থার ব্যাখ্যাই করা যায় না। তখন কোন অণু-পরমাণু ও প্রতি-অণুপরমাণুও ছিল না। ছিল না দেশ (space) ও প্রতিদেশ (anti-space)। কোন সত্তাও ছিল না— 'না-সত্তাও' ছিলনা। স্বতন্ত্ররূপে পরিচয় দেওয়া যায়— এমন কোন অস্তিত্বই ছিল না। সেই অব্যক্ত অবস্থা আপন অন্তরের অন্তস্তলে নিজস্ব আবেগে তরঙ্গায়িত ছিল। ঠিক এই অবস্থাটাকেই ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তে বর্ণনা করা হয়েছে এই ভাবে ঃ—

'তখন না ছিল কোন বস্তু না না-বস্তু।
না ছিল পার্থিব জগৎ, না ছিল আকাশ।
তা হলে কি ছিল? কেই বা থাকতেন কোথায়?
শুধুই কি ছিল অতলস্পর্শী সেই আদিম জলরাশি?
তখন না ছিল মৃত্যু, না অমরত্ব।
তখন না ছিল রাত্রি, না দিন বা দিনরাত্রির পার্থক্য।
তখন শুধু ছিল রুদ্ধশ্বাস অচঞ্চল 'এক'।
সেই এক ছাড়া আর কেউ ছিল না।
তখন অন্ধকার ছিল ঘন তমিস্রায় আচ্ছন্ন।'

এবার আবার বিজ্ঞানে ফিরে যাওয়া যাক, বিজ্ঞানের Big Bang-এ। Big Bang হবার পর ঘটনাগুলি এত দ্রুতবেগে ঘটেছিল যে, সেই বেগকে বলা যেতে পারে অন্ধগতি। এবং এই সময় প্রায় দু'মিনিটে যা ঘটেছিল— পরবর্তী এক লক্ষ বছরেও তা ঘটেনি। প্রথম ১/১০০,০০০ মিলিয়ন, মিলিয়ন, মিলিয়ন্থ সেকেণ্ডে Big Bang-এর পর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিধি ছিল একটি অণুর নিউক্লিয়স বা কেন্দ্রস্থলের মত। সেই অতিক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে সমগ্র দেশের বুনট ও সমগ্র শক্তি ছিল দুমড়ানো মোচড়ানো ভাবে বিকৃত।

এই বিস্ফোরণের ১/১,০০০,০০০,০০০ সেকেণ্ডে পরে প্রথম কিছু পরমাণু ও প্রতিপরমাণু ফুটে উঠে। তবে পরস্পরের সঙ্গে সংঘাতে উভয়ে উভয়কে ধ্বংস করে দিয়ে তীব্র তাপ বিচ্ছুরিত করে।

তখন সবই ছিল ছোটাছুটি অবস্থায়, অবিরত পরিবর্তনশীলতার মধ্যে। কোন কিছুই স্থির হয়ে বসেনি, স্থির হয়ে বসবার মত অবস্থাই সৃষ্টি করতে পারেনি।

বিস্ফোরণের প্রথম দু'মিনিটের মধ্যে কোয়ার্ক গঠিত হয়। কোয়ার্ক হল অব-

অণু (sub atomic particle) পর্যায়ে বস্তুসত্তার মৌল উপাদান— যা দিয়ে প্রোটন, নিউট্রন, মেসন ইত্যাদি গঠিত হয়েছে। এই কোয়ার্কগুলি একটু শীতল হলে নিউট্রন, প্রোটন, প্রতি-নিউট্রন, প্রতি-প্রোটন (anti-neutrons anti protons) প্রভৃতি গঠিত হয়। ফোটনও আত্মপ্রকাশ করে— কিন্তু স্থির হয়ে বসার সুযোগ পায়না।

বিস্ফোরণের দু'মিনিটের কাছাকাছি থেকে এক লক্ষ বছর পার হওয়া পর্যন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলে প্লাজমা জাতীয় অবস্থার মধ্য দিয়ে। প্লাজমা হল এক ধরনের উত্তপ্ত গ্যাস জাতীয় জিনিস। এটা এতই উত্তপ্ত অবস্থার মধ্যে ছিল যে, অণু-পরমাণুগুলি তার মধ্যে অন্ধবেগে ঠোকাঠুকি করে মরছিল। সেই ঠোকাঠুকিতে ইলেকট্রনগুলি ছিটকে ছিটকে যাচ্ছিল। ফলে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম জাতীয় অণুও তৈরি করার সময় পায়নি। এ-সময়ে অবস্থা ছিল এই রকম যে, দেশ জোড়া যেন ছিল বৈদ্যুৎ চার্জ সম্পন্ন অণু-পরমাণুর বিশৃঙ্খল সাগর। প্রাচীনরা একেই বলেছেন মহাবিশ্ব-সলিল (Cosmic Water)। এই প্লাজমার অবস্থাতে বিশ্ব ছিল বিরাট দুর্ভেদ্য জ্যোতিস্তর হিসেবে।

বিশ্ব বাড়তে বাড়তে যতই শীতল হতে লাগল গড়ে উঠতে লাগল হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম অণু। বিরাট সংখ্যক নিউট্রন ও প্রোটনের জন্য যত অণুর অস্তিত্ব প্রকাশ পেল তার ৯০% হল হাইড্রোজেন। ৭% হিলিয়াম-জাতীয়। সম্ভবতঃ এই সময়ই দেখা দিয়েছিল— প্রতি-হাইড্রোজেন ও প্রতি-হিলিয়াম অণু (anti-hydrogen ও anti-helium) যার দ্বারাই পরে প্রতি-নক্ষত্র ও প্রতি-ছায়াপথ (anti-stars ও anti-galaxy) গঠিত হয়েছিল। অবশ্য সত্যি সত্যিই এরকম ঘটেছিল কিনা— তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে।

Big Bang-এর ১০০ মিলিয়ন বছর পরে বিশ্বকে আচ্ছন্ন করে ছিল ঘন হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম অণুর মেঘ। এই মেঘের কিছু অংশের মধ্যে সৃষ্টি হয় ঘূর্ণনের আবেগ। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে ছায়াপথ জাতীয় জিনিষ তৈরি হতে থাকে। ২০০ মিলিয়ন বৎসর পরে বিশ্ব আরো শীতল হতে থাকে। আরও অনেক ছায়াপথ তৈরি হতে পারে। শেষ পর্যন্ত Big Bang-এর এক বিলিয়ন বৎসরে পরে আজকে যে ছায়াপথ আমরা দেখি সেই ধরনের ছায়াপথ তৈরি হয়। এই ছায়াপথ থেকেই নক্ষত্র গ্রহাদির জন্ম হয়। সেই গ্রহগুলিতে নানা প্রাণী আত্মপ্রকাশ করে— যাদের মধ্যে রয়েছে আমাদের মত জীব। বিজ্ঞানের মতে এই হল মহাশূন্যতা থেকে সৃষ্টির উদ্ভবের ইতিহাস। এই সৃষ্টি এখনও এগিয়ে চলেছে। আরও দীর্ঘদিন ধরে চলবে। শেষে কেন্দ্রের টানে ফিরে গিয়ে আবার ধ্বংস হয়ে আদি বিন্দুতে গিয়ে অন্তস্তলিত হতে হতে আবার বিস্ফোরিত হবে। এই হল Big Bang ও তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতির কথা।

উপরোক্ত Big Bang-এরই চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন—Masters of Time গ্রন্থে John Boslough (p. 54-55)। তিনি বলেছেন প্রথমে কিছুই

ছিল না। না ছিল কাল, না দেশ। শূন্যতা (false vacuum) বলতে যা বোঝায় তাও ছিল না। ছিল মহাশূন্যতা, 'স্থানহীন এক' অবস্থা। বর্ণ ছিল না, আকৃতি ছিল না। মুহূর্ত ছিল না, অনন্তও ছিল না (অনন্তের ধারণা সময় ছাড়া হয়না বলেই ছিল না)।

এই নির্ভেজাল শূন্যতা থেকে এক বিন্দু বিশৃঙ্খলা ফুটে উঠল। এরই মধ্যে ছিল কাঁচা তেজপূর্ণ এমনই এক বীজ যা কল্পনা করার মত মস্তিষ্ক আজও জন্মগ্রহণ করেনি। এই স্পন্দমান তেজ-বিশৃঙ্খলার মধ্যে অণু-পরমাণু অপেক্ষা ক্ষুদ্র পরিধিতে ছিল দেশ ও কাল। যদিও দেশ ও কালের চিন্তা তখন ছিল অবান্তর। 'এখন, তখন, হবে' এ-সব কিছুই ছিল না। ছিল না— এখানে বা সেখানে বলতে কিছু।

সেই অতিক্ষুদ্র বিশ্ব ছড়াতে আরম্ভ করল। যতই এটি বাড়তে লাগল— ততই শীতল হতে লাগল। ছড়িয়ে পড়তে লাগল-এর তেজ। অপরিচ্ছিন্ন এক শক্তি থেকে অন্যান্য শক্তি পৃথক হয়ে বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গেই এ-অবস্থাতে যারা থাকতে পারে সেই ধরনের অণু-পরমাণু জোড়ায় জোড়ায় বেরিয়ে এসে কেউ বা ফুলকি দিয়ে উঠল, কেউ গেল নিভে। পরস্পর ধ্বংসাত্মক সংঘর্ষের শ্রাবণধারা নামল যেন।

সঙ্গে সঙ্গে শিশুবিশ্ব অব-অণু পর্যায় থেকে তরমুজের মত ফুটে উঠল। সেকেণ্ডের মধ্যে তার আকৃতি হল আমাদের সৌর বিশ্বের মত। একটি নক্ষত্র অপেক্ষাও ঘনবস্তুসত্তা দিয়ে তৈরি একটি বস্তু ও শক্তির কটাহ তৈরি হয়ে গেল। নির্ভেজাল তেজপূর্ণ সেই তরুণ-বিশ্বের সর্বত্র জ্বলে উঠল। এর আকৃতি বাড়ল ও অনেকটা শীতল হল। ছুটন্ত অণু-পরমাণুগুলি পরস্পর মিশে গিয়ে বৃহত্তর হাইড্রোজেন অণু তৈরি করল। সেই অণুপুঞ্জ তৈরি করল স্ফীত গ্যাসের প্রকাণ্ড ঘূর্ণাবর্ত। যুগের পর যুগ কেটে গেল। বিশ্ব বৃহত্তর হল। এর দীপ্ত অগ্নি অন্ধকারে ডুবে গেল। কোটি কোটি বছর এল গেল। সেই ঘূর্ণায়মান মেঘ থেকে কোটি কোটি নক্ষত্র বেরিয়ে এল। দেখা দিল ছায়াপথ। এল আরও নক্ষত্র, অন্যান্য বিশ্ব, পৃথিবী, মানুষ।'

এই সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ইতিহাস জানার পর এবার নাসদীয় সূক্তের সমগ্র বঙ্গানুবাদটি পড়া থাক :

'তখন (সৃষ্টির পূর্বে) না ছিল কোন বস্তু না না-বস্তু।
না ছিল পার্থিব জগৎ, না ছিল আকাশ।
তা হলে কি ছিল? কেইবা থাকতেন কোথায়?
শুধু কি ছিল অতলস্পর্শী সেই আদিম জলরাশি?
তখন না ছিল মৃত্যু, না অমরত্ব।
না ছিল রাত্রি, না দিন বা দিনরাত্রির পার্থক্য।
তখন ছিল শুধু রুদ্ধশ্বাস অচঞ্চল 'এক'।

সেই 'এক' ছাড়া আর কেউ ছিল না।
তখন অন্ধকার ছিল ঘনতমিস্রায় আচ্ছন্ন।
অবিচ্ছিন্ন আদিম বারিতে আচ্ছন্ন ছিল সব।
যা ছিল সবই ছিল মায়াচ্ছন্ন।
তার মধ্য থেকে সৃষ্টি প্রকাশিত হল (ইচ্ছার) উত্তাপে।
সেই মহামানসে প্রথম দেখা দিল ইচ্ছা এবং
সেই ইচ্ছাই মহামানস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এল বীজের আকারে।
সত্যদ্রষ্টা কবিরা অনুভবের মধ্যে সেই অপ্রকাশ থেকে
দেখতে পেলেন প্রকাশ।
সৃষ্টির যে আলো প্রকাশিত হল সেটা কোথায় দেখা দিয়েছিল
প্রথম? নিম্নে বা ঊর্ধ্বে?
ছিল বীজ বহনকারীরা। ছিল শক্তি। স্বয়ংক্রিয় শক্তি নিচে
এবং ইচ্ছা ঊর্ধ্বে।
সেই প্রথম প্রকাশকে কে দেখেছিল? কেই বা সেকথা
জানিয়েছে?
কোথাইবা এই সৃষ্টি প্রকাশিত হয়েছিল?
দেবতার উৎপত্তি এই সৃষ্টিরও পরে। কে তবে বললেন
কোথা থেকে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি?
যাঁর থেকে এই সৃষ্টি— তিনি নিজে কি সৃষ্টি করেছিলেন বা
করেন নি?
দ্যুলোকের সেই সর্বোত্তম স্রষ্টা—
একমাত্র তিনিই জানেন (এর উত্তর) কিংবা
তিনিও জানেন না?'

সত্যিই তো বিচার বিশ্লেষী মন দিয়ে কেউ আজও এই সৃষ্টি রহস্যের যথার্থ জবাব পাননি। Big Bangই যে সৃষ্টির কারণ সম্পর্কে যথার্থ ব্যাখ্যা বিজ্ঞান নিঃসন্দেহে তা বলতে পারেনি। মরমিয়া ঋষিরা মর্মে অনুভব করে এর জবাব পেয়েছিলেন। তাঁদের সেই জবাব বা সৃষ্টি বর্ণনা Big Bang তত্ত্বের সঙ্গে প্রায় মিলে যায়। সৃষ্টির আবর্তিক চরিত্রের কথা তাঁরা বলেছেন— অর্থাৎ সৃষ্টি যখন হয়েছে একদিন আবার তা ধ্বংস হবেই। সৃষ্টির সমগ্র ইতিহাস ভারতীয় ভাস্করেরা নটরাজ বা মা কালীর মত মূর্তির মধ্যে ধরে রেখেছেন। কিন্তু তবু আমাদের বিশ্বাস কই?

Big Bang তত্ত্ব যদি মানতে হয়— তবু প্রশ্ন জাগে— যদি মহাদেশের কোন স্থানে ঘনীভূত বস্তুসত্তার অন্তস্থলীয় আকর্ষণের প্রবল চাপ সহ্য করতে না পেরে তা ফেটে গিয়ে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ পায়, তবে সেই কেন্দ্রীভূত বস্তুসত্তা এসেছিল কোথা থেকে। তা হলে সৃষ্টির পূর্বেও বস্তুসত্তা ছিল বলে ধরে নিতে

হয়। তাই যদি হয় তবে সৃষ্টির আদি উপাদান কারো সৃষ্ট নয়, তা স্বত বিদ্যমান। এই জন্যই ভারতবর্ষে সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতিতত্ত্ব এসেছে। প্রকৃতি যদি জড় হয় তাহলে সেই প্রকৃতি ঘনসংবদ্ধ হন কি ভাবে? পুরুষের চরিত্র কি? সেকি মহাশূন্যতা? মহাশূন্যতার কি মন বা প্রাণ আছে? সেই মনের আকর্ষণে প্রকৃতিকে সে এক কেন্দ্রে এনে ঘনসংবদ্ধ করেছিল? মরমিয়ারা স্বীকার করলেও বিজ্ঞানীরা শূন্যতার মধ্যে মনের উপস্থিতির কথা স্বীকার করবেন না। আবার মরমিয়ারা সংখ্যের দ্বৈতবাদের তত্ত্ব অস্বীকার করে অদ্বৈতবাদের কথা বলবেন— 'একই বহু হয়েছিল'। 'এক' অরূপ থেকে কিভাবে রূপবান হলেন, অবস্তুসত্তা থেকে কিভাবে বস্তুসত্তা সৃষ্টি করলেন— এ ধাঁধার জবাব নেই। তবে এখন বিজ্ঞান দেখছি পদার্থের আদি উপাদান 'মন' এই কথা স্বীকার করতে চায়। জগৎ মানস উপাদানে তৈরি— বিজ্ঞান এ-কথাই বলছে। জড় পদার্থ বলে যা দেখা যাচ্ছে আসলে মূলে তার কোন পদার্থিক সত্তাই নেই, রয়েছে তেজ মাত্র—$E=mc^2$. সেই তেজও আদি উপাদান নয়। সেও এসেছে মহাশূন্যতা থেকে। বিজ্ঞান এই সব মরমিয়া ধরনের কথাকেই আজ স্বীকার করে।

জগতের পদার্থিক সত্তার আদিতে যদি কোন পদার্থিক উপাদান নাই থাকে— তাহলে পদার্থিক সত্য বলে যা আমরা দেখছি— সবই তো ভ্রান্তি মাত্র। এই ভ্রান্তিকেই বলে মায়া— যা থেকে এসেছে শঙ্করের মায়াবাদ। যা দেখছি তা আসলে ভ্রান্তি মাত্র। আসলে কিছুই নেই একমাত্র শূন্যতা ছাড়া। এই জন্যই বৌদ্ধ তাত্ত্বিক নাগার্জুন শূন্যতাবাদের সৃষ্টি করেছিলেন।

তাহলে আমরা কে? জগতের যে জড় পদার্থ আমরা তাকে দেখি, শূন্যতা বলতে যা বোঝায়— আমরা তা বুঝি। শূন্যতাই যদি সব হয় তাহলে শূন্যতার বুকে এই জগৎরূপ ছবিই বা কেন? ভারতীয় বৈষ্ণবেরা এর জবাব দিয়েছেন এই ভাবে : একমাত্র সত্য ভগবান বিষ্ণু। আর কিছু নেই। 'আর কিছু' বলে যা প্রতীয়মান হচ্ছে— তা তাঁর স্বপ্ন মাত্র। আমাদের স্বপ্নে যেমন স্বপ্নের এক জগৎ আমরা দেখি, তাতে হাসি, খেলি, কথা বলি, তেমনই ভগবান বিষ্ণুর স্বপ্নে আমরা অভিনয় করছি। আসলে আমাদের কোন অস্তিত্বই নেই। কিছুই নেই, সবই স্বপ্ন মাত্র। মায়া।

কিন্তু স্বপ্নেরও একটা উপাদান আছে। যত কিংভূতকিমাকারই হোক না কেন স্বপ্ন, তা অভিজ্ঞতা দ্বারাই সৃষ্ট। এই সব অভিজ্ঞতাগুলোকে বলা যেতে পারে ছদ্মবেশী অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতার বাইরে স্বপ্ন নেই। নানা ধরনের ছবির মধ্য দিয়ে স্বপ্ন তার বক্তব্য রাখে। স্বপ্ন বিশ্লেষণ করলে স্বপ্নের এই উপাদানগুলি খুঁজে পাওয়া যায়। ভগবান বিষ্ণু যদি সৃষ্টিরও আগে হন— তাহলে তিনি তাঁর স্বপ্নের উপাদান পেলেন কিভাবে? এ-সব প্রশ্নের জবাব নেই। নেই বিজ্ঞানে, নেই পরাবিজ্ঞানে। উপনিষদ তাই বলেছে : Keep mum.

অলৌকিক ঘটনার লৌকিক ব্যাখ্যা

প্রত্যেক দেশের পূরাণ-কাহিনীতেই এমন অনেক ঘটনা আছে যেগুলি বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে কখনও মিলতে চায় না। কিছু কিছু ঘটনার— যেগুলির মধ্যে আত্মিক উপাদান রয়েছে—সেগুলিকে আপাত দৃষ্টিতে অবিশ্বাস্য এবং হেঁয়ালী বলে মনে হলেও—ইদানিং বৈজ্ঞানিকভাবে চর্চা করে তার অনেকগুলির জবাব পাওয়া গেছে। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে ঘরে বসে কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনের যে বর্ণনা দিয়েছিলেন আপাতদৃষ্টিতে তা অবিশ্বাস্য মনে হলেও— অধিমনোবিজ্ঞান চর্চা করে ফলিত বিজ্ঞানের মতই তার জবাব পাওয়া গেছে। দেখা গেছে ESP বা অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা বলে একটি ক্ষমতা আছে—যার সাহায্যে দূরদৃষ্টি হয়, দূরশ্রবণ হয়, এমন কি ভবিষ্যৎ দর্শন পর্যন্ত হয়। আত্মিক চিকিৎসকেরা যে স্পর্শ দ্বারা বা মনের শক্তি প্রয়োগ দ্বারা বড় বড় রোগ সারানো, আধুনিক কালে জীবের চতুর্দিকস্থ বায়ো-প্লাজমিক দেহ আবিষ্কার হবার ফলে তার রহস্যও উদঘাটিত হয়েছে। রোগের লক্ষণগুলি বায়োপ্লাজমিক দেহের নানা স্থানে ক্ষত সৃষ্টি করে। বর্ণের অবক্ষয় ঘটায়। আত্মিক চিকিৎসকরা নিজের দেহের বায়োপ্লাজমা প্রয়োগ করে রুগীর দেহের দুর্বল হয়ে যাওয়া বায়োপ্লাজমার স্থানটিকে পূরণ করেন। ফলে রুগী ভাল হয়ে যায়। দেহের এই বায়োপ্লাজমার সঙ্গে দেহের অভ্যন্তরেরও নিবিড় সংযোগ রয়ে গেছে। বায়োপ্লাজমা পুনরুজ্জীবিত হলে দেহের অভ্যন্তরস্থ রোগও সেরে যায়। মানসিক অবসাদ বা দুর্বলতার প্রকাশও এই বায়োপ্লাজমাকে বিকৃত ও দুর্বল করে তোলে। সুতরাং সেই বায়োপ্লাজমাকে সুস্থ করা গেলে মানসিক অবসাদ বা রোগও সেরে যায়।

অপরপক্ষে অনেক সূক্ষ্ম দৃষ্টিরও উৎস খুঁজে পাওয়া গেছে। বহু অভিজ্ঞতা আছে যে-গুলি উচ্চমাত্রার অভিজ্ঞতা। আমরা ত্রিমাত্রিক জগতে ত্রিমাত্রিক জীব। ত্রিমাত্রার মধ্যে ঘটিত সব ঘটনাই আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে আসে। বহু মাত্রীয় ঘটনা ঘটলে আমরা তা বুঝতে পারি না। দ্বিমাত্রিক জীবের ঘরে ত্রিমাত্রিক কোন জীব ঢুকলে দ্বিমাত্রিক জীব যেমন কখনই তার পূর্ণ রূপ বুঝতে পারবেনা, তেমনই আমাদের মত ত্রিমাত্রিক জীবের ঘরে পঞ্চম বা ষষ্ঠ মাত্রার বা তারও অপেক্ষা বেশি মাত্রার জীব ঢুকলে আমরা তাকে আসল রূপে দেখতে পাব না। দ্বিমাত্রিক জীবের ঘরে আমরা কোন আঙুল ঢুকিয়ে দিলে সেই দ্বিমাত্রিক জীব বৃত্তাকার জিনিস দেখবে। তেমনই অধিক মাত্রার কোন জীব আমাদের ঘরে তার আঙুল ঢুকিয়ে দিলে আমরাও হয়তো গোল একতাল মাংসই দেখতে পাব আর কিছুই নয়। দ্বিমাত্রিক জীব আমাদের পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিতে নিতে পারবে না, কারণ তার বেধ নেই। ফলে উর্ধ্ব ও অধঃ বলতে যে জ্ঞান সেটা তার নেই। সেই জন্যই তার ঘরে আমাদের একটা আঙুল ঢুকিয়ে দিলে সে হয়তো দীর্ঘ আঙুলটিকে চাক্তির মত কিছু দেখবে। আমরা কিন্তু দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ থাকার জন্য দ্বিমাত্রিক

চতুষ্কোণ জীবের অভ্যন্তর ভাগ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখতে পাব। তেমনই বহুমাত্রিক কোন জীব আমাদের দেহের অভ্যন্তর ভাগ স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে।

সাধারণ একটা উদাহরণ দিলেই উচ্চমাত্রার ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। ধরুন একটা খালি জমির চারদিকে উঁচু দেয়াল। উল্টো দিকে বা পাশের দেয়ালের আড়ালে একটি কুকুর দাঁড়িয়ে আছে। সামনে দাঁড়িয়ে কুকুরটিকে দেখতে পাওয়া যাবে না। কিন্তু দেয়ালের উপরে দাঁড়ালে চারদিক দেখা যাবে। কুকুরটিকেও দেখতে পাওয়া যাবে। এই যে ঊর্ধ্ব অবস্থান, এইই হল উচ্চমাত্রার অধিষ্ঠান। দেহের প্রাণশক্তির মাত্রা বৃদ্ধি পেলে —অর্থাৎ কুলকুণ্ডলিনীর দ্বারা clan vital-এর শক্তি বৃদ্ধি পেলে, ভ্রূমধ্যে পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ড জাগ্রত হলে, মানুষের দূরদৃষ্টি হয়, দূরশ্রবণ হয়। সে সূক্ষ্ম ক্ষমতা অর্জন করে। অর্থাৎ তাঁর নিজের মধ্যেই সে বহুমাত্রিক শক্তি অর্জন করে। ফলে বহুমাত্রিক নানা কিছুই তার নজরে পড়ে। এঁরাই সাধক। এঁদের মরমিয়া দর্শনজাত অভিজ্ঞতাই নানা দেশের নানা অধ্যাত্ম শাস্ত্রে বিবৃত হয়েছে। এঁদের দর্শনের ব্যাখ্যা বিজ্ঞান কিছুটা দিতে পারে। তবে মরমিয়া দর্শন না হলে এঁদের অভিজ্ঞতার স্বরূপ সবটা বোঝা যায় না।

কিছু কিছু ঘটনা পুরাণ কাহিনীতে আছে, সেগুলিকে আপাত দৃষ্টিতে আজগুবি বলে মনে হয়। হয় সেগুলি অভিজ্ঞতার প্রতীকী রূপ, নয়তো কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতাই অলৌকিক হিসাবে বর্ণিত। এমনই অনেক কাহিনী পৃথিবীর সব দেশেই আছে। মিশরের মোজেস-এর কাহিনীও তেমনই এক কাহিনী। মোজেস-এর প্রচণ্ড আত্মিক শক্তি ছিল। তবে এমন কিছু কিছু ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটেছে যেগুলি হয়তো প্রাকৃতিক কোন ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, যেমন, য়িহুদীদের নিয়ে লোহিত সাগর পার হয়ে যাওয়া। ঘটনাটি এমনই প্রতীয়মান যে, মনে হতে পারে তিনি ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে লোহিত সাগরকে দু'ভাগে ভাগ করে-- তা পার হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু অনেক বিজ্ঞানী এখন এই ঘটনার পেছনে প্রাকৃতিক ঘটনাকেই দায়ী মনে করেন।

১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে ইমান্যুয়েল ভেলিকোভ্স্কি—Worlds In Collision বলে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি মনে করেন যে, বৃহস্পতি গ্রহের মধ্য থেকে কোন রকমে গ্রহীয় উপাদান নিয়ে ধূমকেতু জাতীয় জিনিসের সৃষ্টি হয়। আজ থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর আগে সৌর বৃত্তের মধ্যে এর অনুপ্রবেশ ঘটে— এবং বার বার পৃথিবী ও মঙ্গল গ্রহের সঙ্গে এর সংঘাত ঘটে। এরকম একটি সংঘর্ষের ফলেই লোহিত সাগরের জল দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিল এবং সেই সুযোগেই মোজেস য়িহুদীদের নিয়ে ফ্যারাওয়ের হাত থেকে বাঁচার জন্য লোহিত সাগর পার হয়ে গিয়েছিলেন। এই সময় পৃথিবী আপন অক্ষরেখায় ঘূর্ণন কিছুক্ষণের জন্য থামিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। এরই ফলে প্রচণ্ড আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণ হয়েছিল— এবং পৃথিবীতে প্লাবন দেখা দিয়েছিল। যে ধূমকেতুটি লোহিত সাগরের জল দু'ভাগ করে দিয়েছিল সেটাই পরে শুক্রগ্রহে পরিণত হয়েছে বলে

ভেলিকোভ্স্কি মনে করেন। এই ঘটনার আগে শুক্রগ্রহের কোন অস্তিত্ব ছিল না। তবে এরকম ঘটনার সম্ভাবনা থাকলেও বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, বৃহস্পতির মধ্যে এমন কোন উপাদান নেই যা থেকে এই ধরনের কোন ধুমকেতু সৃষ্টি হতে পারে। শুক্রগ্রহ হল প্রস্তরময় ধাতব গ্রহ। হাইড্রোজেন এখানে কম। জুপিটার বা বৃহস্পতি গ্রহ হাইড্রোজেন দিয়েই তৈরি। ধুমকেতু তৈরি করার মত কোন শক্তি বৃহস্পতি গ্রহের উপাদানের মধ্যে নেই। তা ছাড়া পৃথিবীর কাছ দিয়ে গেলেও পৃথিবীর অক্ষরেখীয় ঘুর্ণন এটা বন্ধ করতে পারবে না। তাছাড়া ৩৫০০ বছর আগে পৃথিবীতে আগ্নেয়গিরির ভয়াবহ উদ্গীরণের কাহিনীও তেমন নেই। শুক্রগ্রহের অস্তিত্ব যে উক্ত ঘটনার আগেই ছিল মেসোপটেমিয় উৎকীর্ণ লিপিতে এই গ্রহটির উল্লেখ থাকাতে তা বোঝা যায়। আসলে শুক্রগ্রহ সৌরমণ্ডলের অন্যান্য গ্রহের সঙ্গেই সৃষ্ট হয়েছিল বলে মনে হয়। সুতরাং শুক্রগ্রহ সৃষ্টিকারী কোন ধূমকেতু দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয়ে লোহিত সাগর দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এমন মনে হয় না। তবে প্রাকৃতিক কোন ঘটনা এমনটা ঘটাতে যে না পারে তা নয়। এ-ধরনের ঘটনার একটা প্রাকৃতিক ব্যাখ্যাও থাকতে পারে। সেই জন্যই এডমান্ড হ্যালি— যিনি হ্যালির ধূমকেতু আবিষ্কার করেছিলেন তিনি মনে করেন যে, ওল্ড টেস্টামেন্টে নোয়ার সময় মহাপ্লাবনের যে গল্প আছে তা কোন ধূমকেতু জাতীয় কোন কিছুর পৃথিবীকে আঘাত করার জন্যই হয়েছিল।

ভারতবর্ষে মহাভারতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় এরকম একটি কাহিনীর বিবরণ আছে— যাকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীয় কোন ঘটনা বলেই ধরা যেতে পারে। ঘটনাটি হল জয়দ্রথ বধের কাহিনী। দ্রোণাচার্য চক্রব্যূহ রচনা করলেন। অর্জুন সংসপ্তক বাহিনী দ্বারা আমন্ত্রণ লাভ করে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে দূরে সরে গেলেন। অর্জুন ছাড়া অন্য কোন পাণ্ডব চক্রব্যূহে প্রবেশের কৌশল জানতেন না। জানতেন অর্জুনপুত্র অভিমন্যু। কিন্তু তিনি সেই ব্যূহ থেকে নির্গমণের পথ জানতেন না। পাণ্ডবেরা তাঁকে ব্যূহ ভেদ করে ভেতরে ঢুকতে বললেন। ভাবলেন ব্যূহের দুয়ার খুলে গেলে তাঁরাও ভেতরে ঢুকে যাবেন। কিন্তু সিন্ধুনরেশ জয়দ্রথ শিবের বরে অজেয় হয়ে ব্যূহের মুখ রক্ষা করছিলেন। সেদিন তিনি অর্জুন বাদে অন্যান্য পাণ্ডবকে পরাজিত করার বর পেয়েছিলেন। সুতরাং অভিমন্যু চক্রব্যূহ ভেদ করে ভেতরে ঢুকলেও— আর চার পাণ্ডব পারলেন না। অভিমন্যু একা ভেতরে সপ্তরথি পরিবৃত হয়ে নিহত হলেন। ফিরে এসে অর্জুন সংবাদ পেয়ে ক্রুদ্ধ হলেন। যখন জানতে পারলেন যে, জয়দ্রথের জন্যই অন্যান্য পাণ্ডবেরা ভেতরে ঢুকতে পারেননি, তিনি প্রতিজ্ঞা করে বসলেন যে; পরদিন সূর্যাস্তের আগে যদি জয়দ্রথকে বধ করতে না পারেন তাহলে অগ্নিতে আত্মাহুতি দেবেন।

পরদিন দ্রোণাচার্য এমন করে ব্যূহ রচনা করে জয়দ্রথকে লুকিয়ে রাখলেন যে, সারাদিন যুদ্ধ করেও জয়দ্রথের কাছে তিনি যেতে পারলেন না। সূর্য অস্ত

গেল। চিতার অগ্নি জ্বালানো হল অর্জুন আত্মাহুতি দেবেন বলে। জয়দ্রথ গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে এলেন অর্জুনের আত্মাহুতি দেখবেন বলে। হঠাৎ এমন সময় সূর্য আবার উঁকি দিয়ে উঠল। অর্জুন জয়দ্রথকে সামনে পেয়ে বধ করলেন। ভক্তজনের ধারণা,— এই অসম্ভব কাজটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ করেছিলেন। তাঁর অলৌকিক ক্ষমতাবলে তিনি সব কিছু করতে পারতেন। এ সবই তাঁরই ইচ্ছায় হয়েছিল। একে বলা যেতে পারে mass hypnotism. সূর্য ডোবেনি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে নিজের ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে ডুবন্ত প্রতীয়মান করেছিলেন। আবার সময় এলেই তাকে দৃষ্টি আচ্ছন্নকারী অন্ধকার থেকে মুক্ত করেন।

ভক্তজনের কথায়—ঈশ্বরের ইচ্ছায় সবই সম্ভব। পঙ্গুকে তিনি গিরি লঙ্ঘন করাতে পারেন, অন্ধকে দেখবার ক্ষমতা দিতে পারেন, মূক্কে মুখর করতে পারেন। ঘটনাটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক শক্তিবলেই ঘটেছিল।

কিন্তু যাঁরা বিজ্ঞানমনস্ক, সব কিছুর পেছনেই একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য কারণ থাকবে বলে মনে করেন, তাঁরা অলৌকিক ভাবে ঘটনাটিকে নিতে রাজি নন। তাঁদের মতে নিশ্চয়ই এটা প্রাকৃত কোন কারণেই ঘটেছিল। সেই কারণ একমাত্র সূর্যগ্রহণের ফলেই ঘটতে পারে। পূর্ণ সূর্যগ্রাস হলে মধ্যদিনে অন্ধকার রাত্রি নেমে আসতে পারে। একালের মানুষ যাঁরা, তাদের এ ধরনের অভিজ্ঞতা আছে। আবার রাহুমুক্ত হলেই সূর্য আত্মপ্রকাশ করে। প্রাচীনকালের মানুষ সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে তেমন ওয়াকিবহাল ছিল না বলেই একে অলৌকিক কোন ঘটনা বলে মনে করেছিলেন। সম্ভবত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় এমনই কোন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল।

ইতিহাসে এরকম ঘটনার অভাব নেই। খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে পারশ্যের মিডিদের সঙ্গে লিডিয়ার যুদ্ধ বাধে। ছ'বছর ব্যাপী এই যুদ্ধ চলে। ষষ্ঠ বছরে যুদ্ধের সময় হঠাৎ মধ্যদিনে রাত্রির অন্ধকার নেমে আসে। এই ঘটনা যুদ্ধমান উভয় পক্ষকেই এমন চম্‌কে দেয় যে, তারা অস্ত্রত্যাগ করে এবং যুদ্ধ বন্ধ ক'রে শান্তি স্থাপন করে। তবে সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে যে এ-সময় কোন ধারণা ছিল না তা নয়। মিলেটাস-এর থেল্‌স এই সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে গ্রীকদের সচেতন করে দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষেও এই সময় জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত ধারণা ছিল না তাতো নয়। তখনকার ভারতীয়রা কি সেকথা জানতেন না? ঋগ্বেদ পাঠ করলে বোঝা যায়— ভারতীয়রা বহু প্রাচীন কাল থেকেই আকাশে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতিবিধি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। নক্ষত্র সমূহের সমাবেশের উপর তাঁরা প্রতীকীরূপে ঋগ্বেদের সূক্তও রচনা করেচিলেন। ঋগ্বেদের রচনাকাল কমপক্ষে খ্রীস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে। কিন্তু একদল জ্যোতির্বিদের মতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল খ্রীস্টপূর্ব ২৪৪৯ অব্দে। তবে আর এক দলের মতে এই যুদ্ধ হয়েছিল খ্রীস্টপূর্ব ১৪১৪ অব্দে। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে মহাকাব্যের যুগ আরম্ভ হয়েছিল বৈদিক সাহিত্যের পরে ও বৌদ্ধযুগের আগে। সূত্র সাহিত্য যখন আরম্ভ হয়েছিল তখনই মহাকাব্য লেখা হয়। পার্গিটারের মতে মহাভারতের যুদ্ধ

হয়েছিল ৯৫০ খ্রীমস্টপূর্বাব্দে। এটা সম্ভব, কারণ সূত্র-সাহিত্যের মধ্যে আশ্বলায়নের গৃহ্যসূত্রে এবং পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে মহাভারতের উল্লেখ আছে। গোল্ডস্টাকার ও আর. জি-ভাণ্ডারকরের মতে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী খ্রীস্টপূর্ব ৭০০ অব্দে রচিত হয়। কিন্তু ম্যাক্‌ডোনেলের মতে পাণিনি খ্রীস্টপূর্ব ৩৫০ অব্দের লোক। এই দুই অভিমতের সমন্বয় করতে গিয়ে বলা চলে যে, খ্রীস্টপূর্ব ৫০০ অব্দের ঠিক পরেই পাণিনি জীবিত ছিলেন। সুতরাং মহাভারত খ্রীস্টপূর্ব ৭০০ অব্দের আগে রচিত হতে পারে। কিন্তু ঐতিহাসিক রোমিলা থাপারের মতে রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনা খ্রীস্টপূর্ব ৮০০ অব্দ থেকে ৭০০ অব্দের মধ্যে ঘটে থাকবে। হস্তিনাপুরে খনন কার্যের ফলে যে প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য পাওয়া গেছে, তাতে ধারণা খ্রীস্টপূর্ব ৯০০ অব্দ নাগাদ মহাভারতের যুদ্ধ হয়েছিল।

ভারতবর্ষের বৈদিক সাহিত্য বিচার করে দেখতে হবে যে, ঐ সময় সূর্যগ্রহণ জাতীয় কোন ঘটনার ইঙ্গিত পাওয়া যায় কিনা। তাহলেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই অলৌকিক কাহিনীর লৌকিক ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে। না হলে অতীন্দ্রিয় ঘটনার স্বরূপ আরো বেশি করে বৈজ্ঞানিক ভাবে আবিষ্কৃত হলে তবেই এর যথার্থ চরিত্র জানা যাবে। এখন কোয়ান্টাম ফিজিক্স যেভাবে মরমিয়া অভিজ্ঞতাগুলির স্বরূপ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মধ্যে ধরে দিচ্ছে তাতে অবিশ্বাস্য বলে তো আর কিছুই থাকছে না!

এই ধরনের লৌকিকতার ইঙ্গিত ঋগ্বেদের বহু সূক্তের মধ্যেও পাওয়া যায়। অশ্বিদ্বয়ের মধ্যে পার্থিব ও অপার্থিব নানা ভাব ব্যক্ত হয়েছে। অশ্বিদ্বয় প্রসঙ্গে সমুদ্র ও জাহাজের যে চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে তার বিবিধ অর্থ রয়েছে। যেমন দেশীয় সমুদ্র ও দেশীয় জাহাজ হল cosmic ocean ও cosmic ship- অপর পক্ষে অশ্বিদ্বয়ের জ্যোতির্বিদ্যাবিষয়ক ইঙ্গিতও আছে। অশ্বিদ্বয় সম্ভবতঃ অশ্বিনী নক্ষত্রের নিয়ন্ত্রক। তার সঙ্গে যুক্ত অশ্বমস্তক দ্বারা সম্ভবতঃ অয়নান্তে সূর্যের প্রত্যাগমন বোঝায়। এতে অন্ধকারের উপর আলোর জয় সূচিত হয়। ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের ৭১ নং সূক্তের ৫নং শ্লোকে বর্ণনা আছে, :—

'যুবং চ্যবানং জরসোহমুমুক্তং নি পেদব ঊহথুরাশুমশ্বম।
নিরংহসস্তমসঃ স্মর্তমত্রিং নি জাহুষং শিথিরে ধাতমন্তঃ।।৫

অর্থাৎ তোমরা চ্যবনকে জরা থেকে মুক্ত করেছিলেন, পেদুর জন্য যুদ্ধে দ্রুতগামী অশ্ব প্রেরণ করেছিলে। অত্রিকে পাপ ও অন্ধকার থেকে পার করেছিলে। চ্যবনের জরামুক্তি দ্বারা এখানে সূর্যের মকরক্রান্তি থেকে অব্যাহতি বোঝাচ্ছে। এখানে পেদুকে যে শ্বেত অশ্ব দেওয়া হচ্ছে তা দ্বারা সূর্যকেই বোঝাচ্ছে।

ইন্দ্রের সঙ্গে বৃত্তের যে সংঘর্ষ তার মধ্যেও অনেকে প্রাকৃত ঘটনারই ছায়া খুঁজে পান। বৃত্তের সঙ্গে তাঁর সংগ্রামে দেখা যায়,— মানুষের জন্য জল ধারাকে তিনি মুক্ত করছেন। মেঘের আড়াল থেকে সূর্যের আলোকে মুক্ত করছেন। সেই জন্য ডঃ রাধাকৃষ্ণন কৃষ্ণসর্পরূপী বৃত্রাসুরকে ঘনকৃষ্ণ মৌসুমী মেঘ বলে মনে

করেছেন। James Hasting Edt. Encyclopaedia of Religion and Ethics গ্রন্থের অষ্টমখণ্ডের ৬০ পৃষ্ঠায় এই বৃত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এই বৃত্র হল শীতের আকাশের মেঘ —যে আকাশের মেঘে আর্দ্রতা থাকেনা। নদনদীর উৎস পর্বতশৃঙ্গের তুষারে বরফাবৃত হয়ে থাকে। ডি. ডি. কোশাম্বির মতে ইন্দ্র হলেন একজন আর্য দলপতি যিনি সিন্ধু অঞ্চলে অনার্যদের পরাজিত করে সিন্ধুনদের বাঁধগুলিকে ভেঙে জলধারাকে মুক্ত করেছিলেন। বৃত্র হল বাঁধ।

প্রাকৃবৈদিক সিন্ধুর অধিবাসীরা সিন্ধুনদে বাঁধ দিয়ে জলধারার সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরে পলিমাটি নিয়ে গিয়ে জমি উর্বরা করতেন। তারা লাঙলের সাহায্যে জমি চাষ না করে নাঙ্‌লার (Harrow) সাহায্যে জমি কর্ষণ করতেন। আর্যরা এই বাঁধ ভেঙে দেওয়াতে সিন্ধুর উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। প্রাগার্য সিন্ধু-সভ্যতার পতন হয়। সিন্ধুর অধিবাসীরা নগরসভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন। ইন্দ্র সেই নগর বা পুর ধ্বংস করে পুরন্দর উপাধি পেয়েছিলেন। কেউ কেউ ইন্দ্রকে আর্য-প্রধান কোন বড় সেনাপতি বলে মনে করেছেন। সেই জন্যই তিনি দেবতার মর্যাদা পেয়েছিলেন। তিনি বহু যুদ্ধে অনার্যদের পরাজিত করে আর্য জগৎকে নিরাপদ করেছিলেন। এই জন্য তাঁকে কৃষ্ণবর্ণদের ধ্বংস করার কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁর এই উপাধি 'শক্র' অর্থও বলশালী।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে প্রজাপতিকে নিয়ে যে গল্প আছে তার অন্তরালে জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক অভিজ্ঞতা কাজ করছে বলে অনেকে মনে করেন। গল্পটি এই ধরনের :

প্রজাপতি (বৃষপ্রভূ) নিজের কন্যার প্রতি আকর্ষণ বোধ করলেন। কারো কারো মতে এই কন্যা আকাশ, কারো মতে উষা। উষা ছিলেন হরিণীর আকারে। প্রজাপতি তাঁকে হরিণ হয়ে অনুসরণ করলেন। দেবতারা দেখলেন, এ পর্যন্ত যা হয়নি প্রজাপতি তাই করতে যাচ্ছেন। তাঁরা এমন একজনকে খুঁজতে লাগলেন যিনি প্রজাপতিকে শাস্তি দেবেন। কিন্তু কাউকে পাওয়া গেল না। ফলে তাঁরা সকলের ভয়ঙ্কর দিকগুলি একত্রিত করে একটি সত্তা তৈরি করলেন। তাঁর নাম রুদ্র। দেবতারা রুদ্রকে বললেন, এ-পর্যন্ত যা হয়নি প্রজাপতি তাই করছেন। সুতরাং তাকে ভেদ করুন। রুদ্র প্রজাপতিকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করলেন। তীরবিদ্ধ হয়ে প্রজাপতি ঊর্ধ্বে উঠলেন। দেবতারা তাঁকে বললেন, মৃগ। মৃগভেদকারী দেবতাকে বলা হল মৃগব্যাধ। হরিণীকে রোহিণী। ত্রিমুখ শর হল কালপুরুষের তিনটি নক্ষত্র। জ্যোতির্বিদ্যায় বৃষরাশির শেষের দিকের নক্ষত্রসমূহই রোহিনী। মৃগব্যাধ নক্ষত্র হল রুদ্র। এই কাহিনীটিই পরবর্তীকালে দক্ষযজ্ঞ কাহিনীর উৎস হিসেবে কাজ করেছে।

রামায়ণের বহু অলৌকিক কাহিনী আছে। তার মধ্যে একটি হল দশাননের কাহিনী। দশানন অর্থ একটি লোকের কাঁধে দশটি মাথা ছিল এমন কল্পনা। এ ধরনের জিনিস ঘটতে পারে বলেতো আমাদের বিশ্বাস নয়। একাধিক মস্তিষ্ক

যুক্ত কিছু কিছু শিশু কখনও কখনও জন্ম নেয় বলে শোনা যায়। সেটা একটা অস্বাভাবিক ঘটনা। কখনও কখনও দুটি ভ্রূণ একত্রে যুক্ত হয়ে এমন ঘটে যায়। এ ধরনের জাতক বেশি দিন বাঁচেও না। আমাদেরই কাঁধে যদি দশটি মাথা থাকত এবং থাকত বিশটি হাত, তাতে আমাদের শক্তি বাড়তো তো নয়ই বরং মাথার ভারে দেহই পড়ে যেত। চিত্রশিল্পে দেখা যায়— দেবদেবীকে মনুষ্যোর্ধ্বে স্থান দেবার জন্য হয় তাঁদের দীর্ঘাঙ্গ করে আঁকা হয়, নয়তো তাঁদের মধ্যে অতিরিক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যুক্ত করে তাঁদের অতি-স্বাভাবিক (super-normal) ক্ষমতা দেখাবার প্রয়াস চলে। এসবের মধ্য দিয়ে কতকগুলি ভাব প্রকাশের চেষ্টা চলে মাত্র। বাস্তবে ঘটনাগুলি তেমন নয়। কালীর চার হাত, দুর্গার দশহাত, শিবের পঞ্চমুণ্ড সবই কতকগুলি ভাবের দ্যোতক মাত্র। দশাননের দশমস্তিষ্কও তেমনই কোন ভাবের প্রতীক। কেউ কেউ মনে করেন, দশমস্তিষ্ক দশটি যৌগিক ক্ষমতার প্রতীক। কিন্তু বাস্তব অর্থে ব্যাপারটা দাঁড়ায় ভিন্ন প্রকার। আসলে দশানন হলেন দশটি জনগোষ্ঠীর প্রধান। যে দশটি জনগোষ্ঠী এক ব্যক্তির নেতৃত্বে স্থান পেয়েছিল। তিনি ছিলেন দশটি জনগোষ্ঠীর প্রবক্তা। বেদে পঞ্চজনগোষ্ঠীর একত্র উল্লেখ আছে যেমন, পঞ্চজনাঃ। ভারতবর্ষে ভাস্কর্য হল দীর্ঘ বক্তব্যের সংক্ষেপ কথন— বিজ্ঞানের কোড-ল্যাঙ্গুয়েজের মত। বহু চিত্র কল্পই এই জন্য প্রতীকী ভাষণ মাত্র। রাবণও তাই।

শ্রীরামচন্দ্রের সমুদ্র বন্ধনের ব্যাপারটিও সেই রকমই। শিলা জলে ভাসিয়ে বিরাট সমুদ্র বন্ধন করা যায় না। কিন্তু গঙ্গার মত কোন নদী যদি হয় তার উপর শিলা দিয়ে সেতু নির্মাণ করা চলে, যেমন — বঙ্কিম সেতু। কিন্তু পব প্রণালীর উপর দিয়ে ভারতবর্ষ ও শ্রীলঙ্কাকে সেতুবন্ধনে যুক্ত করা অসম্ভব ব্যাপার। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সকে ইংলিশ চ্যানেলের তলদেশ দিয়ে বর্তমানে যুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। সেভাবে যদি শ্রীলঙ্কা ও ভারতের মধ্যে যোগাযোগ করা যেতে পারে তাতেও শিলাদ্বারা রচিত সেতুই তৈরি হয় বটে। কিন্তু এমন কোন প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য আজও পাওয়া যায়নি যা দ্বারা প্রাচীন ঐ ধরনের কাহিনীর সত্যতার পক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে। দূরত্বটা যদি কম হত— তাহলে ব্যাপারটা বিশ্বাস্য হয়ে উঠত। তাহলে কি রামায়ণে বর্ণিত লঙ্কা আজকের শ্রীলঙ্কা নয়?

আমি মহাতীর্থ একান্নপীঠ লেখার পর বহু তান্ত্রিক পরিব্রাজক সিংহলে গিয়ে সমুদ্রসৈকতে মৎবর্ণিত শাক্তপীঠকে খুঁজে দেখেন। কিন্তু শ্রীলঙ্কার কোন ব্যক্তি তাঁদের এই পীঠস্থানটির হদিস দিতে পারেননি। তখনই আমার মনে সন্দেহের দানা বাঁধে যে, বর্তমানে যাকে সিংহল বা শ্রীলঙ্কা বলা হয় সেই সিংহল বা শ্রীলঙ্কা হয়তো রামায়ণে বর্ণিত শ্রীলঙ্কা নয়। এই ধরনের সন্দেহ মনে দেখা দেবার সময়ই আমি প্রত্নতত্ত্ববিদ সাংকালিয়ার স্বর্ণলঙ্কা সম্পর্কিত একটি গবেষণা পড়ি। তাতে সাংকালিয়া সিংহলকে রামায়ণ বর্ণিত শ্রীলঙ্কা বলে মনে করেন নি।

তিনি রামায়ণ উল্লেখিত লঙ্কাকে ওড়িশায় বলে মনে করেছেন। সাংকালিয়া ছাড়া আরও অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদও অনুরূপ ধারণাই করেছেন। এঁদের মতে ৪০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই শ্রীলঙ্কা শহর টিকে ছিল। মধ্য প্রদেশের. গোঁড় করকু উপজাতির লোকেরা লঙ্কা বলতে ভাবে বিস্তীর্ণ জল ঘেরা স্থানকে। ওড়িশার মহানদী ও তেলনদীর সঙ্গমে সোনেপুরের কাছে আধ কিলোমিটার চওড়া জায়গায় পুরানো এক শহরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। সাংকালিয়ার মতে এই হল রামায়ণের সোনার লঙ্কা। এখানকার লোকেরা প্রায়ই সোনার জন্য এই অঞ্চল খোঁড়াখুড়ি করে। অনেকে এখনও সোনেপুরকে বলে সোনার লঙ্কা। হনুমানের কুশপুত্তলিকাও পোড়ায়। এখানকার ধ্বংসাবশেষে দুর্গের সন্ধানও পাওয়া গেছে।

এই সোনেপুর যদি রামায়ণের সোনার লঙ্কা হয় তবে তাকে ঘিরে যে নদী আছে তাকে প্রস্তর দিয়ে বেঁধে ফেলা তেমন অসম্ভব কোন ব্যাপার নয়। আর স্থানটি দণ্ডকারণ্য অঞ্চলেই। হয়তো রাবণ ছিলেন এখানকারই কোন উপজাতীয় নেতা। শ্রীরামের বানর সেনারা যে লাঙুলযুক্ত বানর তা নাও হতে পারে— . কারণ, বানর উপাধিধারী একদল নরগোষ্ঠীও যে ভারতে ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। হয়তো শ্রীরামচন্দ্রের বানররা সেই ধরনেরই কোন বানর নরগোষ্ঠীভুক্ত, যথার্থই বাঁদর নয়। ঘটনাটিকে এই ধরনের দৃষ্টি নিয়ে দেখলে অবিশ্বাস্য মনে হবে না। যেমন বর্তমানে বায়ুযান আবিষ্কৃত হবার ফলে মেঘনাদের মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করার কাহিনীকে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় না— অবিশ্বাস্য মনে হয় না রাবণের পুষ্পক রথকেও।
